মোহানা

ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতী ভবন
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়
ভারতী ভবন
১১, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

তিন টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীঅজিৎকুমার বসু বি. এ.
শক্তি প্রেস
২৭-৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

বড়দা।

নিবেদন

'মোহানা' দিয়ে আমার তিন খণ্ডের উপন্যাসটি শেষ হল। বইখানি লিখি প্রায় তিন বছর আগে। ১৩৪৮-৪৯ সালে 'পরিচয়ে' এটি প্রকাশিত হয়। নানা ব্যস্ততা ও অসুবিধার জন্য পুস্তকাকারে ছাপান এতদিন সম্ভব হয়নি।

প্রথম দুটি খণ্ড, 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্ত্তে'র সমালোচনা পড়ে মনে হয়েছিল যে তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাসও ছিল তাই। (প্রধান দুটি চরিত্র তখনও পরিণত হয়নি। পরিণতির অর্থ যে উন্নতি নয় এটুকু অবশ্য জানতাম। পরিস্থিতির মধ্যে যে শক্তি গুপ্ত থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া যেমন নেতার কাজ তেমনই লেখকেরও। বাকীটা সচেতনতা-সাপেক্ষ।)

কলমের মুখ থেকে যা বেরোয় তাই আর্ট, এমন কথা হয়ত প্রতিভার বেলায় খাটে, অন্য লোকের পক্ষে সৃষ্টির নিয়ম-কানুন জেনে বিষয়কে রূপ দেওয়ার চেষ্টাই যথেষ্ট। সে রূপ অবশ্য এক রকমের নয়। বিষয় যদি ভিন্ন হয়, বদলায়, তখন তাকে সাজাবার জন্য রচনাপদ্ধতির রীতিরও পরিবর্ত্তন চাই। এই পরিবর্ত্তনের বিচার করেন সচেতন লেখক ও সমালোচক। এইখানে দুজনের মিল।

প্রুফ সংশোধনের জন্য সব খণ্ডই পড়তে হয়েছে। যাকে চিত্ত বিনোদন বলা হয়, তার মালমশলা খুব কমই পেলাম। যার সন্ধান মিলল, সেটা একটানা গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি ঠিক জীবন-স্রোত নয় দেখলাম। তার মধ্যে কোথায় যেন পুরুষকার রয়েছে। স্রোতে ভাসে খড়কুটো। খড়কুটোর সাহিত্য হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব, এবং কলাবিদের হাতে সেটা রসোত্তীর্ণও হবে। কিন্তু রসের নামে জীবনের অন্তঃশীল দ্বন্দ্ব ও তার আবর্ত্তকে, মোহানা দিয়ে তার আকুল যাতায়াতকে সঙ্কীর্ণ করা আমার মনোমত নয়, এ-যুগের উপযোগী নয়।

অর্থাৎ, বইখানি ভেবে-চিন্তে লেখা। মতামত-আলোচনায় যে অধীত-চিন্তা থাকে তার অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে। পাঠকপাঠিকার কাছে আমি 'পরিশ্রম' মোটেই প্রত্যাশা করি না, কিন্তু পদ্ধতি, বিসয় সৃষ্টির রীতিনীতি ও বিষয়ানুযায়ী তার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা চাওয়া কি অন্যায়?

লক্ষ্ণৌ

১৩ই সেপ্টেম্বর, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৩

মোহানা

(১)

মাসীমার মৃত্যুর পর খগেনবাবু ও রমলার একত্র বসবাসে বাধা রইল না। মুকুন্দ আর চাকরী করবে না বলে দেশে গেল। গিন্নীর কৃপায় সে কিছু ধান জমি করেছে, তাইতে একটা পেট ভরবে যা করে হোক। সুজনেরও কোনো খবর নেই। বিজন ছাত্র-সমাজের একজন কর্ম্মিষ্ঠ বামমার্গী সভ্য হয়েছে। গুজোব এই যে ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টি তার ওপর পড়েছে। বিজনের পিতার একজন বাল্য-বন্ধু, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বিজনকে চা'য়ে ডেকে উপদেশ দিলেন পড়াশুনোয় মন দিতে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অত্যধিক স্নেহময় উদ্বেগও যখন তাঁর তের বৎসরের কন্যার রূপের ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হল তখন বিজন গুরুজনদের মুখের ওপর যৌবনের দায়িত্ব শুনিয়ে সোজা খেলার মাঠে চলে যায়। পরের দিনই তার রমাদিকে সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে যে-কোনো দিন সে দেশত্যাগী হয়ে হয় বিদেশে, না হয় অন্য প্রদেশে চলে যাবে। বিদেশের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, এবং প্রবাসের মধ্যে বম্বে কিংবা কানপুর তার গন্তব্য নির্ব্বাচিত হয়ে গিয়েছে—কিন্তু, কাশী কিছুতে নয়।

কাশীধাম পুরাতনের প্রতীক। কাশীর জীবনযাত্রায় মাসীমার জীবন মাখান; ভাঙ্গা বাড়ির বড় কর্ত্তার আলবোলার ধোঁয়ার মতন সর্ব্বত্র তার পরিব্যাপ্তি; পরতে পরতে পাকে পাকে ডাকে ডাকে গতায়ু সংস্কারের ছোঁয়াচ, আর কণ্ঠশ্বাস। সমগ্র সহরটা গঙ্গাবাসীর ঘর, তার হালফ্যাশানের বাংলোগুলোয় এক বছরেই ফাট আর নোনা ধরে, বৃদ্ধা পিতামহী বহুদিন যাবৎ শুষছেন, প্রথম প্রথম নাতি নাতনী

নাতবৌরা সেবা করতে আসত, এখন তারা নিজের ধান্দায় ব্যস্ত, ছেলেরা চাকরী করে ঔষধালয়ে, আর ঝিউড়িরা রামনগরের বেগুণ কেনে, বউএরা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার রান্নাঘরে তাই পুড়িয়ে সোয়ামীদের ভাতে ভাত দেয়। মধ্যে মধ্যে ভাগবৎ পাঠ, আর বিধবার প্রসব-বেদনার চীৎকার। কাশী যে-বস্তু যখের ধনের মতন রক্ষা করে সেটা এক প্রকাণ্ড ছোবড়া। জড়বাদের লীলাক্ষেত্র কাশীধামে যখন সাধু-সজ্জনের নতুন আশ্রম স্থাপিত হয় তখন তন্ত্রের আবশ্যিকতা বুঝতে দেরী থাকে না। এখানকার জীবনে যতটুকু স্বাধীনতার সুযোগ মেলে সেটুকু শব-সাধনার। অথচ, কাশী আসা চাই, থাকা চাই, সেখানে কেন্দ্র স্থাপনা না হলে কোনো অনুষ্ঠানই সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না। কিন্তু সত্য কথা এই, কাশীধামে সব কিছু রটে, কোনো কিছুই ঘটে না।

অবশ্য, মধ্যে মধ্যে সন্দেহ জাগে ঘটনার দরকারই বা কি? বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্ম-চর্চ্চা এই ত' হল, অন্ধকার ঘরে অন্ধজনের কালো বিড়াল খোঁজার মতনই তাদের সার্থকতা। চিত্তশুদ্ধি চিররুগ্নের ভাববিলাস, অবসর-বিনোদন, স্মৃতি ও ইচ্ছা-পূরণ। হিমালয় ভ্রমণ নিজের ছায়া থেকে পলায়ন। তাতে দুঃখ নেই, কর্ম্মফল কাটাতে হবে, আদিম অভিশাপের স্খালন চাই, নচেৎ দেহ ও মন প্রেতলোকেও কলহের জের টানবে। কিংবা, হয়ত মানুষের জীবনে উত্থান-পতনের কক্ষ সুনির্দ্দিষ্ট, তার থেকে বিচ্যুতি নেই, ঘটলে প্রলয় বাধে, কে আর প্রলয় চায়! তবে, কোনটা ওঠা, আর কোনটা নামা? যারা সব কাজের পিছনে ও সামনে উদ্দেশ্য রয়েছে মানে তাদের খানিকটা সুবিধা; কিন্তু যাদের পক্ষে উদ্দেশ্য-প্রেরণা কাব্য-সংস্কার মাত্র, তারা এই চিরন্তন দোলায় দুলতে পারে না; হয় জীব-ধর্ম্ম, না হয় বুদ্ধি, এই ধবন্দ্বের যুক্তি তাই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য।

প্রথম প্রথম খগেন বাবুর চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটে। এমন কয়েক দিন গেল যখন দেহসম্ভোগ থেকে বিরাম ছিল না। পরের কয়েক দিন সারাক্ষণ সাহিত্যপাঠ – বোকাচ্চিও, পেট্রোনিয়াস, বার্টন, কাসানোভা, বাৎস্যায়ন, কালিদাস। যখন

বোদলেয়ার হাতে এল, তখন বুঝলেন, যে-সাধনার ফলে অমঙ্গল বিশ্বরূপ ধারণ করে সেটা চিত্তশুদ্ধিরই শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রক্রিয়া, পাপ ও পুণ্য-সম্ভোগ একই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়। বোদলেয়ার তাই বিরেচকের কাজ করল। ফলে খগেনবাবু স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন, দেহ ও মনের পার্থক্য ঘুচে যুগ্ম-অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলেন। এই লঘু অবসরে শারদীয় মুক্তি বসন্তের প্রসারণে পরিণত হল।

নৌকাবিলাসে দুজনের সারা সন্ধ্যা কাটত। বিকেল থেকেই সাজ-সজ্জার আরম্ভ, এলো খোঁপায় কখনও রঙ্গন, কখনও বেলীর মালা, ছোট ব্লাউজ কাঁধের ওপর তোলা, আংরাখার ফিতে দেখা যায়, নানা রঙের সাড়ি এঁটে-পরা, আঁচল ছোট রাখার কৃপায় গড়ন পাতলা দেখায়। যতক্ষণ আলো থাকত, ততক্ষণ কাশীর লোকাকীর্ণ ঘাট পরিত্যাগ করে অন্য তীরে চলে যেতেন, সেখানে বালির উপর বসতেন দুজনে। ওপারে এক একটি করে আলো জ্বলত, নহবতখানা থেকে সানাই-এ মূলতানী, পূরিয়া, পূরবীর আলাপ ভেসে আসত। সন্ধিরাগে মন উদাস করে দেয়, তার কোমল রেখাব আর তীব্র মধ্যমের সংযোগে কি এক জাদু আছে যার আহ্বানে অতি নিকটের সামগ্রী দূরে সরে যায়, এ-পারের ডাক ও-পারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। খগেনবাবু রমলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন, রমলা ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাত আসে, বালুর চরের ওপর দিয়ে পাখী ওড়ার শব্দ আর পাওয়া যায় না। ইমন, কল্যাণ, ভূপালির গৎ সুরু হয়, লোকালয়ের আকর্ষণে তাঁরা নৌকায় চড়েন। এত শীঘ্র বাড়ি ফিরে লাভ নেই। ধীরে ধীরে নৌকা চলে। নৌকার খোলা পাটাতনে কার্পেট বিছানো। মাঝি ওপাশে গলুই-এ ব'সে হাল ধরে, নৌকার কুটুরীর জানলায় পর্দা টাঙ্গানো, কারুর দৃষ্টি পড়ে না। রাত দশটায় দুজনে বাড়ি ফেরেন।

একদিন সন্ধ্যায়, তখনও অন্ধকার হয় নি, অন্য একটি নৌকা পাশ দিয়ে গেল। তার ওপর অক্ষয়বাবু রয়েছেন। খগেনবাবুকে অভিবাদন করে

নিজের নৌকাটা পাশে ভেড়ালেন। অক্ষয়বাবু বল্লেন যে তিনি এখানকার বাঙ্গালী যুবক সাঁতারুদলের সেক্রেটারী, কাল প্রতিযোগিতা হবে হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে, তাই আজ সন্ধ্যায় তদারক করছেন। রমলা আপনা থেকে ঘরের মধ্যে উঠে যাচ্ছিল। অক্ষয়বাবু হেসে বল্লেন, 'একটু আধটু ঠেকা দিতেও জানি। ভেতরে হারমনিয়ম আছে?' রমলা উত্তেজিত হয়ে মাঝিকে ঘাটে যেতে আদেশ করলে। পরের কয়েকটি সন্ধ্যা সিনেমায় কাটল। যেদিন আবার নৌকায় বেরুলেন সেদিনও অক্ষয় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ও মশাই, কাশীর এ-রীতি নয়, একলা মজা লুটতে বাবা বিশ্বনাথের বারণ আছে।' ফিরে এসে রমলা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে। কাশীর জীবন বিষিয়ে উঠল। খগেনবাবু রমলাকে আনন্দ দিতে সারাক্ষণ পাশে বসে রইলেন, আদর বাড়ল, সাড়ির পর সাড়ি দোকানীরা দেখাতে আনল, দ্বিগুণ উৎসাহে মালিরা ফুল যোগাতে আরম্ভ করলে, খান-কয়েক বড় আর্শী কেনা হল। বিচিত্র পোযাকে, বিচিত্র ভঙ্গীতে রমলা দাঁড়াত আর্শীর সামনে, ঘরের কোনের আলো পড়ত তার মুখে, বুকে, হাতে, খগেনবাবু অন্ধকারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেন। দেখতে দেখতে কখনও তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হত সর্ব্ব দেহে, নিজে উঠে আলো নিভোতেন, রমলা মন্ত্রমুগ্ধের মতন চোখ বুজে খগেনবাবুর কাছে আসত। পরস্পরের অন্তর্ব্যাপ্তিতে শারীরিক সম্ভোগ অপাপবিদ্ধ, চিন্তাধারা অনুভূত, প্রবৃত্তিগুলি রঙ্গমঞ্চে নর্ত্তকীদের মতন সুসম্বদ্ধ হত। যে অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় পরিশীলনের অলিতে-গলিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সন্তুষ্টিসাধন এই দেহবাদের অন্তরে বিরাজ করে। বিরোধ-বিমুক্ত অবস্থায় খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান, রমলার অকুণ্ঠ আত্মদানে জীবনের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হয়।

এক ক্লান্ত প্রত্যুষে শয্যায় বাসি বেল ফুলের দুর্গন্ধ নাকে আসতে খগেন বাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় গলা ধরে রমলা তাঁকে শুইয়ে দিলে। বুকের কাছে মুখ এনে বল্লে, এখনও সকাল হয়নি, অত ভোরে উঠতে তার মাথা ঘোরে, গা

কেমন কেমন করে। গভীর আলিঙ্গনে রমলা খগেন বাবুর জড়তা কাটালে। 'জানলা দিয়ে আলো এসেছে, এবার ওঠ। আমি পারছি না, রোজই সকালে আমার গা গুলুচ্ছে।' 'বেশী রাত করে খেলে অসুখ হবে, বরাবর বলেছি, তুমি কিছুতে শুনবে না।' 'সেজন্য নয়, বোধ হয়...।' 'বোধ হয় কি?' 'যেন জানেন না, কচি খোকা!' অনেকক্ষণ খগেন বাবু রমলার দিকে চেয়ে রইলেন, একাগ্রদৃষ্টিতে কাতর হয়ে রমলা হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'রাগ হল?' 'রাগ কেন হবে?'

সারাদিন রমলা বিছানায় শুয়ে রইল। কোন কথাবার্ত্তা হয় নি দুজনের মধ্যে। সন্ধ্যায় খগেন বাবু বল্লেন রমলার নৌকা চড়া আর হবে না, নৌকা বড় দোলে। রমলা মেনে নিলে বটে. কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খগেন বাবুকে রোজই বেরতে হবে আবদার করে বসল। দুদিন শুনলেন না, কিন্তু তৃতীয় দিনে বেরিয়ে পড়লেন। দশাশ্বমেধের ঘাটের জনতা পরিহার করে অহল্যাবাইএর প্রাসাদের নীচে বসে রইলেন। পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না পথের মধ্যে, ওপরের সামনেকার আলো জোর আগের কয়েক ধাপ দেখিয়ে দেয়, দুপাশের খানা খন্দর থেকে সাবধান করে, কিন্তু মোড়ের ওপাশে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। পথ যদি নাৎসী জার্ম্মানীর রাস্তার মতন সোজা ও বাঁধান হত, তবে গোল থাকত না। কিন্তু এ পথের সবটাই বাঁকা, প্রতি পদে দিক পরিবর্ত্তন, প্রতিক্ষেপে ভিন্ন স্তর। ইয়ুক্লীডে চলে না, রীমানের জ্যামিতি চাই, তার শাস্ত্র অজ্ঞাত, জ্ঞাত হলেও যেকালে অপ্রযোজ্য, তখন অবান্তর। কিন্তু একটা জিনিষ ভারী মজার—মনে কোনো আলোড়ন হল না শুনে, না এল আনন্দ, না এল দুঃখ। যোগসাধনার ফলে? এর মধ্যে একটা কোথায় প্রতিহিংসা রয়েছে। সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশ ভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চ্চা, মাসীমার মৃত্যুকে তিনি মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন, পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তস্থ সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাবেন প্রত্যাশা করেছেন. কিন্তু আজ মনে হয় স্তর সেটা কেবল সাপ-মই খেলার ধাপ, পেঁয়াজের কুটে সেই খোসা ছাড়া

আর কিছুই নেই। প্যাফনুটিয়াসের পতন, না সেণ্ট আণ্টনী ও বুদ্ধের জয়, কোনটা সত্য? যীশু, বুদ্ধ নিজেরা হয়ত সফল হলেন, মোক্ষ পেলেন, কিন্তু আজ একজন খৃষ্টান, একজন বৌদ্ধের কি দশা? তাঁদের নির্দ্দিষ্ট, তাঁদের সৃষ্ট সভ্যতা আজ চুরমার। তাঁদের ধর্ম্ম নিশ্চয় জীবনের প্রতিকূল ছিল, নচেৎ জীবপ্রগতি তাঁদের অবহেলা করতে কিছুতেই পারত না। একজন বল্লেন শ্রমণ হও সকলে. আরেকজন আদেশ দিলেন সাধারণকে তাঁর অনুগামী হতে। অথচ সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রায় যে-সব প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় তাদের মধ্যে রয়েছে প্রবণতার পরিমাণ, লঘু-গুরুর তারতম্য; তাকে যেমন স্বীকার করা যায় না, তেমনই তাকে ওলট পালট করাও চলে না। অবশ্য প্রবৃত্তির মধ্যে পরিণতিও আছে, কোনটাই একান্ত ও বিশুদ্ধ নয়। তবু ক্রমকে অতিক্রম করলে জৈব-প্রকৃতি নাক দিয়ে জরিমানা আদায় করে। সেটা দেবার সময় মূলধনে টান পড়ে। লোকের ধারণা, ধর্ম্মে সর্ব্বজীবের আশাভরসা ভয়ভাবনার সন্তুষ্টি থাকে। কিন্তু সেগুলো ভাব মাত্র, প্রবৃত্তি নয়। অর্থাৎ, সব ধর্ম্মের সঙ্গে জনগণের জীবনের কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই! নেই বলেই, সভ্যতার এই দশা, তাই মানুষের কাটা পথ রমলার খোঁপার কাঁটার মত অত বাঁকা। প্রবৃত্তি কাজে পরিণত হবেই, সভ্যতা সর্ব্বসাধারণের কাজ, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার ফল, ব্যক্তিগত জীবনের সুফলতা-নিস্ফলতা তাই সার্ব্বজনীন জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। সজ্ঞান প্রয়াসে সভ্যতাসৃষ্টিই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম—এ ছাড়া অন্য ধর্ম্ম অস্বাভাবিক। চিন্তার এই বিস্তৃতিতে খগেন বাবুর সাধনার দাম্ভিক নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়, সমগ্র পথ ও প্রতিবেশ আলোকিত হয়ে ওঠে।

ফেরবার পথে এক ডাক্তারখানায় ঢুকে খগেন বাবু লেডি ডাক্তারের সন্ধান নিলেন, প্রয়োজন হলে, পরে, যাকে পাওয়া যাবে। রমলা বিছানায় শুয়েছিল। খগেন বাবু বল্লেন, 'একবার ডাক্তার দেখালে হত না?' চমকে উঠল রমলা, 'কেন? সে আমি পারব না, মরে যাব।' আমি তোমাকে কি

বোঝাব ? তুমি সবই জান। ডাক্তার পরীক্ষা করুক, যদি সম্ভব হয়, তবে আপত্তিটা কি ?' রমলা চোখ বুজে শুয়ে রইল।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে খগেন বাবু পাশ ফিরলেন। রমলা কি একাগ্রমনে এতদিন ধরে মাতৃত্বেরই কামনা করেছিল ? খগেন বাবু কি তারই উপলক্ষ্য মাত্র ? তাই যদি হয় তবে সে চরম মুহূর্ত্তে নির্জীব হল কেন ? বিজয়ের গরিমাতে ফেটে পড়াই ত' সঙ্গত ছিল ! কিন্তু নুয়ে গেল, ভেঙ্গে পড়ল। দৈহিক অবসাদ ? সেটা স্বাভাবিক, ডাক্তারে তাই বলবে। কিন্তু ব্যাপারটা অতখানি জৈব নয়। যৌবনের উন্মাদনা ঘুচে যে অভিজ্ঞ-শান্তি চিত্ত অধিকার করে, তার অন্তরে থাকে অপার করুণা, যার আশীর্ব্বাদে চিত্ত শুদ্ধ হয়, সর্ব্বাঙ্গে বিষাদ ছায়। ঘুমের ঘোরে রমলা চোখের উপর হাত রাখল, ঘর ত অন্ধকার, কোথা থেকে আলো এল ? ডান কুনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঠে শ্বাসপ্রশ্বাস শুনলেন, অনেক পরে পরে নিঃশ্বাস পড়ে, ক্রমে গতি নিয়মিত হল, খানিক পরে আবার মন্দাগতি, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, বন্ধ হল, আর একটু বন্ধ থাকিলে সর্ব্বনাশ হত। বুকটা ধড়াস করে ..রমলার বুকে হাত রাখেন, চেতনার চিহ্ন নেই, কোন আদিম অভ্যাসে রমলা অন্য হাতটি খগেন বাবুর হাতের ওপর রাখে ··ছন্দে ফিরে এল আবার, চেতনার বহু নীচে যেখানে ঘন গাঢ় কালো স্রোত বয়, প্রাগৈতিহাসিক জীবন স্পন্দিত হয়, সেখানকার লয়ে। এরই সন্ধানে সকলেই ঘুরে মরে, জেনে, না জেনে। আবার কেন চেতনার অভ্যুদয়, আবার কেন অঙ্কুরোদ্ভব ?

খগেন বাবু উঠে টেবিল থেকে টর্চ্চ আনলেন। রমলার এক হাত চোখের ওপর, অন্য হাত তলপেটে। ওপরের হাতে আলো ফেল্লেন, রমলা নড়ল না। অন্য হাতের ওপর আলো ফেল্লেন, উত্তাপেরও অনুভব নেই। বুকের ওপর সাড়ির আঁচলটা পড়ে রয়েছে, নীচে হালকা বাঁধা জামা, অল্প চেষ্টায় সেটা খুলে গেল, সরিয়ে দিলেন আবরণ, আলো ফেল্লেন বুকের ওপর। নীল আভা, না কালীর প্রলেপ ? আলো প'ড়ে কালো বরফ গলে যাবে, নীল মেঘের টুকরো থেকে দুধ

বৃষ্টি হবে, পরে নদীর সৃষ্টি, যেটা পার হওয়া দুসাধ্য। রমলা নির্লজ্জের মতন পড়ে রইল। লজ্জাটা প্রাথমিক নয়, নন্দাদেবী বদরীনাথের পাশে বুক খুলে চিরটা কাল দাঁড়িয়ে রইল, পাশে নন্দকোট পঞ্চকোট প্রভৃতি পুরুষ প্রহরী—কিন্তু বুক ঢাকল না। লজ্জা নেই প্রকৃতির অন্তরে। সে কেবল কাজ করে, খগেন বাবু আলো নিভিয়ে টর্চ্চটা টেবিলে রাখলেন।

পনের দিন প্রায় রমলা বিছানা ছেড়ে উঠল না। ঝি চাকর বেয়ারা বাবুর্চ্চি রোজ সকালে আদেশ নিয়ে যায়। পেয়ালা পিরীচ ভাঙ্গতে সুরু হল, মাছ মাংসের দর বাড়ল, ফল দুষ্প্রাপ্য, খাওয়া দাওয়ার সময় গেল বিগড়ে, ন্যাপকীন ধোপার বাড়ী থেকে আসেনি, সাড়ির জরী ছিঁড়েছে, রঙ জ্বলেছে, সার্টের বোতাম নেই। রমলা উঠে বসল কাজ করতে। খগেনবাবু একটু বিরক্ত হলেন, এতদিন যে সংসার চলেছে তখন রমলা ছিল কোথায়?

বিকেলে একদিন রমলা খগেন বাবুকে জানালে যে সুজন তাকে চিঠি লিখেছে। ঔৎসুক্য প্রকাশের অভাবে রমলা চিঠিটা খগেন বাবুর হাতে তুলে দিলে। 'দেখই না, আমি ওকে বুঝি না।' খগেন বাবু চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফেরৎ দিলেন, রমলা না নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে ইঙ্গিত করলে। 'এতে না বোঝবার কি আছে? বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছে।'

'কিন্তু আমার দোষ কি? ওকে অল্প বয়স থেকে দেখে আসছি। আমার প্রতি ঐ ধারণা পোষণ করবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ধারণা কৈ? মনোভাব, সেটা স্বাভাবিক।'

'ঢের হয়েছে আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমার কাজই বুঝি ছোট ছেলেদের বিপদে ফেলা।'

'ঠাট্টা নয়, ছেলেটিও ছোট্ট নয়। ছেলেবেলা বাছুর কোলে করেছ বলেই কি বৃদ্ধ বয়সে ষাঁড় কোলে করতে পারবে?'

রমলা বিরক্ত হল। 'উপদেশগুলো না দিলেও পারত।'

'উপদেশ কোথায় ?'

'ওগুলো কি ? ঐ যে লিখেছে,—যদি নতুন কর্ম্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে, অবশ্য সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। এ-সবের মানে জানি।'

'আমিও জানি, মানে অভিমান। বেচারী একলা, তাই তোমাকে চেয়েছে। এতদিন ভেবেছিল চাওয়াটা মানসিক। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে কেবল মানসিক নয়। তাই ভয় পেয়েছে, তারই বিকৃত রূপ ঐ অভিমান। তার প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।'

'আমার দায়িত্ব। কোনো দিন তাকে আমল দিই নি, নিজে যদি ছেলেমানুষী করে আমার তাতে আসে যায় না। এখানে আসতে চেয়েছে, আমি লিখে দিচ্ছি আসতে হবে না।'

'তা ত লেখে নি! যদি প্রয়োজন হয় তবে সে চলে আসবে, এইটুকু জানিয়েছে।'

'তবে ত' সব বুঝেছ! ওর মানে আমি তাকে আসতে লিখি। কোনো প্রয়োজন নেই।'

'থাকতে পারে, ডাক্তারে যদি রাজি হয়।'

নীচু গলায় রমলা প্রশ্ন করলে 'কাশী ছাড়তে বলছে কেন? তুমি তাকে জানিয়েছ?

'জানাই নি। নেহাৎ ভুল নয়। নতুন জীবন নতুন প্রতিবেশের অপেক্ষা রাখে। ঠিক লিখেছে। প্রেতাত্মারাই ছাতাপড়া দেওয়ালের কিম্ভুতকিমাকার নক্সায় আত্মগোপন করে, ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে, বেলগাছে আশ্রয় নেয়, স্থানীয় আবহাওয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে থমথমে ক'রে তোলে। অদৃশ্য তাদের শিরা উপশিরা, কিন্তু তবু শক্ত। এত জোর কি হবে যে ছিঁড়তে পারব?' রমলা শঙ্কান্বিত চোখে চেয়ে থাকে। খানিক পরে উঠে বসে বলে,

'সুজন আমাকে চেনে না। ওর ধারণা আমি তোমাকে নরকে নামাব। বেশ, তুমি ডাক্তার আন। আমি মা হতে চাই না, তোমাকে আমি বাঁধব না।'

লেডী ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মতে যদিও সন্তান-সম্ভাবনার চিহ্ন কিছু আছে, তবু আরও কিছুদিন অপেক্ষা না করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তবে কোনো আন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক দিন পরে লেডী ডাক্তার আবার এলেন। পরীক্ষার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, 'না, একটি সন্তান হয়েছিল অনেকদিন আগে, মধ্যে কিছু হয় নি শুনলাম, তাই ঐ রকম হয়েছে। একটা প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্ দিচ্ছি...পরে নিয়মিত ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।'

রমলা মুড়ি দিয়ে আরো তিন চার দিন শুয়ে রইল। খগেন বাবু ঘরে এলেও মুখ খুলত না। বেয়ারাকে বলে দিলে সাহেবের অন্য ঘরে বিছানা করতে। ক্রমে বন্দোবস্তটি পাকা হল। একদিন সন্ধ্যায় আবার দুজনে নদীতে গেলেন। সেদিনও অক্ষয় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফেরবার পথে রমলা খগেন বাবুকে বল্লে, 'চল, কাশী ছেড়ে চলে যাই। লক্ষ্ণৌ বেশ ভাল জায়গা শুনেছি! তোমার মেশবার উপযুক্ত লোক রয়েছে অনেক সেখানে।'

'তোমারও আছে, মেয়েদের ক্লাব খুব আধুনিক শুনেছি।'

রমলা বাড়ি এসে বল্লে, 'তালুকদারী জায়গা তোমার ভাল লাগবে না। চল কানপুর। নতুন সহর গড়ে উঠছে।'

* * * *

রমলা চাইলে ছোট লাইনে আসতে, কারণ দেখালে যে সে ইতিপূর্ব্বে ছোট গাড়িতে চড়েনি। খগেনবাবু কিন্তু বড় লাইন ও বড় গাড়ির পক্ষপাতী, কারণ, যদিও তাতে ভিড় বেশী, অতএব ষ্টেশনে ও গাড়িতে যাত্রীদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্ভব, তবুও যেকালে স্মার্ত্ত পণ্ডিতের উৎপাত আজ লুপ্ত, দ্রুতগতিই সভ্যতার

প্রতীক, সহজিয়ার মন্ত্র হল লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়, এবং যেকালে বড় গাড়ির বড় কামরায় মন সঙ্কুচিত হয় না, বিদেশ ভ্রমণের মোহ জাগে, তখন তাতে চড়তে আপত্তি থাকতেই পারে না, বরঞ্চ উৎফুল্ল হওয়াই কর্ত্তব্য। রমলা এই যুক্তি মেনে নিলে, এবং পুরুষের গাড়িতেই উঠল।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। হাতে সময় রয়েছে অনেক। ওয়েটিং রুমে মালপত্র রেখে খগেনবাবু খানকয়েক খবরের কাগজ কিনলেন। 'কাণপুরে ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা, মজুরদের অত্যধিক আব্‌দার...লক্ষ্ণৌএ দিন দুপুরে ডাকাতি... স্যাংঘাইএ গোলাবর্ষণ...মুসোলিনির বক্তৃতা···সুভাষ বসুর জ্বর...স্পেনে ১০৮টি গির্জ্জা ধ্বংস···চার বছরের মেয়ের অতীত জীবনের কাহিনী'···প্রকাণ্ড অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠা ভরা, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, ফেটে গিয়ে কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে দেয়...ওয়ালট্ ডিজ্‌নের ছবির মতন অক্ষরগুলো নেচে বেড়ায়, তবে বর্ণহীন, শব্দহীন, তাদের না আছে তালমান, না আছে মানুষঘেঁষা প্রতিকৃতি। কাগজের গায়ে গোবরের গোলা ছুঁড়েছে, সব কাঁচা, পাঁচ আঙ্গুলের দাগও ধরে নি। রমলা লেড়ীজ ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিল। খগেনবাবু পাশে এসে চুপি চুপি বল্লেন, 'কিশোরীর নতুন জুতো ও ঘাঘরা চাই, নচেৎ ছোকরা প্রেমিক নাচতে ডাকবে না...মুখের ও গায়ের গন্ধে অমন সুন্দরীরও বিয়ে হল না, হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ, রমলা···সমুদ্রের ধারে পোষাক-প্রদর্শনী, চমৎকার দেখতে মেয়েগুলো, কিন্তু অমন বোকা হাসি কেন ?. অন্তঃসারশূন্য, তাই দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি। দোষ দিচ্ছি না, চাই বৈ কি···মনের ক্ষতিপূরণ আছে, তবে সেটা কি কেবল দেহেরই মারফৎ ? অন্যায় নয় অবশ্য... কি বল ?' সাড়ীর আঁচল পিছনে টেনে রমলা ম্যাগাজিনটা ষ্টলে রেখে দিলে।

ষ্টেশনের বাহিরে একটাও টঙ্গা নেই, ট্যাক্‌সী নেই। একজন কুলী খবর দিলে যে টঙ্গা ও এক্কাওয়ালারা ধর্ম্মঘট করেছে, সর্দ্দার দিনে প্রত্যেকের কাছে আট আনা চেয়েছিল, কেউ রাজি হয় নি। পরে আয়-ব্যয়ের পার্থক্য রেখে টঙ্গা পিছু আট আনা ও এক্কা পিছু চার আনায় লোকটা রফা করতে যায়। দু'চারটে টঙ্গাওয়ালা

রাজি ছিল, কিন্তু তারা ঠ্যাঙানি খেয়ে ধাতস্থ হয়েছে। এখনও মিটমাট হয় নি, এখনই সামনের বাগানে মিটিং হবে। ট্যাক্সী লক্ষ্ণৌএ অচল, কেবল ঘোড়দৌড়ের সময় ছাড়া, তখন দেশ বিদেশের বাবুরা এসে এক সপ্তাহের ফুরণ করে নেয়— আর রাজা বাবুদের বাড়ির গাড়ি আছে। কুলী ফিটনে যাওয়া পছন্দ করলে না, বড় আস্তে যায়, কানপুরের ট্রেণ ছাড়বার আগে সহর দেখিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে না।

বাধ্য হয়ে খগেনবাবু ও রমলা ষ্টেশনের বাইরে এসে সামনের বাগানে বসলেন। মরশুমী ফুলের বাহার খুলেছে, লাল হলুদ গোলাপী 'ক্যানা', সবুজ ঘাস, ফিরিঙ্গী ছেলে মেয়ের লাল মুখ, রঙীন জামা—যেন সেতারের জোড়ের আলাপ। আয়ার দল প্র্যাম ছেড়ে বয়ের দলের সঙ্গে গল্প করে। একটি ছোট মেয়ে সবুজ রেলিংএ ধাকা খেয়ে ঠোঁট কাটল। রমলা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিলে—রক্ত পড়ছে, রুমাল রক্তে লাল হল, আয়া ভয়ে চেঁচাতে লাগল, 'লুসি ভারি পাজি মেয়ে, হারামজাদী সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়াবে রোজ, মেমসাহেব জরিমানা করবে, চাবুক নিয়ে তেড়ে আসবে।' রমলা আয়াকে খুকীকে নিয়ে বাড়ি যেতে বল্লে, গিয়ে যেন আইডিন লাগান হয়, ভয় নেই, মেমসাহেব বকবে না, হোঁচট খেয়ে সব ছেলে মেয়েরাই ঠোঁট কাটে। 'না, মেমসাহেব, আপনি জানেন না। এ মাসে আমার তিন টাকা কেটেছে, বেয়ারার দু টাকা, এক বোতলের দাম ফিরে এল সাহেবের।' 'ইনক্লিলাব জিন্দাবাদ'...একটি যুবক পার্কে ঢুকল, সামনে চলে লাল ঝাণ্ডা, কাস্তে আর হাতুড়ি আঁকা, পিছনে আসে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক। 'ভাইয়োঁ,'·· যুবক বেঞ্চের ওপর উঠে হাঁকে, 'ভাইয়োঁ-বহিনোঁ।' রমলাকে খগেনবাবু প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে বল্লেন।

কি ভাষায় যুবক কথা কইছে বোঝা যায় না, পান্তির মাঠে, স্বদেশী বক্তৃতার বাঙলায় তার অনুবাদ হয় না। এককাট্টা, মজদুর, কিষাণ, ক্রান্তি, সাহুকারী রাজ, কথাগুলি স্পষ্ট, বুলেটের মতন গোটা-গোটা। কিন্তু চার পাশে ধোঁয়া, জনতার

মুখে কালি ও তেলের দাগ, দেশী গাদা বন্দুক—নিশ্চয়ই তাই আওয়াজ জোর। মধ্যে একটি রাইফেল ঐ ছেলেটি, খদ্দর সাফ্, চোখ তীক্ষ্ণ, চুল ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামান, স্বর পরিচ্ছন্ন। ক্রমে ভিড় জমল। সেই হ্যারিসন রোডের ও গোলদীঘির লোক সমাগম, আর এই জনতা, একেবারেই অন্য রকমের, ভিন্ন জাতের, পৃথক ধাতুর। সেটার অস্তিত্ব দুপাশের চাপে নিয়ন্ত্রিত, এটার আকর্ষণ ভবিষ্যতের আহ্বান, সেটা নালার মধ্যে কাদার স্রোত, এটা ঘূর্ণিপাক, স্রোতের বুকে আবর্ত্ত। কোলকাতা সহরের এলোমেলো চৈতী হাওয়া গলির মধ্যে ঢুকে জঞ্জাল জড় করে, আর পূর্ব্ববঙ্গের বুনো ঝড় নিজের বেগে, আপন খেয়ালে নৌকা ডোবায়, ঘরের চাল ওড়ায়, প্রতীক্ষারতা নতুন বৌএর চোখে ব্যাকুল দূরদৃষ্টি আনে। কাজ দুটি আলাদা। কোলকাতার ভিড়ের শক্তি নেই, আনুগত্যই তার ধর্ম্ম; এই জনতার গতি আছে, অতএব শক্তি থাকতে বাধ্য। কিন্তু মতি? মন নেই তার মতি, মাথা নেই ত মাথাব্যথা!

কিন্তু ঠিক সেই জন্যই মতিভ্রম হবার শঙ্কা। এই লিভিয়াথান নির্ব্বিবাদে, সানন্দে আত্মসমর্পণ করবে মহাপুরুষের শ্রীচরণে, তেমনিই আড়ষ্টভাবে যেমন নৃত্য-শীলা কচিখুকীরা দুটো লম্বা হাত বাঁকাতে বাঁকাতে, 'পিয়'র পায়ে মাথা নোয়ায়; একত্রে রসজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির অপমান ক'রে। ইটালী, জার্ম্মানী, প্রায় সর্ব্বত্র এই ঘটেছে, এখানেও দেরী নেই। ভিড়কে জনতায়, সমাবেশকে সমবায়ে, ক্রাউড্‌কে ম্যাস্-এ পরিণত করার জন্য যে পারিপার্শ্বিকের, যে গণচেতনার প্রয়োজন সে কোথায়? তবে ভিড়ের টান আছে বলতে হবে, যার জোরে পিল্‌পিল্ ক'রে হাজার লোক বাগানে জমায়েত হল। আয়া বয় পালিয়ে গেল। 'জওহরলালকি জয়!' মহাত্মা গান্ধীর নাম নেয় না কেন এরা? অল্পক্ষণেই নেতৃবৃন্দ এলেন। বেঞ্চের ওপর তাঁদের স্থান করে দেওয়া হল। সকলেরই বয়স কম, নিশ্চয়ই বহুবার জেলে গেছেন প্রত্যেকে, মুখে কিন্তু সংগ্রামের ক্ষত নাই, অহিংসার প্রলেপে দাগ উঠে গেছে। খগেনবাবু আরো কাছে এলেন, কৈ কারুর চোখ আত্মপ্রসন্নতায়

স্তিমিত নয়ত! নিশ্চয়ই উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার নয়, যাঁরা বাঙলা দেশের মঞ্চ অধিকার করতেন, যাঁদের জন্য সভাস্থ ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতেন, যাঁদের মুখ দিয়ে ইংরেজী বুলি অনর্গল নিঃসৃত হত, মধ্যে মধ্যে বার্ক, ব্রাইটের বুখ্‌নী, পাতলা ঢাকাইএর ওপর জরীর বুটির মতন। বোধ হয় বৃত্তিটাই এঁদের দেশসেবা, আর শ্রীঘরবাস। মুখে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, চালাকীর নেই। একটু অন্য ধরণের বুদ্ধি, যেন একটু শান্ত, স্থির, ধীর রকমের। মনে হয় হিসেবী নয়, অথচ বে-পরওয়া চাউনিও নয়। চিন্তার ভারে কপালে দাগ পড়েনি, যুক্তিতে সবল নাও হতে পারেন, কিন্তু মনোভাবে গলদ নেই। একটা প্রাথমিক নীতিজ্ঞান তর্কবিচারের দায়িত্ব থেকে এঁদের নিস্কৃতি দিয়েছে। মহাত্মাজীর কৃপা? তাই যদি হয়, তবে তাঁর নাম নেওয়াই উচিত। তাঁর কল্যাণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক পরিবর্তন না লক্ষ্য করে যাবার উপায় নাই। কিন্তু তার বেশী আর কি ঘটল?

ইতিপূর্ব্বে একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ বেঞ্চের ওপর উঠে পড়েছেন। জনতা নীরব হল, পার্শ্ববর্ত্তী নেতারা মুখ তুলে চাইলে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বক্তৃতা সুরু করলেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন, এই সহরে তিনি একপ্রকার আগন্তুক, কিন্তু এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে কুলীদের, এবং সহরে এক্কাওয়ালাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে অনেক ন্যায্য দাবী আদায় করেছেন। যে-পন্থা সেখানে অবলম্বিত হয়, এখানেও তাই হোক—অর্থাৎ, টঙ্গা ও এক্কাওয়ালাদের মধ্যেকার বিরোধ ঘুচে যাক। এইভাবে ঐক্যসাধনের পর যে শক্তি তারা পাবে তাকে অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু সেটা পরের কথা, আগে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে বিবাদ মেটান কর্ত্তব্য। তার উপায় হল এই: সর্দ্দাররা চেয়েছে আট আনা ওদের কাছে, আর চার আনা তোমাদের কাছে। তোমরা সকলে মিলে সর্দ্দারদের বল যে চার আনার বেশী এক পয়সা তারা পাবে না, পাবার অধিকার নেই, দেওয়া অসম্ভব, জবরদস্তী করলে সত্যাগ্রহ করব। আরেকজন বক্তা উঠে সত্যাগ্রহের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি পাশের একটি স্বেচ্ছাসেবকের হাত

থেকে নিয়ে ত্রিবর্ণের জাতীয় পতাকা খুল্লেন। তাঁর মতেও চার আনার অধিক দেওয়া অন্যায়, এমনকি তাঁর ধারণা যে চার আনাটাই বেশী, তবে টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করতেই হবে, নচেৎ শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য। একজন লোক বেঞ্চের ওপর এসে বক্তার পাশে দাঁড়াল। মাথায় দোপাল্লি টুপি, গায়ে আদ্দির জামা, তার ওপর ওয়েষ্টকোট, পায়ে নাগরা, কিন্তু সব ছেঁড়া, নোঙরা, রঙ্গমঞ্চের মোসাহেবের পোষাকে যেমন আতিশয্যটা দারিদ্রকেই বাড়ায়, তেমনই। এই বোধ হয় লক্ষ্ণৌএর সেই বিখ্যাত এক্কাওয়ালা, যে ভোর বেলা থেকে মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত কেবলই ঠুংরী গায়, যার মেজাজ নবাবী, যার রক্ত খানদানী, যার রসিকতা অতুলনীয়, যার ভাষা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা, ..এ কি সেই? নিশ্চয়ই, ঐ যে বাবরী চুল, কানে আতর, মুখে জরদা, সমগ্র অবয়বে বিশেষত্ব, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কমনীয়তা, চাউনিতে লজ্জা। একপ্রকারের আভিজাত্য রয়েছে বটে, কিন্তু, কোথায় যেন পচ ধরেচে সন্দেহ আসে, ধুঁকছে যেন যক্ষ্মারোগী পুতুল বৌএর মতন। সভার কাছে লোকটি পরিচিত হল এক্কাওয়ালার মুখপাত্র ব'লে। লোকটি চারধার ঘুরে সেলাম করলে, পতাকাবাহী পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার প্ররোচনায় নীচু গলায় খানিকটা কি বল্লে, তার মধ্যে ফারসী বুলিই বেশী, তাই বোঝা গেল না। তবে তার ভদ্রতায় মনে হল যে সে আপত্তি করতে ওঠেনি। তার বক্তব্য শেষ হবার পূর্ব্বেই লালপতাকাধারী যুবকটি বাধা দিলে। তার প্রতি ভঙ্গীতে ফুটে উঠল অসমর্থন। লাল ঝাণ্ডা খাড়া ক'রে সে উচ্চকণ্ঠে বল্লে, 'ইয়ে নাহি হো শক্তা। এক্কাওয়ালাদের কাজ নয় টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে রফা করা...চার আনা যদি তারা রোজ দিতে পারবে তবে আর ভাবনা ছিল কি! কেউ দেবে না এক পয়সা! ধর্ম্মঘট চালাতে হয় আমরা চালাব। ষ্টেশনের সব কুলীরা কাজ বন্ধ করবে। যে-সর্দ্দার এদের শোষে, সে-সর্দ্দার ওদেরও শোষে। আর সবার পিছনে কাঁরা আছেন জানতে বাকি নেই!' বেঞ্চ থেকে একজন মুরুব্বী গোছের ভদ্রলোক বল্লেন, 'এই ধরণের দায়িত্বহীনতা অসহ্য। অহিংসানীতি মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না।' যুবক উত্তর দিলে, 'রফা আর রফা, কতদিন চলবে এই চালে!

অন্ধ যারা তারা কেন আসে নেতৃত্ব করতে!' তর্ক বাধল, দুটো ঝাণ্ডা পাশাপাশি উড়ছে, অন্য একজন যুবক বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠে হাঁকলে, 'লাল ঝাণ্ডা জিন্দা রহে!' রব উঠল, 'লাল ঝাণ্ডা, লাল ঝাণ্ডা .'

কখন ও কি ভাবে তিনি অতটা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন খগেনবাবু বুঝতে পারেন নি। এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে আসতে ফিরে দেখেন চারপাশে কাতারে কাতারে লোক, এক্কাওয়ালা, রেলের কুলী। সামনে ফিরে দেখলেন লাল ঝাণ্ডা পড়ে গেছে, একজন কুলী ছুটে এসে সেটা তুলে নিয়ে বেঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল। জাতীয় পতাকাধারী লোকটি খগেনবাবুর ওপর পড়ে গেলেন। চারপাশের লোক তখন উত্তেজিত হয়েছে। শোনা গেল পুলিশ আসছে। ভিড় পাতলা হতে সুরু হল, কিন্তু লোকেরা ছুটে পালাল না। শীতের নারকেল তেল রোদ্দুরের ঝাঁজে খানিকটা গলেছে, খানিকটা থোলো থোলো রয়ে গেল, জমাট ভাব রইল কেবল বেঞ্চের চারপাশে। তিন জন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা সামনে এল। দারোগা ভদ্রভাবে অনুরোধ জানালে হল্লা যেন না হয়। লাল পতাকাধারী যুবক উত্তর দিলে, 'হল্লা নয়, মিটিং, যা করবার অধিকার আছে, পার্ক সাধারণের জন্য', উয়ো জমানা চলে গেছে। হল্লা হবে না। আপনারা আসুনগে।' জাতীয় পতাকাধারী ভদ্রলোকটিও সায় দিলেন। দারোগা আরও নরম সুরে বল্লে, 'মিটিং করুন আপনারা, কিন্তু হল্লা থেকেই হাম্‌লা হয়। আপনারা আইন না মানলে সরকারের মান থাকবে না, এরাও হাতের বাইরে যাবে যে!' একজন কনষ্টেবল সামনে এগিয়ে আসতে যুবক ধমকে উঠল, 'যাও বাহার যাও, নিক্‌লো হিঁয়াসে।' পুলিশের দল পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, দারোগার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

খগেনবাবু প্লাটফর্মে ফিরে এলেন। দূরের এক বেঞ্চে রমলা বসে আছে, গালে হাত, পায়ের ওপর পা। ফিতে বাঁধা কালো জুতোয় সরু লাল পাড়, পায়ের গাট চোখে পড়ে, একটা নীল শিরা ওপরে উঠেছে। না, না, দাঁড়কাকের পা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলেতী বারণের অর্থ ছিল। কবি বলেন, মেয়েদের

অন্তরের সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হয় অঙ্গ ব'য়ে, আঙ্গুল দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে। আবার বৈজ্ঞানিকের মতে বাইরের সৌন্দর্য্য অন্তরকে আক্রমণ করে, কারণ, ভঙ্গীই ভাবের জন্মদাতা। এই ঠিক! অন্তরের আবার সৌন্দর্য্য কি? বসবার, দাঁড়াবার, নড়বার-চড়বার, সাজসজ্জার ঢঙেই মন মাতায়। ফটোগ্রাফারও তাই বলবে। সিনেমার খেঁদী পেঁচীরা অপরূপ হয়ে ওঠে এরই জন্য! সব সময় কি সত্য? কে জানে! সুজন নিশ্চই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাত। চিরকাল সে ভেসে বেড়াল—ডাঙ্গা পেল না। মঙ্গলে বিশ্বাসীদের দশাই তাই। তারা মঙ্গল ও সুন্দরকে যুগ্মপ্রত্যয় ভাবে, তাই পড়ে বিপদে। ফলে সত্য হয় যা অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর নয়। অথচ সমগ্র বিশ্বে অ-মঙ্গল ও অ-সুন্দর পরিব্যাপ্ত। তাকে বাদ দিলে ফাটা বেলুনের মতন জীবনটা কুচকে যায়। তারপর, যত ফুঁ দেওয়া যাক না কেন বেলুন আর ফোলে না। প্রেম, আত্মিক সাধনা, সাহিত্য, এ-সবে তার পেট ভরে না। সুজন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চর্চ্চায় নিজের পরিণতি কামনা করেছে, সুন্দরের আকর্ষণে নয়, তাই সে দুঃখী।

খগেনবাবু রমলার কাছে আসতে তার গালের হাড় চোখে পড়ল। হাত এত নরম, তুলতুলে, মুখ এত কঠিন কেন? এই ত' সেদিন পর্য্যন্ত কচি তালশাঁসের মতন ছিল। আঙ্গুলের মাথা চ্যাপ্টা, কলাপ্রিয় নয়। গলার কণ্ঠা দেখা যায়, উঁচু হাড়ের মধ্যে গর্ত্ত, আধ পেয়ালা জল ধরে। চমকে খগেনবাবু মুখ ফেরালেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং স্বপ্ন—এই দুয়ের অতীতে যার সন্ধান মেলে তার রূপ 'সর্-রিয়ালিষ্ট' ছবির মত অবাস্তব ও বীভৎস। কিন্তু হয়ত অতিক্রম করবার দরকার নেই। অদ্বৈতবাদের ঝোক কাটান শক্ত। তার চেয়ে—তোমার আমার মধ্যস্থিত বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুতকণার সৃষ্টি হল, তার ফুলকি তোমার-আমার আঙ্গুলে ধরল, জ্বলতে জ্বলতে ওপরে উঠল, শুখনো সলতে হলে ছাই এক মুহূর্ত্তে, নচেৎ ধিকি ধিকি, জ্বালা থামাবার জন্য কবিতার মলম ক্ষণে ক্ষণে। চোখের জল ঢাললে জ্বালা কমে না, বাড়ে কেবল, ফোস্‌কা আর ঘা হয়। সেই ক্ষতের স্মৃতি অসহ্য, যেন

ঘা দেখিয়ে ভিক্ষে চাওয়া। ভগবান রক্ষা করুন এই অভিমানের বিলাস থেকে সমগ্র স্ত্রীজাতিকে।

রমলা এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'ট্রেণ ছাড়বার দেরী নেই, চল গাড়ীতেই বসিগে।' রমলা উঠল।

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'কি ?'

'এ যেন সরাইখানা। এত বড় ষ্টেশন ভাল লাগে না। ছোট আশ্রমই ভাল। যত বড় জায়গা তত প্রকট হবে বিরোধটা। কৈ হোক দেখি ধর্ম্মঘট পাড়াগাঁয়ে, পুঁইমাচার তলায়।'

'কেন, ষ্টেশনটা চমৎকার নয় ?'

"ষ্টেশন হবে পাথরের, তাকে জড়াবে আইভি, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে থামবে এঞ্জিন-ও-ট্রেণ, আধখানা চাঁদের মতন, তোমার পুরু গাল যেমন ছিল তার মতন, দূরে দেখা যাবে লোহার কাঠামোর ওপর ঝোলা সিগ্ন্যাল, প্লাটফর্ম্মে থাকবে ক্যানার ঝোপ, বাইরের প্রাঙ্গণে থাকবে টু-সীটার, ট্র্যাপ্! ভারতীয় দৃশ্য নয়, কিন্তু এ-পোড়া দেশে কোনটাই বা স্বদেশী! বিদেশী, তাও নয়। আদর্শ জীবন মানেই হল কল্পিত বিদেশী পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা। সত্যকারের দৃশ্য নয়। পার্কে গোলমাল বাধল এইমাত্র,—সেটা স্বদেশী ? বিদেশী ? জগাখিচুড়ি। স্বদেশী ধারায় পঞ্চায়েৎ মিটিয়ে দিত, বিদেশী ঢঙে প্রস্তাব স্থাপন, গ্রহণ, অনুমোদন সব কিছুই হত। এটা অনুকরণ, খাঁটি মাত্র ঐ দোপাল্লিধারী এক্কাওয়ালাটা, কোন্ নবাবের বংশধর, এখনও বোধহয় পেন্‌শন পায়। তা হোক্, তবু সে সত্যিকার মানুষ, জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু, তবু মানুষ। দেখছ না চারধারে, রেলকোম্পানীর চাহিদা পূরণ করতে কাশী, জগন্নাথক্ষেত্র, হরিদ্বার, ম্যয় কাঞ্চনজঙ্ঘা, পর্য্যন্ত প্রাণপণে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের নিসর্গপটও ইংরেজের খয়েরখা। অথচ মনে আছে কাশীর গঙ্গায় মড়াভাসা, হাঁড়ি আর খড়ের জঞ্জাল, পুরীর মন্দির দ্বারে কুষ্ঠরোগী, আর হরিদ্বারে

ভণ্ড সন্ন্যাসীর ভিড়। সে-সব কোথায় এই ছবিগুলোতে? দৃশ্য নেই এদেশে, নবদম্পত্তির ফোটো দেখলে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসে। শুভক্ষণ, না অশুভক্ষণের যাত্রারম্ভ? স্বাভাবিকতা অসম্ভব এদেশে। সত্যাগ্রহ স্বদেশী, ধর্ম্মঘট স্বদেশী, কংগ্রেসরাজত্ব স্বদেশী? মহাত্মাজীর আবিষ্কার বলেই কি ভারতীয়?'

রমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'মিটিং ক'রে কি চায়?'

'ওরা দস্তরী দেবে না সর্দ্দারকে।'

'তুমি কি বল যে ওরা বিনা ওজরে দিক?'

'মোটেই না। কিন্তু না দেওয়ার ভঙ্গীটা নিজস্ব নয়।'

'দোষ কি তাতে?'

'না বেশী দোষ নয়, ময়ূরের পোষাক পরা দাঁড়কাকের চেয়ে। এও এক রকমের জবরদস্তী, স্বভাবের ওপর। অত্যাচারের বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হবার দৃষ্টান্ত—ভারতীয় ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে, কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন পংক্তিতে? থাকে যদি সে পাদ-টীকায়, তাও আবার দেশপ্রেমিক ভাষ্যকারের কৃপায়। (সহনশীলতাই এ দেশের ধর্ম্ম, রয়েছে আমাদের অস্থি মজ্জায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এদেশের মেয়েরা স্বপ্ন দেখে যে স্বামী ঠ্যাঙাচ্ছে, আর তারা মুখ বুজে সহ্য করছে, আর তারপর স্বামীর সোহাগ খাচ্ছে। লজ্জা নেই, তেজ নেই, তাই হল সতীত্ব।) একটা কবিতা আছে যেখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি বলছেন যে শূদ্র শূদ্র হয়েই ধন্য, কারণ ব্রাহ্মণের সেবা করতে পারবে চিরটা কাল।'

'অনুকরণ করবে না বলেই কি সকলে আধ হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকবে! ষ্ট্রাইক না হয় বিদেশী, কিন্তু স্বদেশী থেকেই ত' পরাধীন? সকলের জীবনেই একটা না একটা পরিবর্ত্তন আসে, তুমি বদলাও নি?'

'নিশ্চয় বদলেছি। সেটা নীতির ক্ষেত্র, একটি মানুষের ক্ষেত্রে, কিন্তু সমগ্র জাতের যে পরিবর্ত্তন আসবে তার উৎস হবে ইতিহাসের স্রোত।'

'সেটা বুঝি অন্তঃশীল? যদি পরিত্যাগের সাহস আমাদের সংস্কারে না থাকে, তবে তোমার মতে যারা শুষছে তারা ঠিকই করছে? আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, তাই বোকার মতন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যাই বল না কেন, শোষণটাও খাঁটি দেশী। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতরাও, যারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার গুণ সর্ব্বক্ষণ গায় তারাও এই হিসাবে খাঁটি স্বদেশী।'

'নিশ্চয়ই। যে-জাত স্বদেশী শোষণ প্রক্রিয়াকে প্রেম ভক্তি করুণা প্রভৃতি নাম দিয়ে নিজেকে চোখ ঠেরেছে, যার সমাজধর্ম্মের মূলকথা দায়িত্বজ্ঞান, যার দাসত্বে শিক্ষানবীশ হাজার বছরের ওপর, তার অধিকার-সচেতনতা নিতান্ত কৃত্রিম, তার আপত্তিটা উত্তেজনা মাত্র। তাকে আজ স্বভাব পরিত্যাগ করতে বল্লে সে চেঁচাবে, কেলেঙ্কারী বাধাবে, জয় রবে গগন ফাটাবে, তার পর, সেই ঘরে ঢুকে বিছানা নেবে, তামাক আর আফিম খাবে, কলেজে কাউনসিলে কারখানায় সুড় সুড় করে ঢুকে পুনর্মূষিক হবে। এর বেশী জোরাল প্রতিবাদ আমাদের কর্ম্মে ফুটে ওঠা শক্ত। কচি খোকার ককানি, স্নেহময়ী মাতা স্তন্য দান করিতে থাকুন, খোকার পেটে বিগেৎখানেক পিলে গজাক···বালসুলভ চপলতা, খানিকপরে ঘুমে নেতিয়ে পড়বে অকাতরে, শুভ অবসরে স্ত্রী যাবেন স্বামীর অঙ্গে, মাষ্টার হবে রায় বাহাদুর, জেল ফেরৎ নেতা হবে গবর্ণমেণ্টের খেতাবধারী চর, আর ধর্ম্মঘটের পাণ্ডা হবে মিলের জমাদার। রমলা, রমলা, এ চলবে না।'

রমলা হোঁচট খেল, সাড়ির পাড় গেল ছিঁড়ে। 'ধোড় তোলা জুতো পোরো না. স্যাণ্ডাল পোরো।'

"আমি খালি পায়ে হাঁটতে পারব না বলে দিলুম।"

লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর যেতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে। ইণ্টার ক্লাসের তক্তার ওপর নোংরা গদি, গা ঘিন্ ঘিন্ করে, তাই সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়াই ঠিক হল। ঐ প্রকার সরল জীবন যাপনে বিশ্বাস আসে না, চিন্তা কলুষিত হয়। কেন হবে না সে অবস্থা যেখানে তৃতীয় শ্রেণীও পরিচ্ছন্ন হবে? কিন্তু ততদিন নোংরামি ধাতে

বসবে না। সেকেণ্ড ক্লাস খালি। খগেনবাবু গদি ঝেড়ে দিলেন, রমলা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

'কি ভাবছ ?'

'এমনই, দেখছি।'

'আজ রাত্রে কোথায় মাথা গুঁজব জানি না।'

'ওয়েটিং রুমে থাকতে দেয় টাইম-টেবিলে লেখা আছে।'

'সেই ভাল, তুমি ঘুমিও, আমি প্ল্যাটফর্ম্মে টহল দেব। রুমালটা ফেলে দাও— ওটা লাল, এইটে নাও।' দেবার সময় খগেনবাবু জোরে আঙ্গুলগুলো টিপে দিলেন। 'কৈ হাত সরালে না?' হাত এলিয়ে পড়ল।

উনাও ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে। খগেন বাবু একজন খদ্দরধারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা কি। উত্তরে শুনলেন যে 'কিষাণ লোক' এক তালুকদারের বাড়ী 'ধাওয়া' করবে, পাছে গোলমাল বাধে তাই এই বন্দোবস্ত। 'ধাওয়া' মানে 'চড়াও', যাত্রা, শোভাযাত্রা নয়, প্রতিবাদ জানাবার জন্য সঙ্ঘযাত্রা। মহাশয় ব্যক্তি 'আবোয়াব' সংগ্রহ করেছেন তিন হাজারের কাছাকাছি, সেটা জমা না দিয়ে করেছেন বাজেয়াপ্ত। আপত্তি জানাতে বলেছেন যে সেটা বাকী খাজনা। প্রজারা উত্তর দেয় যে খাজনা তারা নিয়মিত দিয়ে এসেছে তহবিলে। তালুকদার রসিদের প্রমাণ চান, প্রজারা রসিদ দেখাতে পারেনি, কারণ রসিদের প্রথা সে তালুকদারীতে নেই। উলটে ম্যানেজারবাবু খাতা দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে খাজনা নেওয়াই হয় নি, কারণ অজন্মা হয়েছিল, এবং রাজা সাহেব দয়া করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য উশুল করেননি। কিষাণরা প্রথমটা অত বড় মিথ্যায় হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কংগ্রেস অফিসে খবর দেয়, ফলে কংগ্রেস কর্ম্মীর নেতৃত্বে হাজার পাঁচেক কিষাণ ছুটছে ধন্না দিতে কাছারী বাড়িতে, পরে হেঁটে যাবে লক্ষ্ণৌয়ে, কাউনসিল হাউসের সামনে কিষাণদের গ্র্যাণ্ড র‍্যালি হবে, ভিন্ন জেলার লোকজনও আসবে। তারা চায় প্রতিকার।

'মারপিটের সম্ভাবনা আছে ?'

'তিলমাত্র নেই, তবে যদি ওপক্ষ না বাধায়।'

'আপনারা অহিংসপন্থী, কিন্তু একি আগুন নিয়ে খেলা নয় ?'

মহাত্মাজীর নামেই জল। তিনি জ্বালাতেও জানেন, নেবাতেও জানেন।'

ট্রেণ ছাড়ল উনাও থেকে।

'স্বাগ, রমলা, পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হয়।'

'কাকে ?'

'এই নামের শক্তিকে।'

'তবু ভাল ! কেন, কীর্ত্তন শোন নি ?' খগেন বাবু হেসে ফেল্লেন।

এই প্রদেশে একটা ওলটপালট চলেছে। যত বাধাই থাক দেশের লোক রাজত্ব হাতে নিলে স্বাধীন প্রয়াসের সুযোগ ঘটেই। তার ওপর যদি সেই সব লোক স্বার্থত্যাগী হয় তখন তাদের আশ্রয়ে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হবার সম্ভাবনা বেশী হবেই। বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেস গুরুভার গ্রহণ করল না, তাই বাঙ্গালী স্বাধীনতার আস্বাদ পায় নি, ফলে নীচ দলাদলি, গালিগালাজ, হিন্দু মুসলমানের অসম্ভব অসদ্ভাব। গোদের ওপর আবার বিষফোড়া ! বৈশিষ্ট্যজ্ঞানের অহঙ্কারই বাঙ্গলার কাল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল, শিক্ষার মোহ আর ভদ্রোজনোচিত বৃত্তি তার অভিশাপ। বাঙ্গালী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে ফ্যাশিজমের বীজ রয়েছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ আজ প্রগতিশীল। লক্ষ্ণৌ, কানপুরের ধর্ম্মঘট, উনাওয়ের ধাওয়া, মীরাটের মেথর সমস্যা, গোরখপুর জেলার মহারাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলন, যার তুলনা ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের কিছু পূর্ব্বের প্রাদেশিক আন্দোলনে পাওয়া যায়। এদেশ জাগছে, সত্যি জাগছে; বাঙ্গলা সেই কবে একবার দাঁড়িয়ে উঠে পাশ মুড়েছিল, আবার ঘুমুচ্ছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, চেঁচাচ্ছে, জোর স্বপ্নাবিষ্টের মতন চোখ বুজে বেড়াচ্ছে শ্রেণীস্বার্থ-টি বেশ বজায় রেখে। বাঙ্গলা দেশে বাস দুঃসহ। যে

দেশে কেউ কখনও চোখ খুলে সত্যের দিকে তাকায় না. সেখানকার পরিশীলনের প্রত্যেক অঙ্গটী সামাজিক সত্য থেকে পালাবার জন্য সাধা। সাহিত্যিক, কলাবিদ, নেতা, সকলে পালাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। গুণ্ডার ভয়ে যারা দেশ-ত্যাগী হয় তারাই একমাত্র কাপুরুষ নয়, কাজটা তাদের মাত্র স্থূল, ব্যস, এইটুকু। নিজেকে খগেন বাবুর নিতান্ত বাঙালী বলে মনে হয়!

আদৎ কথা, যেখানে হোক জীবনের পরশ লাগলেই হল। প্রাদেশিকতা তাদের, যাদের ঘর বাড়ি আছে, ছেলের চাকরী না হলে যাদের চলে না। সাবিত্রী যখন ছিল তখন বাঙালী, এখন বন্ধনহীন, মাসীমাও নেই যে পিছন টান থাকবে, রমলা যেভাবে থাকে সেটা ভারতে সর্ব্বত্র চলে। বাস্তবিকই ত, বাঙলা দেশ জন্মস্থান বলেই কি ভারতীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বড়র জন্য ছোটকে ত্যাগ করা ন্যায়সঙ্গত। ঢেউগুলো আরো ছড়িয়ে যাক, ভারতের বাইরে, চীন পারস্যে, এশিয়া আফ্রিকায়, যেখানে স্ত্রী পুরুষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঁচতে, আরো ভালভাবে বাঁচতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে, বাধাহীন, সংশয়-হীন আত্মপ্রত্যয়ে।

একটু কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। একলা কি দোকলার কর্ম্ম নয় সন্দেহ হয়। নিজের মূলধন কতটাই বা। পায়ের তলার অনড় মাটি, দুপাশের চেনা গাছ পালা, ওপরে পুরানো আকাশ, কাছে, খুব কাছে না হলেও, কাছে পরিচিত মুখ—এ সব চাই; নচেৎ সাইবেরিয়া থেকে উড়ে এসে দুদিনের জন্য ঝিলে বসা, আবার ওড়া হাজার হাজার মাইল ধরে—এ-কেবল পাখার পরিশ্রম। পাখীদেরও ভূম্যধিকার জ্ঞান টনটনে, বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু যাদের সে তাড়না নেই, যারা চৈতন্যের দ্বারা স্বার্থজ্ঞান অতিক্রম করতে সক্ষম তাদের পক্ষে প্রাদেশিকতা কূপমণ্ডুকতার অনুরূপ। 'রমলা, আমরা এখানেই থাকব, কানপুরে। কাশীর পালা সাঙ্গ। এখানে জীবনের নতুন বীজ পড়েছে, তোমার-আমার এই হল প্রকৃত প্রতিবেশ।'

'আগে ছাখ, পছন্দ হয় কিনা তারপর যা হয় ঠিক করা যাবে। আমি ভেবে-ছিলাম, আর বাসা বেঁধে ফল নেই তোমার ধারণা।'

'ভুল বুঝেছিলে বলব না। এখন আমিই অন্য রকম হয়েছি!'

'তা একটু বদলেছ', বলে রমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কানপুরে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। প্লাটফর্ম্মের আলো জ্বলল। ওপরকার পুল পার হয়ে পয়লা নম্বরের প্লাটফর্ম্মে আসতে হয়, সেটা জমজম করছে, নিশ্চয়ই ট্রেণটা হাওড়া একস্প্রেস। একটা বেঞ্চের পাশে মালপত্র রেখে খগেনবাবু ও রমলা হিন্দু রেস্তরাঁয় গেলেন। ঘর পরিষ্কার, টেবিল, পিরিচ-পেয়ালার ওপর স্বত্ত্বাধিকারীর নামের আগ্যাক্ষর লেখা, কাঠেব ছোট ছোট কুটরী পর্দাঘেরা, দেয়ালে তাজমহল, কাশীর ঘাট, কুতবমিনারের তৈলচিত্র ঝোলান। খগেন বাবু 'দেশী' খানার অর্ডার দিয়ে একটি ছোট কুটরীতে বসলেন। 'বয়' খাবার আনল। রমলার মাথা ধরেছে তাই খেতে পারলে না। আটার রুটিতে গন্ধ, ডালে পেঁয়াজ, চাটনী দিয়ে এক গ্রাস ভাত পেটে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'বোকামী হয়েছে। তুমি বস, আমি আসছি।' বাইরে এসে ম্যানেজারের কাছে খবর পেলেন যে দেশী হোটেল যা আছে তাতে সুবিধা হবে না, 'রিস্তাদার' যখন সহরে কেউ নেই তখন রাতের জন্য ওয়েটিং রুমেই থাকা ভাল। ম্যানেজার নিজে খগেন বাবুকে ষ্টেশন-সুপারিটেণ্ডেণ্টের কাছে নিয়ে গেলেন। নাম লিখতে হল মিষ্টার ও মিসেস। রেস্তরাঁর 'বয়' বিছানাপত্র খুলে দিলে। 'আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার, দু-বোতল সোডা ও দুটো গ্লাস এখনই পাঠিয়ে দাও, সকালে দুটো ছোট হাজারি এন সাতটায়, দুধ যেন তাজা হয়, না পাও কনডেন্স্ড্ মিল্কের টিন্ এনে এখানে খুলো।'

রাত বেশী হয়নি, অবশ্য তবু তুমি শুয়ে পড়, সারাদিন গাড়িতে এসে ক্লান্ত হয়েছ। আমি একটু প্লাটফর্ম্মে ঘুরে আসি, কোনো বই আনব ?,

'না।' (রমলা জুতো খুল্লে। খগেন বাবু পায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ছোট্ট পায়ের হাঁপ লাগে না? মাসীমা ছেলেবেলা গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে বলতেন—ওম্ করে শো। মুড়ি দিতাম, পরে হাঁপ লাগত, নাক বার করতুম, কান, গলা, হাত, বুক…"

"ওগো তোমার পায়ে পড়ছি মাসীমার কথা থামাও। তাঁর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! সাবিত্রী…"

'তার নামটাও না হয় নাই তুললে!'

'বেশ বলব না, ক্ষমা কর,) কিন্তু…'

'আচ্ছা তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি একটু আসছি।'

ষ্টেশনের ষ্টলে বই সাজান! বেশীর ভাগ কলোনিয়াল সংস্করণের, ভারতীয় মস্তিষ্কের উপযোগী খাদ্য। ট্রেণেই যা কিছু সময় মেলে গোলামী থেকে, তাই মূর্খরাও শিক্ষিত হতে চায়। অবচেতনার নিম্নতম স্তরে যেসব গুপ্ত ইচ্ছা লুকানো থাকে তাদের প্রশ্রয় দিতে পারলেই ব্যবসার মস্ত সুবিধা। প্রকাশকবৃন্দ মনের এই গূঢ়তত্ত্বটি ধরেছে, তাই তাদের তহবিল ভর্ত্তি। যত বাধা তত গুপ্তি, যত সভ্যতা তত বাধা। এমন সমাজ কল্পনার অতিরিক্ত নয় যেখানে বিবেকের সূক্ষ্ম অথচ নির্ম্মম অত্যাচারে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্মগোপনে তৎপর হবে না, ফলে প্রকাশের তাগিদ কমবে, আশা পূরণের সাহিত্যের চাহিদা দুর্ব্বল হবে। সেখানেই আসবে সৎসাহিত্যের সুযোগ। জুজুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত চিরকাল…ছেলে বয়সে পিতৃ-পিতামহ, যুবা বয়সে পরীক্ষক, পরে কারখানার মালিক যার এক কলমের খোঁচায় চাকরী যায়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিশ্চিত কাঠামো ভূলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু পুরুষেরাই কি একলা ভয় দেখায়? রমার মতে মাসীমার দলও নির্দ্দোষ নন। যাকে 'মাদার ফিক্‌শেসন্' বলে তার মূলেও কি ঐ একই ভয় রয়েছে। শাশুড়ি-বৌএর কলহের প্রাথমিক কারণ ঐ; বৌ চায় ছেলের ঘাড়ের ভূত ছাড়াতে, দোষের মধ্যে সে আরেকটু চায়, নিজে পেত্নী হয়ে বসতে। স্বাধীন করাটা যদি স্ত্রীর উদ্দেশ্য হত,

তবে স্ত্রৈণ হওয়ার মতন সুকর্ম্ম আর থাকত না। কিন্তু সম্পত্তিবোধ দুর্নিবার। সাবিত্রীর নাম নিতে রমলার ওপর রাগ এল।

গোল্যাংক্সের বই রয়েছে বিস্তর। বামমার্গী সাহিত্যে ছেয়ে গেল দেশ। বাঙালী মেয়েদের দ্বিতীয় ভাগের পরই যেমন রবীন্দ্রনাথ, পুরুষদের তেমনই বি, এ. ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকের 'নোট'-এর পরই কোনো সাহেবের মার্ক্স ব্যাখ্যা। মার্ক্স্ নয়, মার্কস-ব্যাখ্যা, তাও পচা, সস্তা, ভুল, এক পেশে। হেগেল, আডাম স্মিথ না পড়ে 'ক্যাপিটাল' কপ্চান, মার্ক্স না ছুঁয়ে লেনিন, লেনিন না দেখে ষ্ট্যালিন, তাও না, দু আনার ঋজুপাঠ। কাঁচাপাকার অদ্ভুত সমাবেশ, বাঙালী মেয়েদের মতন, এধারে স্বার্থপরতায় ঝানু, ওধারে ভেদ্দারের চেয়েও মস্তিষ্ক অপরিণত, কচি থেকেই পচা, তাই ভিজে, শ্যাওলা ধরা, উর্ব্বর, স্বল্পজীবী ; পানাপুকুরের মশকী কামড়েছে পায়ে, গা শির্ শির্ করে, এখনই কম্বল আর কুইনীন চাই। বই না কিনে খগেনবাবু ওপরে এলেন।

রমলা চেয়ারে বসে ছিল! 'শোওনি? মাথা ছেড়েছে?' রমা ঘাড় নাড়ল। বিছানা আমি পাতছি।' রমলার দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার ব্যগ্রতা নেই, জীবনের চিহ্ন নেই। উঠে সে সাহায্য পর্য্যন্ত করলে না। খগেনবাবু পাশ ফিরে শুয়ে বল্লেন, 'যখন ইচ্ছে হবে আলো নিভিয়ে দিও।' ষ্টেশনের কোলাহল থামল। ভোর বেলাতেই রমলা স্নান সেরে চেয়ারে বসে আছে জানলার ধারে।

• •

(২)

তখনও সকাল হয় নি, নানা স্বরের ভোঁ-তে খগেন বাবুর ঘুম ভাঙ্গল। থামতেই চায় না, সরু মোটা ঘন পাৎলা গম্ভীর হালকা, কেউ ডাকছে উঠে পড়, কেউ বলছে ছুটে আয়, ঐ দ্যাখ্ মজুরণী বাজরার রুটি পাকিয়ে তাতে নুন মাখাচ্ছে, খোকার বুড়ো আঙ্গুলের নখে খয়েরী আফিমের পালিশ ঘষলে বাচ্ছা চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়বে, চেঁচিয়ে মার রোজগারের ক্ষতি করবে

না, বে-মওকা দুধ খেতে চাইবে না। একটা আওয়াজ ষ্টীমারের মতন একটানা, তৈলধারাবৎ, ভবিষ্যধর্ম্মের অনাহত ধ্বনি। খগেনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

ছোকরা চা আনল। টঙ্গা পাওয়া শক্ত, তবে হুকুম পেলে সারাদিনের জন্য, সস্তায়, টাকা পনের ও পেট্রলের দাম দিলে, একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত তখনই সে করতে পারে। রমলা কি বলতে যাচ্ছিল, খগেনবাবু বাধা দিলেন। চা পানের পর খগেনবাবু হোটেলের সন্ধানে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন।

কানপুরের ষ্টেশন বড়, কিন্তু সামনেকার রাস্তা অপ্রশস্ত, অযোগ্য। এ সহরের মুখ নেই, থাকতে পারে না। রাস্তা পাকা, কিন্তু কয়লার গুঁড়ায় কালো, আকাশ ধোয়ায় ভরা, বারো বামণের তের চুলোর ধোঁয়া শাদা থামের মতন ওপরে ওঠে, ওপর থেকে কলের চিমনীর ওলট-খাওয়া ধোঁয়া কয়লার ভারে নীচে নামতে চায়— দুটোর রফায় সূর্য্যের আলো হ্রাস পায়। এক ফোটা হাওয়া নেই, রুদ্ধশ্বাস সহর দুর্ভেদ্য নিম্নগামী আপ্‌লুটন স্তর তাকে চেপে মারছে। রেল-লাইন পার হয়ে সহরের প্রশস্ত রাস্তা, তার একধারে বড় বড় দোকান, অন্য ধারে নীচু ঘরের সারি, টিনের চাল দেওয়া, খাপরার। ছোট বড়র ঘেঁষাঘেষি বসবাস। একটু এগিয়ে পুরানো ধরণের বাড়ির নীচের তলায় দোকান ঘর। মধ্যে মধ্যে বসতবাটিও রয়েছে সন্দেহ হয়। হঠাৎ বড়-মানুষের বাড়ির কুটনো-কোটা, ভাঁড়ার-বার-করা গিন্নী কর্ত্তার মান রক্ষার জন্য কস্তাপেড়ে সাড়ির আঁচলে ভারি চাবির গোছা বেঁধে, গালে পান দোক্তা ঠেসে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে রূপোর পানদান নিয়ে, ক্ষয়িষ্ণু চুলে পাতা কেটে বিশ ভরীর চুড়ি আর বেনারসী প'রে সান্ধ্য পার্টিতে বেরুবেন, এই সব বাড়ি থেকে, খাতির পেতে।

একটা লেভেল ক্রসিংএর ফাটক বন্ধ সকালবেলাতেই। কলের সাইডিংএর মালগাড়ি এগুচ্ছে পেছুচ্ছে পনের মিনিট ধরে, সহরের যাতায়াত থামিয়ে। ফাটক খুলে গেল, ওপারে মস্ত মিল্, ফাটকে কনষ্টেবলের গাঁদি। আরো

আগে বড় রাস্তার বাঁ পাশে বাজার, ছেঁড়া টায়ারের, কাটা কাপড়ের, পুরানো জামার, সাইকেল-মেরামতের। রাস্তার ওপর দো-দো পয়সার খেলনা পাতা। কোথাও হোটেল নেই।

সহরে এক চঞ্চলতার চিকিমিকি। রাস্তার পাশে খোলা যায়গায়, চৌরাহায়, বিশ পঁচিশ জন লোকের জটলা। আরো এগিয়ে বাঁ দিকে বড় মাঠে লোকে লোকারণ্য. ডিমের পোচ্ এর মতন মাঝখানে ফোলা, কিনারায় ভিড গড়িয়ে পড়ছে। ফোলা জায়গার মাথায় খদ্দরের টুপী। রোদ্দ্রের তেজ বেড়ে চল্ল, শীঘ্রই হোটেল, না হয় বাড়ীর সন্ধান চাই। খগেন বাবু একজন ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, 'একটা ভাল হোটেল কোথায় পাওয়া যায় যেখানে ভদ্র পরিবার সপ্তাহ খানেকের জন্য থাকতে পারে?' 'পাওয়া যায়, তবে দেশী লোকের জন্য নয়। একবাব তিলক হোটেলে দেখুন।' একটি দেশী ও গোটাদুই বিদেশী হোটেলের ঠিকানা পাওয়া গেল। ফেরবার পথে বড মিলটার সামনে একটা সভা চলছে, পাশে পুলিশ প্রহরী। কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে. খগেনবাবু চলে যাচ্ছেন এমন সময় বক্তা মুখ ফেরাল পরিচিত ভঙ্গীতে! বিজন দেখতে পায়নি।

এখানে বিজন এল কি করে! রোদ্দুরে মাথা ধরবে ছোকরার, একি খদ্দরের টুপীর সাধ্যি! টেনিস ছেড়ে দেশপ্রেমের খেলা ধরেছে, তা ভাল, তা ভাল, রমাকে কি একটা লিখেছিল, রমার সঙ্গী হল, এক্কেবারে একলা থাকে, নিজেকে আরো সরিয়ে রাখলে শেষে পাগল হবে, বেচারী নিজের প্রতিবেশ চায়, যে-আশা করেছিল তা পেল না, ভালবাসুক না বিজনকে, বোনের মতন, মা'র মতন। পরে সুজন এসে জুটবে, জমবে ভাল রমাদির দুজনকে নিয়ে, পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যাবে জমবে ভাল, অনেক নিয়ে, তা ভাল তা ভাল।

হাত বাড়িয়ে বিজন কাকে ডাকলে। ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে এল, পিপের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলে। বক্তৃতা, আর বক্তৃতা, মধ্যে মধ্যে ইন্‌কিলাব্, আরো কত নিরর্থক চীৎকার।

বিশালকায় নদীর দুর্নিবার বহতা বাঁকের মুখে ঘাটে আটকেছে। পুরানো ঘাট, এককালে সওদাগর মশাই ময়ূরপংখীতে পণ্যদ্রব্য ঠেসে লক্ষ্মীর সন্ধানে বেরতেন, মাথায় থাকত আদিম দেবদেবীর অভিশাপ। এখন ঘাটের [illegible] ভাঙ্গা, বহতা দূরে সরেছে, সামনে পড়েছে কাশে ভরা একটা চড়া। হয়ত কোনো কালে একটা অশ্বথ গাছ [illegible]তে ডোবা চড়ায় ঠেকেছিল, তাকে ঘিরে খড় কুটো জমল, সেটার আশ্রয়ে তৈরী হল চড়া। স্রোত রইল না, বজরা চলল না, আলস ভরে ভাসে কেবল জেলে ডিঙ্গী, গ্রীষ্মকালের ভোরবেলা পল্লীবধূ বালি ভেঙ্গে জল আনতে যায়, তাও শুখল বুঝি এ ক'বছর। এই হল দেশী বক্তৃতার স্বরূপ, দেশী সাহিত্যের প্রকৃতি, বালিভরা খাত আর কথার চড়া। অবশ্য, আত্মপ্রকাশের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা কর্ম্মপ্রবাহ থেকে বিরতি থাকে। চিন্তা ও কাজ সপিণ্ড হতে পারে কিন্তু যমজ নয়। এককাল ছিল যখন রক্তস্রোত থামাতে বাক্যের প্রয়োজন হত। পরে বাক্যের ছড়াছড়ি, পুঁথির পাহাড়, আদর্শের বড়াই, আর্টের জন্য আর্ট, চিন্তার জন্য চিন্তা, কথার জন্য কথা। প্রতিক্রিয়ায় নেচে উঠেছে রক্ত। ভারতবর্ষের রক্ত ঠাণ্ডা, কারণ নাকি তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির তুষার গলা অহিংস ধারা মিশেছে। হয়ত বা এদেশে এখন স্রোতই নেই, চরের বালি চিকচিক করতেই জানে, জোর তার বুকে কাশ ফুল দোলে। লোকে বলে বাঙ্গালী বেশী কথা কয়, কিন্তু এদেশে কথার রাজত্ব সুরু হয়েছে, আর রক্ষে নেই, এইবার সাহিত্যের পালা, মাসিক পত্র, সাহিত্য সভা কে সাহিত্য-সম্রাট, কে সম্রাজ্ঞী, খেয়োখেয়ি দলাদলি তাই নিয়ে। ভগবান রক্ষা করুন এই অ-বাঙ্গালী ভারতীয় জাতিসমূহকে, যেন তারা সাহিত্যের খপ্পরে পড়ে আত্মপ্রসাদে উচ্ছন্ন না যায়।

'এই যে আপনি! কোত্থেকে? রমাদি?'

'ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে হাজির।'

'রমাদি?'

মোহানা

'ষ্টেশনে।'

'ষ্টেশনে কেন? কবে এলেন? আজই?

'এসে পড়লাম।'

'বাসা কোথায়?'

'তাই খুঁজছি। একটু সাহায্য করুন না?

'আপনি টাপনি ছেড়ে দিন। তাই ত', আজ আমরা বড় ব্যস্ত। তা হোক, চলুন, ইনি সফীক্। কম্‌রেড, একবার আমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে।'

'যাও। ওখানকার ব্যাপারটা দেখে এস।'

পথে বিজন খগেন বাবুকে সহরের চঞ্চলতার কারণ বুঝিয়ে দিলে। কানপুরে মজুরের দল এককাট্টা, সেইজন্য তারা মালিকদের চক্ষুশূল। তাদের সভার নাম 'মজ্‌দুর সভা'। আগে যে সভা নিরীহ অর্থাৎ নিস্ক্রিয় ছিল, এখন তার সংখ্যা বেড়েছে, ফলে, সক্রিয় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আপত্তি এই যে মজদুর সভার ক্রিয়া-কলাপ আজ মজদুরদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে আবদ্ধ নয়, ক্রমেই পলিটিক্যাল, অর্থাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠছে। এই শিশুকে আঁতুড় ঘরেই মারতে না পারলে সমূহ বিপদ, অতএব মজদুর সভার কর্ম্মীদের জব্দ করা চাই। উপায় হল বিনা অজুহাতে তাদের চাকরী খাওয়া। মজদুর সভা আজ সচেতন মজুরদের অগ্রদূত, তাই সে আজ বাঁচবার জন্য লড়তে প্রস্তুত। পরের কৃপায় বাঁচা নয়, আপন শক্তিতে বাঁচা। একজনকে তাড়ালে সমগ্র মজদুর সভা তার হয়ে লড়বে। খগেন বাবু বল্লেন, 'এখন সরকার দেশের, অতএব কাজটা শক্ত হবে না।'

'এক হিসেবে শক্ত, অন্য হিসেবে সোজা। কংগ্রেস সরকার কানপুরের গোলমাল থামাবার জন্য একাধিক কমিটি বসিয়েছিলেন; শেষ কমিটি একটা প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেছে। প্রথমে মালিকরা তার সামনে সাক্ষ্য দিতে নারাজ হয়, পরে বাধ্য হয়ে রাজি হল বটে, কিন্তু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলো তারা মানল না। শেষে অবশ্য বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু সেটা নিতান্ত মৌখিক। ভেতরে ভেতরে

তারা উঠে পড়ে লেগেছে-যাতে সব পণ্ড হয়। গুপ্ত উদ্দেশ্য অবশ্য স্বদেশী সরকারকে বিপদে ফেলা। বিপদ এই, আমাদের সরকারও শান্তিতে রাজ্য চালাতে চান, সেটা কত অসম্ভব তাঁদের ধারণা নেই। সহানুভূতি থাকলে কি হয়। থুতুতে ছাতু ভেজে না।'

'আপাতত ব্যাপারটা কি?'

'মজদুর সভার একজন কর্ম্মীকে মালিক বরখাস্ত করেছে, ছুতো সে নাকি কাজে বড় ঢিলে। অথচ সে একজন সত্যকারের হুসিয়ার লোক। কখনও কেউ তার কাজে গাফিলতী দেখাতে পারে নি। কিন্তু তার দোষ যে সে মজদুর সভার বড় পাণ্ডা! সভার তরফ থেকে আপত্তি জানান হয়েছিল, ফল হয় নি। যদি মাত্র একটা দৃষ্টান্ত হত, তবে বোঝা যেত, কিন্তু এ রকম প্রায়ই ঘটছে। আমরা ষ্ট্রাইকের জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় মালিক জন-কয়েক নিজেরাই লক্-আউট করেছে। এটা অসহ্য!'

'ব্যাপারটি ষ্ট্রাইক না লক-আউট?'

'দুইই, যে ভাবে দেখেন। আদৎ কথা, বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করা চাই। ধর্ম্মঘট জোরে চালাতে হবে।'

বিজনকে নিয়ে খগেনবাবু ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে এলেন। আরসীতে ছায়া পড়তে রমলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল! খগেনবাবু বল্লেন, 'একেই বলে দৈব। হঠাৎ দেখা। বিদেশে ওরই আশ্রয়ে থাকতে হবে।'

'ভালই করেছ।' ঠোঁট চেপে রমলা মুখ ফেরালে।

'এখন না হয় আমাদের আড্ডায় ওঠ, তারপর, বাড়িতে যেও। আজ আমরা একটু ব্যস্ত। তবে কষ্ট হবে বলে দিচ্ছি।'

খগেনবাবু বল্লেন, 'এমন কষ্ট আর কি হবে! তা ছাড়া, তুমি যখন নিয়ে যাচ্ছ, তখন ওঁর ভাল লাগবেই।'

'তা ঠিক নয়। আমি যা পারি আপনারা তা পারবেন না।'

'রমাদির সঙ্গে গল্পও হবে !'

'গল্প ? গল্প আর করি না। বেশ তাই চল, দেখি কি হয় !'

বিজন একটা ট্যাক্সীতে মালপত্র ভরে নিজে সামনে বসল।

বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে, পচা নর্দ্দামা দুপাশে, অনেকটা দশ পনের বছরের আগেকার বাঙলা নব্য সাহিত্যের বস্তীর অনুকরণে। তবে এমন দুর্গন্ধ কোলকাতার মধ্যে নেই, মেলে সহরের আশে পাশে, খিদিরপুর আর টিটাগড়ে যার পাশ দিয়ে দিয়ে ট্রেণে যেতে ডেলী প্যাসেঞ্জারদের নাকে রুমাল গুঁজতে হয়। কানপুরে সে গন্ধ ম্যালের এ-পিঠে ও-পিঠে সুলভ। ট্যাক্সী যেখানে থামল সেখানটা একটু খোলা, তারপর আর রাস্তা নেই। সামনে একটা খাপরার বাড়ি, চুণকাম করা দেওয়াল, দরজা জানলায় চিক্ টাঙ্গান। দুটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালপত্র নামালে। বিজন পরিচয় দিলে, 'খগেনবাবু ও ভাবীজী, কমরেড কিষণচাঁদ, মহবুব।' ঘরে প্রবেশ করবার সময় বিজন রমলাকে নীচু গলায় বল্লে, 'এখানে বাথ রুম্ টুম্ নেই, উঠোনের কোণে কলঘর, ব্যস্। খিদে পেলে খেয়ে নিও। ষ্টেশনে খেয়ে নিলে পারতে। খেয়েছো—তবু, দুপুরে যা পায় তাই খেও। নতুন কিছু শিখেছ ? মোমফালীর স্যাণ্ডউইচের জন্য জিব এখনও সক্ সক্ করে। আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি।'

ঘর ছোট নয়, কিন্তু বসবার জায়গা আলাদা নেই। গোটা চারেক দড়ির খাটিয়া পাতা, কোলকাতায় যাতে মড়া বওয়া হয়, তার ওপর নোঙরা বিছানা, যা নিমতলায় পড়ে থাকে, মাটিতে জুতো-চাপা ঘসা-মাথা সিগারেটের টুকরো, যা কুড়িয়ে ভিখারীরা টানে। কাঠের টেবিলে চা-বাটির গোল গোল দাগে ভরা ছাপা খদ্দর, যুবক-সমাজের নামাবলী, উপচে পড়ছে হলদে আর লাল মলাটের বই, পত্রিকা, প্যামফ্লেট, কাটা খবরের কাগজ। একটা দেওয়ালে জহরলাল, গান্ধীজীর ফোটো, অন্য দেওয়ালে একজন যুবকের, চোখে যার পাগল চাউনি। সবার ওপর ষ্ট্যালিনের ছবি, মাথায় কসাক টুপী। এক কোণে কংগ্রেসের

ত্রিবর্ণ পতাকা, তার ওপর লাল ঝাণ্ডা। পতাকা মোটা খদ্দরের, রঙ ম্যাড় ম্যাড় করছে। রমলা চোখ ফিরিয়ে নিলে দেখে খগেনবাবু হাসলেন। 'কেন, পছন্দ হল না?'

'কাঁরা এই সব রঙ বেছেছিলেন?'

'নেতৃবৃন্দ।'

'জওহরলাল আপত্তি করেন নি?'

,সরোজিনী নাইডুর নাম করলে না?'

'জওহরলালের রুচিতে বাধল না! এই সমাবেশ কোনো সৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তি সহ্য করতে পারেন না।' বিজন বল্লে, 'খগেন বাবু ঠিক ধরেছেন। জওহরলালকে মেয়েরা দেবতা ভাবে।' রমলা উত্তর দিলে, 'তা নয়। তাঁর নিজের মতামত আছে।' 'সে কথা আর তুলো না, রমাদি। নিজে স্বীকার করেছে যে মহাত্মাজী যা করেন তাইতে তিনি শেষকালে সায় দেন। ওইটাই ত' আমাদের চরম ক্ষোভ। আজ যদি তিনি তাঁর কবল থেকে মুক্ত হতেন তবে আর ভাবনা ছিল কি! আমার বিশ্বাস, পতাকা মহাত্মাজীর আবিষ্কার না হলেও তাঁর মনোমত।'

'যাঁরই মনোমত হোক না কেন বিজন, তোমার রমাদির পছন্দ নয়; ওঁর বক্তব্য এই বোধ হয়ঃ ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামরা, চেঁচালেই উচু থাকে না। ঝাণ্ডা কেবল পাঁচ হাত পাকা বাঁশ নয়, সেটা আমাদের মেরুদণ্ড, যেটা শিরকে উঁচু রাখবে। ঝাণ্ডার মাথার কাপড় হবে রেশমী, তবেই পৎপৎ করবে, কাঁপবে, সকলকে কাঁপাবে। বাস্তবিকই তাই, সমবেত উন্মাদনার জন্য সৌন্দর্য্য কি অবান্তর? কেবল নঁভেলিয়ানার জন্যই কি তার আবির্ভাব? সৌন্দর্য্যবোধ কি কখনও কাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সমগ্র মানবিক সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত হবে না? ব্যক্তিগত সম্বন্ধেই কি সেটা চিরকাল আবদ্ধ থাকবে? সমাজের আদান প্রদানে কি

সেটা নিষ্প্রয়োজন?' বিজন বল্লে, 'যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের সৌন্দর্য্যবিলাস বেশী দুর সম্ভব নয়।'

'মানি না। দু বেলা খেতে পায় না যারা দু মুঠো তাদের হাতের আল্‌পনা, কাঁথা দেখেছ? তা ছাড়া, যারা পতাকার কল্পনা করেছেন তাঁরা বুভুক্ষু নন্।'

'কিন্তু আপনাদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়, নয় ত এত খিদের উল্লেখ হচ্ছে কেন? রমাদি, রান্নাঘরটা দেখে নাও। আমাদেরও খাবার দিতে হবে। তাড়াতাড়ি নেই, আজ আবার বেশী কাজ, কখন ফিরব তার পাত্তা নেই। অপেক্ষা করতে হবে না, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না এখানে। আচ্ছা এখন আমরা আসি। তোমাদের জন্য বাড়ি দেখতে হবে। দুপুরে যা করে হোক বিশ্রাম নিও।' বিজন ও দুজন কমরেড চলে গেল।

'এরা কারা?

'ভগবান জানেন। তুমি বোসো, আমি দেখছি।'

রমা উঠানে এল। কোণে টিনের ঘরে একজন ছোকরা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছে। উচু উনুনে ডেক্‌চি বসান, পাশে এলিউমিনিয়মের থালায় ঠাসা আটা, তার ওপর অগুণ্‌তি মাছি। রমা ঘরে ঢুকতে ছোকরা উঠে সেলাম করল, খোঁড়া, মুখে বসন্তের দাগ। মাছি তাড়িয়ে আটা ঢেকে রমা ডেক্‌চির ঢাকনা খুল্লে। মাংস চড়েছে, জল কম, খানিকটা ঢালতেই ছোক্‌রা পেঁয়াজ ছেড়ে দিলে। 'কি করলি!' ছোকরা হেসে বল্লে, 'বাঙ্গালীবাবু কাঁচা পেয়াজ পছন্দ করেন না, আমি কি করব!' 'ঘি দিয়েছিস?' 'গোড়াতেই।' 'মাথা কিনেছ আমার! চাল আছে? যে বাবু এসেছেন, তিনি তোদের খোট্টাই রুটি খান না। চাল নেই ত' বাজার থেকে রুটী মাখন আনতে পারিস?' 'কেঁউ নেহি?' 'কেঁউ কেঁউ করিসনি, যা নিয়ে আয়।' 'আভি? 'আভি নয়ত কি কাল!' 'আভি যেতে পারব না, বহুৎ লোক আসবে, রোটি বানাতে হবে।' 'কজন আসবে? 'তার ঠিকানা নেই।' 'কখন খান বাবুরা?' 'তার কি টাইম

আছে। তবে ছুটোর আগে নয়।' 'আচ্ছা চল্ আমার সঙ্গে, লিখে দিচ্ছি কি আনতে হবে। তোর রাঁধতে হবে না। এখানে বড় গ্রোসারী আছে, যেখানে সাহেবেরা খাবার কেনে?' ছোকরা বুঝতে পারল না। 'সাহেবদের বেণের দোকান, যেখানে মাখন-টাখন মেলে?' 'এ-পাড়ায় নেই, একটু দূরে আছে।' 'কতক্ষণে আনতে পারবি?' 'যাব আর আসব। আর যদি না মেলে তবে কি আনব?' 'তবে তোদের ভাল দেশী খাবারের দোকান কত দূর?' 'বেশী দূর নয়। সব্‌সে আচ্ছা মিঠাইলালের দোকান। বাবুরা খুব ভালবাসে ওর খাবার! সে বার হরতালে মজুরদের একবেলা রোজ পনের দিন ধরে খাইয়েছিল, বড় ভাল আদমী, ওস্তাদের দোস্ত্।' 'আগে বড় বেনের দোকানে যা, না পারিস, ভাল দেশী খাবার আনবি। ডবল রুটি আর মাখন আনতে ভুলিস নি।' রমলা ঘরে এসে কাগজে ফর্দ্দ করে ছোকরার হাতে দশ টাকার নোট দিলে। 'শীগগির এলে বখশিস পাবি।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলেটি চলে গেল।

'আমার অন্যায় হয়েছে ষ্টেশন থেকে এ-বেলার ঝঞ্চাট শেষ না করে আসা! স্নানের বন্দোবস্ত নেই বোধ হয়? খোলা জায়গাতেই আমার চলবে। বাক্সেই সব আছে?' খগেন বাবু বাক্স খুলতে যাবার আগেই রমলা সুটকেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ বার করে দিলে। ছোট-খাট ব্যাপারেই পার্থক্য ধরা পড়ে। সাবিত্রী সুটকেশের সামনে থাবড়ী খেয়ে বসত, চাবি লাগাতে পারত না, লাগালে খোলা যেত না, স্বদেশী কলের বিপক্ষে মন্তব্য জানাত, মুখ বাঁকাত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়, একবার চাবির গায়ে নম্বর সেঁটে রেখেছিল। একবার নয়, বহুবার খগেন বাবু তাকে মানা করেছিলেন তাঁর সুটকেশে চাবি দিতে। সাবিত্রী শোনেনি কখনও। হাতে তোয়ালে নিয়ে খগেন বাবু নাইতে যাচ্ছেন রমলা বল্লে, 'সাবানটা ওখানে ফেলে এস না।'

রমলা ঘরে অপেক্ষা করছিল, ছোকরা এখনও ফিরল না। এখানে

হোটেলে থাকাও চলবে না। তার চেয়ে ছোট বাড়ী নেওয়া হোক, বিজন থাকবে, সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত খেয়ে দেয়ে যা-ইচ্ছা তাই করুক, কে মানা করছে ওকে। নোংরামি সহ্য করা ওর রক্তে নেই। এই জঘন্য জায়গায় থাকে কি করে! সঙ্গীরাও যেন কেমনধারা, একজনেরও সঙ্গে মেশা চলে না। ভদ্রতার একটা স্তর আছে যার নীচে নামতে কষ্ট হয়। গরীবদের অবস্থা বোঝা যায়, কিন্তু এরা যেন কী! খগেন বাবু স্নান সেরে খাটের ওপর বসে বই ওলটাচ্ছিলেন, রমলা তাঁকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল, খগেন বাবু দেখতে পেলেন না।

ছোকরা খাবারের চুবড়ী নিয়ে এসেছে। 'মেমসাব, বেনের দোকানে আপনার ফরমায়েসী খাবার পাওয়া যায় না, তাই: মিঠাইলালের হালুয়া আর কচুরী এনেছি।' রমলা কোনো কথা কইল না দেখে ছোকরা চুবড়ী নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। বিজনের সঙ্গে জনকয়েক লোক ঘরে হুড়মুড় করে এল। তারা নিজেরাই টেবিলগুলো ধরাধরি করে সাজিয়ে বসবার জন্য পাশে দুটো খাটিয়া টেনে নিলে। রমলা বাক্স থেকে একঠা টেবিলক্লথ বার করছে দেখে বিজন হাসল। টেবিলে এলুমিনিয়ম ও কাচের ফাটা প্লেট, তার ওপর দেশী খাবার, হালুয়া, ডবল রুটি, বিজনের সামনে শুখনো পাতা, যাতে খাবার এসেছিল। 'খগেন বাবু, এঁকে ত দেখলেন, কমরেড সফীক্, এদের নাম কি মনে থাকবে? আসফাক, নাথভী, মহীন্দর, সব কমরেড। আর ওঁর কথা ত' বলেইছি, ইনটেলেক্-চুয়াল, ইনি ভাবীজী'...

সফীক্ বিজনকে প্রশ্ন করল ষ্টেশনের হালচাল সম্বন্ধে। 'হরতাল সম্পূর্ণ। কিন্তু সেটা অন্য কারণে মনে হল। লক্ষ্ণৌএর জের বলতে পার। খগেন বাবু এখনই লক্ষ্ণৌ থেকে আসছেন, তাঁর কাছে লক্ষ্ণৌএর খবর পাবে।' খগেন বাবু বল্লেন, 'লক্ষ্ণৌএর হরতালও সম্পূর্ণ বটে, তবে মিটমাটের চেষ্টা হচ্চে, একটা মিটিংএ ছিলাম।' সফীক্ উদ্‌গ্রীব হয়ে সভার বিবরণ শুনতে চাইলে।

শোনবার পর, ইডিয়টিক বলে সামনেকার প্লেটটা সরিয়ে দিলে। বিজন বলল, 'আপোষে ঝগড়া করে লাভ কি, ওস্তাদ ?'

সফীক একটু উষ্মাভরে উত্তর দিলে—'টঙ্গাওয়ালার চার আনা আর এক্কাওয়ালার চার আনা একেবারে ঐশ্বরিক সুবিচার। এরকম প্রস্তাব যে কেউ সজ্ঞানে উপস্থিত করতে পারে আমি ভাবতেই পারি না।

খগেন বাবু—'আমারও একটু আশ্চর্য্য লেগেছিল। কিন্তু কানপুরে গড়াল কি করে ?'

স—'আপনা থেকে, কারুর চেষ্টা করতে হয় নি।'

খ—'কোনো বক্তৃতারও প্রয়োজন হয় নি ?'

স—'যৎসামান্য, কাঠ শুখনো হলে, আর হাওয়া অনুকূল থাকলে, বেশী দেরী হয় না। আপনারা কতদিন কানপুর থাকবেন ?'

খ—'ঠিক নেই। তবে আপাততঃ মাস কয়েক ত' বটেই। একটা হোটেল...'

রমলা দেবী—'বাড়ীই ভাল।'

স—'বিজন, তুমি আজই বিকেলে খোঁজ।'

বি—'সে হয় না, ওস্তাদ, কাল দেখা যাবে, আজ হাতে অনেক কাজ।'

স—'এঁদের কষ্ট হবে, বিশেষতঃ ভাবীজীর।'

বি—'তুমিই না হয় একবার ফোন কর না, তোমার এক কথায় হয়ে যাবে।'

স—'দেখি।'

খ—'অত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই, অবশ্য আপনাদের অসুবিধা হবে।'

বি—'আমাদের! হয়ত আমরা রাতে ফিরতেই পারব না। ওস্তাদ, আজকের রুটিন কি ?'

স—'আগে রিপোর্ট আসুক।'

মহবুব—'আজকের কাগজ দেখেছ ওস্তাদ ? এক দল বলছে লকআউট, অন্য দল বলছে ষ্ট্রাইক। আমার মনে হয় মজদুর সভার তরফ থেকে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করা ভাল।'

ব—'মজদুর সভা যা উচিত ভাববে তাই করবে।'

মহবুব—'তাই বলে চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু করা চাই। ওস্তাদ, আমি না হয় একবার উধামজীর কাছে যাই।'

স—'তিনি কি বলবেন জানা নেই ?'

বি—'তাঁর মতে এটা ষ্ট্রাইক নিশ্চয়, তবে লক-আউট হিসেবে প্রচার হলে সহানুভূতিটা সহজ হবে।'

স—'তবে !'

বি—'দোষটা কি তাতে !'

খ—'ব্যাপারটা কি প্রকৃতপক্ষে ?'

স—'প্রকৃতপক্ষে' দুইই। এমন কোনো লক-আউট হয় না যার উল্টো দিকে ষ্ট্রাইক নেই। সত্তা নিয়ে আলোচনা নিস্ফল, ব্যাপারটা এই, আমরা জানি, অর্থাৎ আমাদের সকলের মনে এই ধারণা দৃঢ় করাতে হবে যে আমরা স্বেচ্ছায় হরতাল করেছি।'

খ—'পার্থক্যটুকু সূক্ষ্ম।'

স—'সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত দরকারী। উধামজী চান সহানুভূতি, তার চেয়ে প্রয়োজন মজুরদের সচেতনতা। আকাশ পাতাল তফাৎ।'

খ—'মানি।'

বিজন উৎফুল্ল হয়ে রমলার মুখের দিকে চাইলে। রমলা বল্লে, 'উনি ভাবছেন অন্য কথা।'

স—কি ?

র—ভেতরকার শক্তি।

স—'তার অর্থ যদি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হয় তবে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

বি—'ওস্তাদ ভাবছে গণ-চেতনা।'

খ—'তারও সাধনা আছে।'

স—'সেটা নাভিপদ্মে দৃষ্টিনিক্ষেপ নয়।'

খ—'কি সেটা?

স—'কানপুরে থাকলেই দেখবেন।'

খ—'সুযোগ পাব?'

সফীক রমলার দিকে একবার চেয়ে বল্লে, সুযোগ! খুঁজে নিতে হবে। পারবেন কি?' রমলার মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখে বিজন বল্লে, 'সাধনা হল কাজ। চিন্তা কর্ম্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।'

খ—'এম্‌পিরিসিজম? তার মূল্য আমার কাছে বেশী নয়। তাতে নতুন কিছু গড়া যায় না, যা হয়েছে সেইটাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ করবার সুবিধা হয় মাত্র।'

স—'নাম সেঁটে দেবার দরকার আছে কি?'

খ—'আছে বৈ কি! স্পেয়ার পার্ট কেনবার সুবিধা হয়।'

স—'কাঁচা মালের লেন-দেনে হয় না।'

পর্দার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। মহীন্দ্‌বু গিয়ে একটা লেফাফা এনে সফীককে দিলে। পড়বার পর সফীক বাইরে গেল, পরে মহবুব, মহীনদর। বিজনও উঠছে দেখে রমলা বল্লে, এই রোদ্দুরে। আজকে তাহলে বাড়ী খোঁজা হবে না?'

'ওস্তাদ নিজে যখন ভার নিয়েছে তখন পাওয়া যাবেই। তুমি কিছু খেলে না দেখলাম। বিকেলে একটা হোটেলে যেও, খগেন বাবুকেও খাইও, এখানে বন্দোবস্ত নেই। অবশ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, তোমাদের

থাকের পক্ষে নয়। ওস্তাদকে কেমন লাগল? আশ্চর্য্য মানুষ! বুদ্ধিটা ঝকঝকে।'

র—'তোমার নতুন হিরোকে আমার ভাল লাগতেই হবে।'

বি—'খগেন বাবুর কেমন মনে হল! সুজনদার চেয়েও পড়েছে, অবশ্য দরকারী বই, মাথার মধ্যে খিচুড়ী পাকায় নি। কাজ করে কিনা, তাই।'

বিজন রমলার হাত থেকে সোলার টুপী না নিয়ে খদ্দরের টুপী পরেই চলে গেল। ছোকরা রেজগী ফেরৎ দেবার সময় একটা আধুলি বখশিস পেলে। এঁটো বাসন ছত্রাকার। ছোকরা পরিষ্কার করবার পর রমলা একটা আলু ও এক শ্লাইস রুটি কাটলে নিজের জন্য।

'নতুন জীবন কেমন লাগছে?'

'ভাল। তোমার?'

'এরই মধ্যে ভাল লাগছে! মেয়েদেরও হার মানালে, ক্ষমতা বটে।'

'যদি ছাড়তেই হয়, তবে নতুনকে প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করাই উচিত নয় কি!' মন্তব্য করেই খগেন বাবুর মনে সন্দেহ জাগে। হঠাৎ কেন মুখের আগল খুলে যায়. কণ্ঠস্বরে উগ্রতা আসে কে জানে! তর্কের খাতিরে? তাই যদি হয় তবে বুঝতে হবে—কি বুঝতে হবে? ভয় হয় মনেও আনতে, আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে কেন? পৃথক ঘরের ব্যবস্থার জন্য। রমলা যেন কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। যে স্বেচ্ছায় দূরে সরে যায় সে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকে! ডাকে না, কিছুতেই ডাকে না। একবার স্বামীর কাছে অত্যাচার আবার যাকে বরণ করলে তার কাছেও আশাভঙ্গ। ভেবেছিল মা হবে, সংসার পাতবে, প্রকৃতি দেবী কি এক কলকাটি টিপে দিলেন, সর্ব্বত্র হতাশ হল—তাই, অভিমানে সে সরে গেল। সফীক তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে,. সুযোগ পাওয়া শক্ত, রমলা আঘাত পেলে. আরো কত পাবে...খগেন বাবুর মন স্নেহে আর্দ্র হয়ে আসে।

রমলা নিশ্চয়ই বলতে পারত নতুনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুক তারা যাদের ভাঁড়ার খালি। অবশ্য রমলার ভাঁড়ার ঘরে রঙ্গীন সূতোর সিকে ঝোলে না, তাতে রঙবেরঙের আলপনা আঁকা হাঁড়ি থাকে না, যেমন ছিল মাসীমার, তবু রমলা নিঃস্ব নয়। সে এল চলে, সংস্কার ভেঙ্গে লোকে ভাবতে পারে, কিন্তু অন্য সংস্কারের ঠেস না থাকলে সে কি পারত! নিজের সুখের তাগিদে? নিশ্চয়ই নয়, তার প্রমাণ সে দু'হাত ভরে দিয়েছে। এই সংস্কারের প্রকৃতি এতই অ-পূর্ব্ব যে হিন্দু ভারতবাসীর পক্ষে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু রমলার আচরণে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা নেই। নিঃস্বরাই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে।

বিজনের কমরেডরা কি চায় জানতে ইচ্ছা হয়। এদের কাছে পুরাতন নেই, তার জের নেই, তাই প্রত্যেক আগন্তুক আসে বরের বেশে। কিন্তু গৌরীর আত্মদান ইতিহাসে অচল। আঁচড় না-কাটা কাঁচা রেকর্ড বর্ব্বররাও জড় করে না, সভ্য মানুষ ত' দূরের কথা। যার অতীত আছে সে ত্যাগ করুক দেখি কেমন পারে! সংস্কার-মুক্তি অন্য কাজ। রমলা সফীককে বল্লে যে সচেতনতা আত্মিক সাধনার ফল। হয়ত লয়ালটি, মাত্র প্রতিবাদও হতে পারে, যার ভাষা খগেন বাবুর সঙ্গে বসবাসের সুযোগে অর্জ্জিত। সফীক ধর্ম্মতত্ত্ব ভেবে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সাপের বিষ নেই নেই করলেই কি উড়ে যায়। গণ-চেতনা কি ব্যক্তিগত চেতনার অতিরিক্ত। যদি না হয়, তবে মানুষের মেরুদণ্ডরূপ সংস্কারকে বাদ দেওয়া যায় না। যদি হয়, তবুও অসম্ভব, বরঞ্চ বেশী, কারণ গণ-সংস্কার সৃষ্ট হতে, বৃদ্ধি পেতে বেশী দিন লেগেছে, তার ব্যাপ্তি আরো গভীর ও প্রশস্ত, তাই তাকে ছাড়াও কষ্ট।

রমলার চাই ভাল সাবান, দামী গন্ধ মাত্রা, নানা রকমের সাড়ি, লেসের সেমিজ, রেশমী সায়া, নরম বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড়। খদ্দর তাকে মানায় না কিন্তু তাতে আসে যায় না। যে সাধু সর্ব্বত্যাগী হয়েছে একবার, সে তখনই

রেশমী আলখাল্লা, রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ, দামী খাবারের ওপর অধিকার অর্জ্জন করেছে। রমলা চলে এসেছে—এইটাই তার ব্যবহারের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যতক্ষণ তার আচরণ এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকছে, ততক্ষণ ছোটখাট সংস্কারগুলো তাকে বাঁধতে পারছে না।

বিজন রমলাকে বেশ গ্রহণ করে নিল। কখনও বিজনের কাছে সামাজিক প্রথার অর্থ ছিল না। তাই তার পক্ষে সহজ হল। বিজন প্রত্যাশা করছে যে সেই পুরাতন রমলাকেই সে কবে পাবে, রমলাও ভাবছে যে বিজন যা ছিল তাই আছে। দুজনের পরিবর্ত্তন যদি একই দিকের হয় তবে পরস্পরের চেষ্টায় সম্বন্ধ সমৃদ্ধতর হবে, নচেৎ পুরাতন সম্বন্ধের জোরে বিজন রমলার কক্ষে গ্রহের মতন ঘুরবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাগপাশ থেকে উদ্ধার নেই। এইটেই সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্কার।

কিন্তু কম্‌রেড্‌রা নিশ্চয়ই অন্য কিছু সম্পর্কের সন্ধান পেয়েছে, নচেৎ, কেমন করে তারা আত্মীয়স্বজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কাটিয়ে ওঠে? নতুন সমাজ তৈরী হবার পর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ফুটে উঠবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে পরিহার করা চাই। এটা মহাপুরুষরা বুঝেছিলেন। সম্পর্কের এক নক্সা খুলে আরেক নক্সা বানাচ্ছে মেয়ে জাতটা। চরখা আর তাঁতের সামনে বসে কি তারা আগন্তুকের অপেক্ষা করে, না সেই প্রবাসী প্রিয়ের? নক্সার সামনে ও পিছনে যে আরেক বড় ছক রয়েছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা অচেতন, নিরাগ্রহ। যে সে বিষয়ে স্মরণ করাবে সে মেয়েজাতের চিরশত্রু হয়ে রইল। সফীকের সঙ্গে রমলার ভাব হতে পারে না।

খগেন বাবুর ঘুম আসছিল দেখে রমলা বল্লে, 'একটু বিশ্রাম করে নাও। বিছানা পেতে দেব? সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজী হোটেলেই চল।'

'সেটা ভাল দেখায় না। ওরা নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করবে।'

'আমি এখানে এত লোকের মাঝে থাকতে পারব না বলে দিলাম। তোমার

ভাল লাগে তুমি থেকো। তুমি বোঝ না কেন যে আমরা এখানে রবাহূত? ওদের কাজে আমরা বাধা দিচ্ছি।'

'তোমাকে ষ্টেশনে রেখে আসাই ভাল ছিল। তুমিই বা এলে কেন?'

'বিজন এমন নোঙরার মধ্যে থাকবে ভাবতেই পারিনি।' রমলা খাটিয়া থেকে নোঙরা বিছানা টেনে মাটিতে নামাচ্ছে দেখে খগেন বাবু বল্লেন যে তিনি ঘুমুবেন না, বই পড়বেন। রমলা ছুটো চেয়ার টেনে একটির ওপর পা রেখে অন্যটিতে বসল।

বিজন যখন খবর দিলে যে আপাততঃ একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। মাত্র ছুটি স্যুটকেস ও বিছানা নিয়ে বিজন রমলা ও খগেন বাবুকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিলে। রাত ৮টার সময় দু'জন 'বয়' টিফিনক্যারিয়ারে খাবার আনলে, ওস্তাদের আজ্ঞা-মত। 'বিজন, খেয়ে যাও।' 'না, খগেন বাবু; মাপ করবেন। আজ কাল আমরা খুব ব্যস্ত থাকব। রমাদি, হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না এ ক'দিন। ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিও। তারপর, একটা হেস্ত-নেস্ত হলে তোমার বাড়িতে আড্ডা জমাব আমরা।' খগেন বাবু উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আসবে। তোমার ওস্তাদকেও এনো অতি অবশ্য।' বিজন চলে গেল।

'একবার তুমি নিজেও বলতে পারতে!'

'কি?'

'জানি না।'

'মক্ষিরাণী হবার লোভ আমার নেই।'

(৩)

নতুন ফ্ল্যাট ঠিক বাসোপযোগী নয়, যতদিন না ভাল বাড়ি পাওয়া যায় ততদিন মাথা গোঁজবার মতন। কিন্তু সে কয়দিনের জন্যও যৎসামান্য পারিপাট্যের প্রয়োজন। পদে পদে তাতেও খগেনবাবু নিজেকে অনাবশ্যক

মনে করেন। ঘরে থাকলেই খুঁটিনাটি বিষয়ে মতান্তর হবার সম্ভাবনা থাকে। ঘরের কাজ মা-লক্ষ্মীদের আর বাইরের কাজ বাবুদের—এ ধরণের শ্রমবিভাগ বর্তমান যুগে অগ্রাহ্য। এক যদি এক পক্ষ রোজগার আর অন্য পক্ষ খরচই করে, তবে ব্যাপারটি সহজ হয়। কিন্তু রমলা নিজের তহবিল থেকেই টাকা তুলেছে, খগেনবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্থ সম্পর্কে স্ত্রীসুলভ আত্মপর ভেদাভেদজ্ঞান-হীনতার প্রমাণ একবারও দিলে না। খরচের দায়িত্ব যার, রুচির দায়িত্বে তার সন্দেহ প্রকাশ অভদ্রতা।

বিজন পরের দিন এসে খগেনবাবুকে খবর দিলে যে হরতাল জোরে চলছে, তবে খণ্ড খণ্ড ভাবে। ইতিমধ্যে, মালিকেরা প্রচার করছে যে মুনাফার হার তাদের এতই কমেছে যে দুদিন প'রে তারা আর কল চালাতেই পারবে না। যুক্তিটা নিরর্থক, কিন্তু সাধারণে ভাবতে পারে যে তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কমরেডরা সকলে এখন কাজে ব্যস্ত, অতএব খবরের কাগজে তর্ক বাধাতে তাদের সময় নেই। বিপদ এই যে কংগ্রেস দলের অনেকেই ঘাবড়ে গিয়াছেন। মজদুর-সভা অবশ্য মুখের মতন জবাব দিতে পারে, কিন্তু দিচ্ছে না। কারণ কি বোঝা যায় না। বিজনের বন্ধুরা অনেকেই সেখানকার সভ্য কিন্তু তাদের জোর কম। গুজোব এই যে কানপুরের কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আসছে কাল মিটিং হবে।

খগেনবাবু সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লেন। কাতারে কাতারে লোক চলেছে একই দিকে। তারই টানে একটা প্রকাণ্ড ময়দানে এলেন। বিস্তর লোক ইতিপূর্ব্বে জমায়েত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান চেনবার জো নেই। যারা ভিড়ের পরিধিতে ঘুরছে তাদের মুখের ক্লান্তির ছাপ ভিড়ের সমীকরণ ছাপিয়ে চোখে পড়ে। চলার ধরণ নিয়মবর্জ্জিত, দুর্ব্বল দাঁড়াবার ভঙ্গী, ঘাড় গোঁজা, চোখ নিষ্প্রভ। তলতলে গলা আমের মতন, থলথলে প্রৌঢ়া ক্ষেত্রী গৃহিণীর মতন, হলহলে পুঁইশাকের ডাঁটা চড়চড়ি আর বিউলির ডালের সঙ্গে কাদা-চিংড়ী,

স্যাদনেদে, ভসভসে...কোথাও হাড়ের কাঠিন্য চোখে পড়ে না। ফ্যারোর কবর গেঁথেছে, রোমান-সম্রাটের বজরা বেয়েছে, জার্ম্মান জমিদারের জলা-জমিতে লাঙল ঠেলেছে, ফরাসী রাজার জেলখানা ভরেছে, ল্যাঙ্কাশেয়রের কলে শীতের ভোরে ছুটেছে, এদেরই জ্ঞাতি ; চীনের দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে, ভারতের জমিদারী শোষণে ভুগছে, মরছে, এদেরই জাতভাই। এর চেয়ে আর কি প্রত্যাশা করা যায়। শতাব্দীর সর্ব্বগ্রাসী অত্যাচার কি কন্দর্পপ্রসূ হবে ! কেন খোলামাঠে আসে এরা হাওয়া আর সবুজ ঘাস কলুষিত করতে ! তার চেয়ে বাড়ি বসে, বস্তিতে পণ্ডিতজীর কথামৃত শুনুকগে, সেই সমীচীন, সুখ দুঃখ লক্ষ বৎসর আগেকার, সীতাহরণে রামচন্দ্রজী হাপুস নয়নে কাঁদছেন, লবকুশ মাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছে···রামলীলাই এদের পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়, মিটিং, সত্যাগ্রহ, ধর্ম্মঘট, হরতাল ! বর্ত্তমানের পরশ লেগেছে এদেশে, নতুন রোগ, মৃত্যুহার একটু বেশী হবেই ত !

ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু। বাঙলা দেশেও বিলেতী রোগ ধরেছিল, ফলে জনকয়েক ধর্ম্মত্যাগ করলে, জন কয়েক ইংরেজী শিখে আর চাকরি নিয়ে ভদ্রলোক হল ব্যস্, এই পর্য্যন্ত ! থুড়ি ! সাহিত্য আর ওজস্বিনী বক্তৃতা বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, তিনি সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথে, এমন কোন লেখকের নাম করা যায় যিনি নিজের শিকড় খুঁজতে অর্দ্ধেক শক্তি অপব্যয় করেন নি ? আধুনিক সাহিত্য ত' সামুদ্রিক শ্যাওলা ! অনুকরণে আপত্তি নেই, কোনো সৃষ্টি আত্মজ নয়, কিন্তু এ হেন মস্তিষ্কের একটা ছোট অংশের তাগিদ ! একটা মূলগত খণ্ডতা ও অ-বাস্তবতার হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ পাচ্ছে না। ছটফট করছে, এইটুকুই আধুনিক মনের সততা, জীবনের চিহ্ন। কিন্তু বিদেশী প্রভাব এ অঞ্চলের আঁতে টান মেরেছে। তাই বাঙালীবাবু রায় বাহাদুর, ডিপুটি, লেখক হয়েছিল, আর কানপুরের শ্রমিক বিলেতী বুলি কপচালে, বিলেতী পদ্ধতি খাটালে, চাকরী খোয়ালে, জেলে

গেল। জনতার নিস্প্রভ চোখ থেকে বিদেশী সম্পর্কের স্বরূপ ঠিকরে আসে। অন্নের বিরোধ। অন্ধকারের গর্ভে আলোর জন্ম। বর্ষারাতে পদ্মার জাহাজ বাঁকের মুখে সার্চলাইট ফেলে; ঘাটের গুদোম ঘর, পানের দোকান, হোটেল, জমিদার বাড়ির টিনের আটচালা, ঘাটের ডিঙ্গি এক ঝলকে চমকে ওঠে। রমলার প্রভাবের অন্তরে বিরোধের বীজ। ভাগ্যিস, মা হয় নি সে! রক্তবীজের লোপ নেই।

ময়দানের এক কোণে সফীক একা দাঁড়িয়ে। 'আপনি এখানে!'

'এসে পড়লাম।'

বিজন আসতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের লোক কোথায়?'

'প্যাণ্ডেলের চারধারে।'

'ও-পাড়ার কর্তৃপক্ষ বিনা পয়সায় সিনেমা দেখাচ্ছেন। পৌরাণিক গল্প যাতে এখানে না আসে।'

'যাদের আসা উচিত ছিল তারা এল না, আর এল তামাসা দেখতে আসে যারা বরাবর। ওদের সিনেমার অপারেটারকে বলেছিলে?'

'নতুন লোক। পুরাতন লোককে সন্দেহ করে তাড়িয়েছে।'

'সিনেমা-মেশিন বন্ধ করা সোজা। যা করে হোক নিয়ে এস।'

'ওস্তাদ, জানই ত ও-পাড়ার ব্যাপার। নিজে চল, নয়ত আসবে না।'

"পারবে না তুমি? বেশ মহবুবকে পাঠিয়ে দাও।'

বিজন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

প্রকাণ্ড মোটর পার্কের ফটকে থামল। লক্ষ্ণৌ থেকে মন্ত্রীপক্ষ লোক পাঠিয়েছেন দু'দলের সমঝোতা করাতে। জয়রব উঠল, অজগরের মতন দীর্ঘ জনতা ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করল, মধ্যে দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, চারধারে কংগ্রেস সমিতির সভ্য, পিছনে স্বেচ্ছাসেবকের দল। নেতা মঞ্চে উঠলেন, ঝাণ্ডায় হাত রেখে মাইক্রোফোনের সামনে এলেন; যন্ত্র ক্যাঁক করে উঠল।

পাঁচ মিনিট সময় গেল যন্ত্র ঠিক করতে। বক্তৃতা সুরু হল। এক একটা হিন্দী কথার ওরফে ফার্সী শব্দ, হিন্দুস্থানী ভাষার জন্ম হচ্ছে খোলা আঁতুড় ঘরে। পয়দা ত' হল, কিন্তু বাঁচবে কতদিন? যদি সকলে গ্রহণ করে তবেই আশা, নচেৎ সাহিত্যিকের আর কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের পণ্ডশ্রম। গড়পড়তা অর্থ অস্পষ্ট নয়। স্পষ্টতর হতে পারে যদি অশিক্ষিতের ভাষা অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের দিবারাত্রি শোনাতে পারে। তার সুবিধা হবে তখনই যখন শিক্ষিতদের চতুর্দ্দিকে সচেতন অশিক্ষিত ঘিরে থাকবে। একধারে সচেতনতা, অন্যধারে শিক্ষিতের জ্ঞান যে তাদের দিন ফুরিয়েছে। তবু বিপদ থাকে—হতাশায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ফ্যাশিষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে-সম্ভাবনা ঐতিহাসিক। তার উচ্ছেদ-সাধনে গোড়া থেকেই তৎপর হওয়া চাই। খগেন-বাবু নিজে কোন দলে পড়বেন নিজে প্রশ্ন করেন। যতদিন রমলা রইল ততদিনই এই ক্রান্তির পূরণ নেই। একঅদৃশ্য জালে রমলা আর পৃথিবীর প্রাথমিক সমস্যা জড়িয়ে গেল।

বক্তৃতার প্রথম অংশটা খগেনবাবু শোনেননি। বক্তা বলছেন; 'ভারতবর্ষ গরীব দেশ। আগে ছিল না ও এখন কেন হয়েছে তার কারণ আলোচনায় লাভ নেই। এখনকার ভারতবর্ষের গ্রামে অন্ন নেই, কুটীরে শিল্প নেই, সহরে চাকরী নেই; অথচ চাল-ডাল রপ্তানী হচ্ছে বিদেশে, আর বিদেশ থেকে দৈনিক ব্যবহারের সামান্য জিনিষগুলিও আমদানী হচ্ছে। মহাত্মাজী বলছেন, এ অবস্থায় নিজের শক্তিই একমাত্র সম্বল। তাঁরই বাণী আমি প্রচার করছি। নিজের হাতে সুতো কেটে সেই কাপড় পর, সুতো বেচে উপরি রোজগার কর। স্বরাজ মানে নিজের পায়ে দাঁড়ান। তোমাদের শক্তি তোমাদেরই অন্তরে। তোমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হও তবে তোমাদের শক্তি লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাবে। হাঁ, আরেকটি কথা। কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হলেই চলবে না। হৃদয় পবিত্র না হলে শক্তির অপচয় ঘটে। মনে হিংসা দ্বেষ পোষণ করলে নিজেরও উপকার

হয় না। মহাত্মাজীর আবিষ্কৃত সত্যাগ্রহের এই মর্ম্ম। তোমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখ তোমাদের চিত্তে কোনো কলুষ আছে কি না। এটা ভুলো না যে অন্তরের গলদ, আভ্যন্তরীণ হিংসা, জাতীয় সাধনার অন্তরায়। আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমরা অগ্রসর হও, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, পবিত্র মনে, অহিংস উপায়ে, জাতীয় অনুষ্ঠানের আনুকূল্যে, মহাত্মাজীর মতন মহামানবের আশীর্ব্বাদ মাথায় বহন করে।'

বক্তৃতার শেষ নেই। আরেকজন সুরু করলেন। কণ্ঠস্বর উদাত্ত, সুর কবিতাপাঠের, বক্তব্য শ্রমিকের জন্মগত অধিকার। আরেকজন, নাকী আওয়াজ, মহিলা-কর্ম্মী। তারপর ধন্যবাদের পালা, সেই অজুহাতে পরস্পরের গুণগান। মহাত্মাজীর জয়, জওহরলালের জয়, পন্থজীর জয়।

ময়দানের কোণে সফীক দাঁড়িয়ে। জলধারা একটা ছোট নলের মুখ দিয়ে যখন বেরোয় তখন তার কাঠিন্য তীক্ষ্ণ তরবারিকেও ব্যাহত করে। একটা শৈল-বাহু সমতটে নিঃশেষিত হল, পরে বন, ঝোপ, খানা, ক্ষেত খামার, খোঁটার ওপর দরমার ঘর, হঠাৎ একটা একশ টনের কালো পাথর, ভূমির নীচে কোথায় নিশ্চয় একটা সাতত্য ছিল। সফীক একটু হেসে খগেনবাবুকে প্রশ্ন করলে, 'বক্তৃতা শুনলেন, কেমন লাগল?'

'যতটুকু বুঝলাম তা হতে মনে হল যে কর্তৃপক্ষ আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'অনেকটা ঠিক।' কিন্তু সফীকের স্বরে নিজের মন্তব্যের সমর্থন নেই।

'অনেকটা মানে?'

'যতদূর অ-হিংস পথে থাকা যায় ততদূর, তার বেশী নয়।'

'তার বেশী যাওয়ায় বিপদ আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে! বোম্বাইএর মজুররা ভাল করেই জানে। নিশ্চয়ই আছে, গুলির সম্মুখে পড়ার বিপদ নেই!' চাপা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ষ্টিমের মতন

কথাগুলো বেরুল। বিদ্রূপের অন্তরে বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ খগেনবাবুর শুভ-জ্ঞানকে ঝলসে দিলে। ধ্যানীর শান্তিবচন আর নির্য্যাতিতের পুঞ্জীভূত অসূয়া একই বৃত্তাভাসের বিন্দুপথ।

'ওঁরা আপনাদের প্রকৃত বন্ধু।'

'পাতানো বন্ধু, ধর্ম্মভাই বলতে পারেন।'

'অন্য হিসেবে ?'

'উপদেষ্টা।'

'তা বটে, ধর্ম্মের গন্ধ একটু উগ্র বটে। কিন্তু সেটা বোধ হয় প্রয়োজনীয়।'

'কেন ?'

'তিন কারণে ; মহাত্মাজী ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া উপায় নেই, আর ভারতবাসী ধর্ম্মের ভাষায় সাড়া দেয় সহজে।'

'অর্থাৎ অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায় এবং অভ্যাসের বদভ্যাস। তবু ভাল, আপনি বলেন নি যে ভারতবাসী স্বভাবতই ধার্ম্মিক।'

'আপত্তিটা কি ?'

'চরম নিদানে বিশ্বাসী নই ; এবং এক হাত জমির জন্য কিষাণরা নিষ্ঠুর হত্যা করতে পিছপাও হয় না, দেখছি। তা ছাড়া, প্রয়োজন কথাটার অর্থ আপনার কাছে এক, আমাদের কাছে অন্য। গুঁতোর চোটে বাবা বলা, আর আদরভরে বাবা ডাকার মধ্যে প্রভেদ আছে। একটা অনিচ্ছাকৃত, অন্যটা স্বেচ্ছাপ্রসূত। স্বেচ্ছা অর্থাৎ নির্ব্বাচন।'

'কার হাতে নির্ব্বাচন ?'

'কোনো একটি মানুষের হাতে নয়। সমাজের বিকাশধারাই বেছে নেয়। যারা সেই নীতি বুঝেছে তারাই একমাত্র সাহায্য করতে পারে।'

'আপনাদের পাতানো বন্ধুরা ধরতে পারেন নি ?'

'না।' সফীকের ঠোঁট জাঁতির মতন বন্ধ হল। দুজন মজুর যেন সফীকের সঙ্গে কথা কইতে চায়, খগেনবাবু তাই দূরে সরে গেলেন।

'এই যে করিম! কি খবর?'

'আমাদের পাড়া তৈরী। একজন লোকও ঢুকতে পারবে না। বড় ফাটকের সামনে একশ মরদ ও পঞ্চাশ আওরাৎ পাহারা দেবে।'

'পিছনে?'

'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'কখন থেকে?'

'কাল ভোর বেলা থেকে।'

'আজই রাত ন'টা থেকে তারা মোতায়েন হোক।'

'আজ ন'টা! কেন?'

'হাঁ। যা বলছি শোন। রফা হল না, শেষে যখন খবর পাবে তখন দেখবে চোঁয়ায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'আওরাৎ আজ রাত্রে কোথায় পাব?'

'যা বল্লাম তারা বুঝবে এবং বুঝে আসবে। দেখ, যেন বাচ্ছা নিয়েই যায়। লক্ষ্ণৌ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা যেন দেখেন. এবং দেখে সরকারকে খবর দেন যে মেয়েমানুষরা কচি ছেলে নিয়ে ধন্না দিচ্ছে মিলের সামনে। বুঝেছ? কি বুঝেছ বল।'

'না হলে সমঝোতা যাবে।' সফীক হেসে বল্লে. 'আপাততঃ, কথাবার্ত্তার সুযোগে লোক ঢোকান বন্ধ করাটাই উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের আমাদের স্বপক্ষে ওকালতীর সমর্থনটাও এসে যাবে।' করিমের সঙ্গীকে সফীক জিজ্ঞাসা. করলে, 'ষ্টেশনের এন্তাজাম হল?'

'একশ' জন সেখানে থাকবে।

'আজই, যেমন সর্ব্বত্র।'

'গঙ্গার পুলে ?'

'সেখানে পঞ্চাশ, ঘাটে ঘাটে দশ।'

'ওস্তাদ, যদি লরি ভর্ত্তি লোক আসে ?'

'তবে...তোমরা কি ভাবছ ?'

করিম তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'যদি লরি নিয়ে আসে তবে সামনে শুয়ে পড়বার লোকেরও অভাব হবে না।'

'আওরাৎ সামনে শোবে, বাচ্ছা নিয়ে। আগে তারা আটকাবে, পরে তোমরা।'

'আগে আওরাৎ ? মরদকে অপমান করুছ ওস্তাদ ? তা হয় না।'

'তাই হবে, কারণ তোমাদের হাত পা ভাঙ্গলে রোজগারী করবে কে! ওরা মরলে আবার সাদি করে নিও। এই ঠিক, যাও।' হাসির সময় সফীকের চোখের কোণের চামড়া কুচকে যায়, ঠোঁটের বাঁ দিকটা একটু ঝুলে পড়ে, ডান দিকটা উঁচু হয়।

সফীক খগেন বাবুর পাশে এসে একটা বর্ম্মা চুরুট ধরালে। একজন লোক কাছে এল, পরিচ্ছন্ন খদ্দরের কুর্ত্তা ও পায়জামা, কেয়ারী করা চুল একটু বেশী তৈলাক্ত, বাঁকা ভাবে খদ্দরের টুপী পরা, পায়ে ভারি বুট।

'কেঁও জমাদার সাহাব, নেহি মিলা শিকার ?'

লোকটা থতমত খেয়ে বলে, 'কিসকো পুছতেঁহে ?'

'জনাবে আলিসে।'

'জমাদার কোন ?'

'দেমাক রাখনা চাহিয়ে, সাহাব !'

লোকটা ইতস্ততঃ করে খগেন বাবুর কাছে দেশলাই চাইলে। সফীক দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে লোকটা চলে গেল ;

'কে ?'

'নজর রাখছে আপনার ও আমার ওপর।'

'যখন সরকার আপনাদের নিজেদের, তখনও!'

'তবে আর মজা কি! ওরা সরকারের ওপর। তা ছাড়া, শ্রমিকদলের যারা পক্ষ নেবে তারাই কম্যুনিষ্ট, অতএব তারা সকলের শত্রু। আপনিও নতুন লোক, ঘাবড়াবেন না, বাঙালী হিন্দু মাত্রেই অ-বাঙালীর কাছে টেররিষ্ট।' একজন স্বেচ্ছাসেবক সফীকের কাছে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, আপনি কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না?'

'ডাকলে নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনার বক্তৃতা শুনতে সকলে উদ্‌গ্রীব ছিলাম।'

'এ-সভা অন্য কারণে, অন্যের জন্য ডাকা।'

'তবু ওস্তাদ, এত লোক জমেছে, এমন সুবিধে ছিল আমাদের বক্তব্য প্রচারের।'

'কাদের বক্তব্য? তোমাদের! তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'টেন্‌থ্‌ ক্লাসে।'

'মন দিয়ে পড়াশুনো করগে, পরীক্ষার ফল ভাল হবে, বক্তৃতা শোনবার স্পৃহাও কমবে।' ছেলেটি চলে গেল।

'খগেন বাবু, আপনার ফ্ল্যাট সাজান হল?'

'এক রকম হয়েছে। এখনও পুরোপুরি হয় নি। উনি আবার মনোমত না হলে কাউকে চায়ে ডাকতে পারছেন না। চলুন আপনাদের ওখানেই যাই। যদি অবশ্য, তবে...'

'একটা প্রশ্ন করছি, মাপ করবেন, আপনি স্পাই?'

'দেখে মনে হয়?'

'না।'

'অবশ্য, আদিম অভিশাপটার কথা তুলবেন না।'

'সেটা কাটান যায়, বহু চেষ্টায়।'

'কোনটা উল্লেখ করছেন?'

'শ্রেণীর।'

'আমি বলছিলাম, এ-দেশে ইংরাজী শিক্ষার আদিম অকৃত্রিম উদ্দেশ্যটির কথা, যার প্রেরণায় সকল শিক্ষিতরাই গুপ্তচর। তবে এইটুক রক্ষে যে চাকরী আমি করি না। এ অভিশাপ মোচন হয়?'

'নিশ্চয়ই হয়, অভিশাপের মধ্যেই কাটান-মন্ত্র আছে। আচ্ছা, চলুন, আমাদের ওখানে এমন কিছু গোপন কাজ হয় না। লুকিয়ে ষড়যন্ত্রের কাল নেই, যদিও বাঙালীদের কাছে তার মোহ এখনও আছে, বোধ হয়।'

সফীক খগেন বাবুকে চা খাওয়ালে। ঘরে কেউ নেই দেখে খগেন বাবু বল্লেন, 'আমি চিরকাল বই ঘেঁটেছি, কখনও কাজে নামিনি, তাতে বিশ্বাসীও নই, তাই আমার ভাষা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে জাগে। সত্যই কি আপনি ভাবেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতার কোনো বিশেষত্ব নেই, যদি থাকে তবে তার প্রকৃতি কি ধর্ম্মমূলক নয়, এবং যদি তাই হয়, তবে তাকে অবহেলা ক'রে কোনো স্থায়ী নতুন সভ্যতা গড়া যাবে?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে, কিন্তু অন্য কোনো দিন আলোচনা করা যাবে। এখন মুলতুবী থাক।'

রাত প্রায় ন'টার সময় মহবুব এসে খবর দিলে, 'কথাবার্ত্তা সুরু হয়েছে। উধামজী আছেন সেখানে। ওঁরা বলছেন বরখাস্তের কারণ এ নয় যে করিম কি অন্যান্য লোক মজদুর-সভার কর্ম্মী, কারণ এই যে তারা হয় অপদার্থ, না হয় গুণ্ডা।'

'তারা গুণ্ডা! আর ফি দশজনের পাশে যাহারা পাহারা দিচ্ছে তারা সব লক্ষ্মী ছেলে, অহিংসার খুদে অবতার! তাদের কাশী আর মির্জ্জাপুর থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে তত্ত্বাবধানের জন্য। করিমের রেকর্ড দেওয়া হয়েছে?'

'উধামজীকে নিজে দিয়েছি।'

'কি বল্লেন ?'

'তিনি বলছিলেন যে ওরা উত্তর দেবে করিম আগে ভাল মিস্ত্রী ছিল, এখন সে কেবল জটলা আর ষড়যন্ত্র করে, তাড়ি খেয়ে মারপিট বাধায়। তার বৌ যে মোকদ্দমা চালিয়েছিল তার রায়ের কাপিটা ওদের হাতে।'

'উধামজী কি জানেন না যে কিসের জোরে, কার পয়সায় করিমের স্ত্রী বড় উকীল দিয়ে মোকদ্দমা চালায় ?'

'উধামজী জানেন বোধ হয়, শুনিয়েও দেবেন।'

'স্মরণ করাতে বলগে যাও। টাকা এসেছিল কর্ত্তাদের কাছ থেকে।'

'প্রমাণ চাইবেন হয়ত।'

'প্রমাণ ? প্রমাণ মানে অনবরত কানে ঢোকান। একটা কথা একশবারে প্রমাণ, হাজারে বাণী। উধামজীর পাশে পাশে থেকো। এখানে প্রয়োজন নেই তোমার।' মহবুব চলে গেল।

বিজন এসে খবর দিলে যে জুহীর সিনেমা-শো ভেঙ্গে গিয়েছে, তাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, মেশিন নিয়ে অপারেটার ভেতরে পালাল।

'ওটা আস্ত আছে ? কাল যেন থাকে না।'

'খগেনবাবু, রমাদি অপেক্ষা করছেন। আমাকে খেতে বল্লেন, কিন্তু নাচার। ওস্তাদ, রাত্রে আমার কোনো কাজ আছে ?'

'তুমি এখানেই থাকবে, না ফ্ল্যাটে যাবে ?'

'যা বল।'

'যা ইচ্ছে তোমার। আপনি, খগেন বাবু ?'

'আমি না হয় যাই।'

'বেশ।'

'কাল দেখা হবে ?'

'এখন বলা যায় না।'

'বিজনের এখানে রাত্রে অসুবিধে হবে না?'

বিজন প্রতিবাদ জানালে। সফীক বল্লে, আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হতে যদি দেরী লাগে তবে অবশ্য যাবে না আপনাদের ওখানে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ত পাঠিয়ে দেব।' খগেন বাবু উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় খগেন বাবুর বেয়ারা এসে তাঁকে একটা চিঠি দিলে। রমলা দু'লাইনে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে অনুরোধ জানিয়েছে। সফীক হাসি সম্বরণ করলে। খখেন বাবু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে বল্লেন, 'আমি এখানে খানিকক্ষণ বসতে পারি?' বিজন খগেন বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল! সফীক বল্লে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে খগেন বাবুর খাবার দেরী হবে। খগেন বাবু খাটিয়ার ওপর বসলেন। সফীক লিখতে বসল।

রাত দশটার পর জন পাঁচেক লোক ঘরে এল। সফীক তিনটে ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে সকলকে কাছে আসতে অনুরোধ করলে। প্রথমটিতে চাঁদার জন্য আবেদন। ধর্ম্মঘট চালাবার জন্য টাকা চাই, মজদুর-সভার এমন অর্থবল নেই যে অতলোকের খরচ চলে একদিনের বেশী। অথচ পনের দিনের খোরাকের হিসাব ধরতে হবে। মজুরদের নিজেদের হাতে যা আছে তাইতে গড়পড়তা তিন দিন চলবে। বাকী ক'দিনের মধ্যে এক হপ্তা ধারে। শেষের পাঁচদিনের উপযুক্ত নগদ টাকা তোলা চাই। প্রথমে কানপুর, পরে একত্রে লক্ষ্ণৌ. এলাহাবাদ, প্রভৃতি সহর থেকে টাকা উঠবে। চাঁদার সমিতিতে কংগ্রেসসভ্যের সংখ্যা বেশী থাকাই উচিত।

প্রত্যেককে সফীক আবেদন পত্রের সমালোচনা করতে অনুরোধ জানালে। আপত্তি উঠল চার দফায়। ভাষা একটু জোরাল হলে ভাল হয়। পনের দিন হরতাল চলবে কোন হিসেবে; চাঁদার হার কত লেখা নেই; সমিতিতে মজুরদের ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নেই।

ভাষা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে সে সাহিত্যিক নয়; ওজস্বিনী-ভাষার চেয়ে কাটা ছাঁটা আবেদন পত্রেই কাজ হয় এই তার অভিজ্ঞতা, তবে বিজন যদি চায় তবে সে ভাষা সংশোধন করতে পারে, খগেন বাবুর সাহায্যে। বিজন কাগজটি নিয়ে খগেন বাবুর কাছে গেল। খগেন বাবু মন দিয়ে পড়বার পর বল্লেন, 'হরতালের অব্যবহিত কারণগুলি স্বল্প কথায় লেখা উচিত, অনেকে হয়ত জানেন না।' সফীক রাজি হল, 'বিজন, তুমি ওঁকে জানিয়ে দাও। দু'তিন লাইনের বেশী যেন না হয়।' লেখাটা চার লাইনে দাঁড়াল। সফীক দু'একটা বিশেষণ কেটে দিলে। সকলকে পড়ে শোনাবার পর খসড়া গৃহীত হল।

পনের দিনের সীমা সম্বন্ধে সফীক উত্তর দিলে যে দু'সপ্তাহে ফল যদি না ফলে তবে বুঝতে হবে যে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি আছে। গত হরতালের অভিজ্ঞতা এই যে দশ দিনের পর এখানকার মজুরদের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। অর্থাৎ, তখন তারা বোঝাপড়ার জন্য উন্মুখ না হলেও প্রস্তুত হতে থাকে। এবার দেখতে হবে যেন জোয়ার আসে, অতএব ভাঁটা আসবার পূর্ব্বেই সাবধানের প্রয়োজন। আট কিংবা ন'দিনের দিন মজুরদের জানান চাই যে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকা মজুত রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা জানবে যে চেষ্টা চলছে, ব্যস্, এইটুকু। সফীরের উত্তরে সকলে নীরব রইল।

চাঁদার হত্তুর লেখা নেই, কারণ যে যা পারে তাই মাথায় তুলে নিতে হবে। চার আনা লিখলে তার বেশী আসে না। ছাত্রেরা চার আনা, উকীল দোকান-দার আট আনা এক টাকা, আর মালিকরা, হাঁ মালিকরা লুকিয়ে যা পারে তাই দেবে, উধামজীর মারফৎ। এই টাকাটা প্রথমে তোলা চাই, তাই তাঁর প্রোয়াজন খুব বেশী। মালিকরা তাঁকে মান্য করে। তিনি চাঁদার সমিতিতে একলা থাকবেন না, কংগ্রেসের লোক চাইবেন, প্রথমে আপত্তি দেখিয়ে শেষে রাজি হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাই অন্য পক্ষের নাম রাখা হয়েছে এখন। মজদুর

সভার প্রতিনিধি হিসেবে ঐ কারণে এখন কেউ থাকছে না, পরে যখন উধামজী নিজেই দলের একাধিক লোক আনতে চাইবেন তখন আমাদের জনকয়েককে এ অজুহাতে বসিয়ে দিলেই চলবে। মুসলীম লীগের তরফে কে আসবে মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি নিজে রাজি হলেই সব দিক থেকে ভাল হয়। তাঁর স্থান খালি রাখা হয়েছে। সমিতি প্রয়োজন মত নতুন সভ্য বেছে নেবে।

মহবুব জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ তুমি নিজে থাকছ না?'

স—'না।'

ম—'উধামজীর হাতে অতটা ভার দেওয়া কি উচিত?'

স—'সব ভার তাঁকে বইতে হচ্ছে না। তাঁকে দেনেওয়ালারা শ্রদ্ধা করে তোমরা জান সকলে। অতএব টাকা তোলবার জন্য তাঁর মতন লোক মিলবে না।'

বি—'শেষে যিনি টাকা তুলেছেন তিনিই খরচ করবেন। এই ভাবে কানপুরের সব ব্যাপারই তাঁর হাতে এসে পড়ছে।'

স—'হাতে পড়ুক, মুঠোর জোর নেই। হরতালটা যদি খাঁটি হয় তবে তাঁর সাধ্য কি যে তার কাঠামো ছাড়িয়ে যান!'

বি—'ওস্তাদ, কিছু মনে কোরো না, অতটা নির্ভব আমার ধাতে নেই। এই ক'রেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করছি, আর 'রাইটিষ্ট'দের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে! উধামজীর চারপাশে আমাদের থাকতেই হবে।'

স—'তাই হবে, তবে এখন নয়। হরতাল তুমি ভাবছ কেবল মজুরদের মজুরী ও নোকরী নিয়ে, তা নয়। হরতালের দুটো দিক আছে, পলিটিক্যাল ও ইকনমিক। প্রথম দিকে উধামজী আসতে বাধ্য; কিন্তু পরে সরে যেতেও বাধ্য, কারণ যে পরিবর্ত্তন তাঁর মনোমত সেটা মজুরদের সার্থের বিরুদ্ধে। অতএব আমরা যদি সজাগ থাকি তবে তিনি আপনা থেকেই খসে পড়বেন! ব্যাপারটা সজাগ

রাখা। আর কিছুতে ভয় পেও না। যে আগে থাকে সেই কি নেতা? এখনও নেতৃত্বের প্রতি মোহ আছে অনেকের। ওসব কথা যাক—খানিকটা টাকা তোলবার পর মজদুর-সভার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি যাকে চাইবে তাকেই আমরা পাঠাব, বিজন।' সামান্য ঠাট্টা ছিল সফীকের উচ্চারণে বিজন আর কোনো উত্তর দিল না।

দ্বিতীয় কাগজে যাতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না বাধে তার প্ল্যান। তার প্রথম দফা, যেন কালই প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন কর্ত্তা ঠিক করা হয় যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হবে আপন আপন মহল্লার শান্তিরক্ষা। বাছা বাছা লোক নিয়ে সে একটি সমিতি বানাবে, প্রত্যেক সমিতি সব গোড়াতে এই প্রস্তাব মনোনীত করবে যে (হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শ্রমিক-শ্রেণীকে দুখণ্ডে বিভক্ত করার ফন্দী মাত্র। তা ছাড়া সমিতি নজর রাখবে যে বাইরের কোনো লোক পাড়ায় না ঢোকে। সমিতি পাহারা দেবে, হিন্দু মজুর মুসলমান পল্লী আর মুসলমান মজুর হিন্দু পল্লীতে। সহরে শান্তির ভার কর্তৃপক্ষের, মজুরদের ভার মজুর পাড়ায় দাঙ্গা হতে না দেওয়া, তার বেশী নয়।) সফীক সকলের মত চাইলে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের পাড়ায় মারপিট বাধবে না; তবে সহরে যদি সুরু হয়, আর, বেশী দিন চলে ও সেই সঙ্গে হরতালের উৎসাহ কমে যায়, অর্থাৎ পনের দিন কুঁড়েমির পর কি হয় বলা যায় না। সফীক 'কুঁড়েমি' কথাটি শুনে ভুরু তুললে। সেটা লক্ষ্য করে মহবুবের চোয়াল শক্ত হল। বিজনের মতে বাইরের গুণ্ডা না আসতে পেলে আর সহরের গুণ্ডাদের আগে থেকে কয়েদ করলে কোনো চিন্তাই নেই। প্রশ্ন উঠল দুটোর একটাও সম্ভব কিনা।

বিজন—'প্রথমটা শক্ত, দ্বিতীয়টি সোজা, যদি লক্ষ্ণৌ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর হুকুম আসে ১৪৪ ধারা সহরে জারির জন্য।'

করিম এতক্ষণ নীরব ছিল, কোণে যেন আত্মগোপনে ব্যস্ত, তাকে নিয়ে

হাঙ্গামা বেধেছে এই যথেষ্ট, তার বেশী মনোযোগ যেন তার ওপর না পড়ে। মুখ বসন্তের দাগে ভরা, নাকের একটা দিক মা শীতলা কেটে নিয়েছেন, তাই ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোয় প্রতি নিশ্বাসে, বাঁ রগের শিরা জট পাকিয়ে ফুলে উঠেছে, মধ্যে মধ্যে দাড়িটা নাচে, অজানিতে ডান হাত চাকার মতন ঘোরে আর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো হাওয়ায় ছক কাটে, চোখে বিজলী হানে কিন্তু মুখে থাকে হাসি, সরল, শিশুসুলভ, সফীকের মতন। করিম গলা খাঁকারি দিতে কথোপকথন যেন থিতোল।

স—'করিম, তুমি কি বল ?'

ক—'১৪৪ ধারায় আমরাই প্রথমে ধরা পড়ব।'

স—'নিশ্চয়ই। সহরে দাঙ্গা হতে না দেওয়া আমাদের কাজ নয়, সরকারের। তা ছাড়া, সহরে মারপিট চলছে আর মজুর পল্লী ঠাণ্ডা এর একটা দাম আছে।'

খগেন বাবু অস্বস্তিভরে চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসলেন। সফীক বাঁকা চোখে সেটা লক্ষ্য করে তৃতীয় কাগজে মন দিলে। এতে পূর্ব্বোক্ত দুটি প্ল্যানের কার্য্যবাহক বিবরণ। চাঁদার আবেদন পত্র ছাপান, বিলোন, খবরের কাগজে পাঠান থেকে ছাত্র সমাজের, উকীলদের, দোকানীদের, ষ্টেশনের ঘাটের কর্ম্মী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সব খুঁটি নাটি লেখা। দ্বিতীয় অংশে মজুর পল্লীর সর্দ্দার ও সমিতির লোকের নাম। প্রথম প্রশ্ন উঠল মিলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে কি না, যদি হয়, তবে সে ভার কে নেবে। সফীক উত্তর দিলে, 'চাঁদিতে স্পর্শ দোষ ঘটে না। টাকা যখন আমাদের কাজে লাগে তখন সেটা পবিত্র। আমি এদের কাছ থেকে চাঁদা তোলায় ওপর জোর দিচ্ছি দুটি কারণে: ওঁরা পরস্পরের প্রেমে পাগল নন, হরতালের লোকসান যারা বহন করতে পারবে না তারা ত' দেবেই, তা ছাড়া দেবার সময় যারা জোরে লক্-আউট চালাচ্ছে তাদের অভিশাপ করবেই। মিল্ওয়ালাদের

মধ্যেও বড় ছোট আছে, ছোটরা ভাবে তাদের কম লাভ কিংবা লোক্‌সানের জন্য বড়রা দায়ী, বড়রাও ঠিক একই কথা ভাবে, তবে তাদের লোকসান কখনই হয় না। অতএব প্রত্যেকের ছোট স্বার্থ এই যে তার মিল চলুক, অন্য মিলে ধর্ম্মঘট হোক। এই জন্য টাকা সহজে আসবে, এবং ওদের নিজেদের বিরোধটা খুলবে ভাল। উধামজী ধুনো দেবেন: দেশী-বিদেশী পার্থক্যের। সব মালিকরাই আজ কংগ্রেস ফণ্ডে টাকা ঢালতে তৎপর, সেজন্যও উধামজীর প্রয়োজন। এ ভার তাঁরই।'

দ্বিতীয় অংশের আলোচনার সময় খগেন বাবু ক্ষমা চেয়ে, সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আগে থেকে সর্দ্দার ও সমিতি ঠিক করা কি সম্ভব?

স—'সেইটাই সম্ভব, আপনি যা ভাবছেন সেটা অচল। তা ছাড়া আমরা জানি কে রাজি হবে, কে হবে না।'

খ—'তবু...'

স—'তবু, ডেমক্রাটিক নয়, এই বলছেন ত? ফলে তাই দাঁড়াবে, দেখবেন'খন।'

বি—'খগেন বাবু বলছেন পদ্ধতির কথা।'

স—'সেটা পরে বিবেচ্য।'

শেষ প্রশ্ন উঠল সরকার মিটমাটের জন্য যে চেষ্টা করছেন তার সমর্থন করা উচিত কিনা। বিজন সফীককে সোজা জিজ্ঞাসা করলে এ সম্বন্ধে তার নিজের মত কি।

'নিজের মত নেই। কি ধরণের কথা চলছে খবর পাওয়া যাক প্রথমে...'

করিম বল্লে, 'ওটা আমাদের হাতে নয়! মজদুর-সভা যা করবে তাই হবে।' একজন কর্ম্মী ঘরে এল।

স—'কি খবর?'

'কথাবার্ত্তা কখন শেষ হবে জানি না। এখন ওঁরা খেতে গেলেন। উধামজীর মতে আশা আছে।'

স—'আশা, আশা, আশা নেই, থাকতে পারে না। ওহে বিজন, শুনেছ, আশা আছে, করিম ভাই শুনেছ, আশা আছে!' সফীক হাসতে লাগল, দাঁড়িয়ে উঠে গা হাত মোড়া দিলে, হাত দু'টো সোজা মাথার ওপর উঠে একটা মুঠোয় আবদ্ধ হল, যেন এপষ্টাইনের যীশু দীর্ঘতর হয়ে আকাশ স্পর্শ করছে, তাকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দিচ্ছে না, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দূরত্ব বজায় রাখছে, দু'টোকে এক হতে দেবে না।

'বিজন, তুমি খগেন বাবুর সঙ্গে যাও। রাতে তোমার কোনো বিশেষ কাজ নেই।' এক একজন করে সকলে চলে গেল, বিজন ও খাগন বাবু তখনও বসে রয়েছে দেখে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে পৌঁছে দিতে হবে? ভাবীজী নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু আমার উপস্থিতি কি বাঞ্ছনীয়?' বিজনের সাগ্রহ আমন্ত্রণে খগেন বাবু সায় দিলেন।

ফ্ল্যাটের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। কড়া নাড়তে 'বয়' দরজা খুলে দিলে। বিজনের উচ্চ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে রমলা ঘরে এল। টেবিলে ন্যাপকীন ঢাকা খাবার সাজান রয়েছে। রমলা টেবিলের মাথায় বসে খাবার ভাগ করে দিলে। 'রমাদি, আমার মতন হতভাগাকে নিয়ে চালান শক্ত। ওস্তাদকে ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও। ওর প্রয়োজন আছে যত্নের ভাওয়ালীতে একবার যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে কারুর কথা শোনে না, যে কে সেই!'

র—'তাই না কি!'

স—'বিজনের কথা ধরবেন না। ওটা কানপুর থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার ছুতো ছিল। আমার শরীর এখন খুব ভাল।'

বি—'তা ভাল হতে পারে, কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। একবার যখন রক্ত-বমি হয়েছে তখন……'

খ—'কতদিন আগে ?'

স—'তিন বছর হয়ে গেল।'

খ—'তবে কোনো চিন্তা নেই।' রমলা অন্য কাঁটা দিয়ে মাংসের টুকরো বিজনের প্লেটে দিলে।'

র—'আপনি কিছু খাচ্ছেন না। অসুবিধে হয়ত' হাতে করেই খান।'

খগেন বাবু রমলার দিকে চাইলেন। ঠঙ্ করে রমলার কাঁটা বেজে উঠল।

বি—'রমাদি, ওস্তাদ পুডিং ভালবাসে। আছে ?'

র—'কালকের কিছু থাকতে পারে, দেখছি।' রমলা পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে, 'যতটা আছে তা দেওয়া যায় না।'

বি—'তা হোক।'

র—'আরেক দিন ক'রে পাঠিয়ে দেবো। বিজন, তুমি কি এখানে আজ শোবে ?

বি—'না, আজ থাক।'

স—'আজ নয় কেন ?'

বি—'কোথায় শোবো ?'

খ—'সে জন্য ভেবো না। আমার ঘরে জায়গা আছে।'

খাবার পর বিজন সফীককে খানিকটা রাস্তা পৌঁছে দিতে চাইলে। সফীক প্রথমে রাজী হল না। খগেন বাবুর ঘরে বিজন আর রমলা ঢুকল শোবার বন্দোবস্ত করতে।

খ—'আমি দেরিতে ঘুমুই। খাবার পর একটু হাঁটা ভাল। একটু না হয় যাই ?'

'আসতে চান আসুন।'

একটু দূরেই পথের ধারে একঠা খোলা মাঠ। পার্ক নয়, মাত্র খালি জায়গা, মাটি এবড়ো খেবড়ো, ঘাস নেই, কাঁকর আর কয়লার ওপর হাঁটুতে মচ্ মচ্ শব্দ হয়, পূর্ব্বে বস্তীর আলো টিম্ টিম্ করে, পশ্চিমে রাস্তার বিজলী বাতি নির্লজ্জভাবে জ্বলে। সফীক বস্তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মাটিতে বসল। খগেন বাবু ঘাস খুঁজে তার ওপর রুমাল বিছোলেন।

খ—'আপনার সঙ্গে এত শীঘ্র আলাপ জমবে আশা করি নি। ভাল মিজতে জানি না। আপনাদের মতামতের সঙ্গে আমার পরিচয় বই-এর দৌলতে, তাও সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে অক্ষম।'

স—'কতটা পারেন?'

খ—'গোড়ার তাগিদ মানি। মানুষকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, উন্নতির প্রবৃত্তি, মৈত্রীভাব—এগুলো সভ্যতার তাড়না, বহু পুরাতন। আরো স্বীকার করি, সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে, এমন কি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে।'

স—'কোথায় পারেন না?'

খ—'অতটা মেটিরিয়ালিজম গিলতে পারিনা।'

স—'যদি তাগিদগুলোর অস্তিত্ব গ্রাহ্য হয় তবে মেটিরিয়ালিজমের যান্ত্রিকতা আপনা থেকে বাদ পড়ে। জড়বাদ অনেক রকমের।'

খ—'তা জানি। কিন্তু পদ্ধতিটা? হরতালের জন্য অত হিসেব নিকেশ কেন? আপনি যে প্ল্যান শোনালেন তাতে মানুষের ব্যবহারকে যন্ত্রের পর্য্যায়ে ফেললেন। সকলে যেন পুতুল, আর আপনারা যেন খেলোয়াড়, পর্দার আড়াল থেকে সূতো টানছেন, আর তারা আপনাদের আজ্ঞা পালন করছে। জীবনটা মেক্যানিক্স্ নয়।'

স—'সাধারণ মন্তব্যগুলো ছেড়ে দিন, আমি ঠিক বুঝি না। প্ল্যানের গলদ কোথায়?'

খ—'আমি কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে নামি নি, অতএব আমার সমালোচনা ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু সাধারণ পতিজ্ঞা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি কার্য্যকরী হবে না। আপনি পনের দিন ধর্ম্মঘট চলবে ধরছেন, কেন? বিরোধের সন তারিখ ঠিক করা যায় না। তার ছন্দ আছে, উত্থান-পতন আছে নিশ্চয়, কিন্তু যদি মজুরদের সচেতন রাখা উদ্দেশ্য হয় তবে বিরোধ কোনো এক তারিখে ঝুলে পড়বে ভেবে কাজ করা নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। বিরোধকে চিরন্তন ভাবাই আপনাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। ক্ষমা করবেন। এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি অন্য দিক থেকে সেটাও জীবনের দিক, তাই অন্য দিকেও তার স্বার্থকতা থাকতে বাধ্য। খণ্ড খণ্ড দেখার বিপদ আছে সন্দেহ হয়।'

স—'আপনার মত অনুসারে প্ল্যানকে কতটা সংস্কৃত করবেন?'

খ—'তা আমি জানি না।'

স—'বেশ। ভেবে দেখবেন। অন্য আপত্তি?'

খ—'পূর্ব্বেই জানিয়েছি। আপনারা কেন, নিজেরা পল্লীসমিতির সর্দ্দার ও সভ্যের নাম লিখলেন? কিছু মনে করবেন না, এখানেও জনসাধারণের জীবনশক্তিতে অবিশ্বাস ফুটে উঠছে। 'ডেমোক্রাসি' শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সাম্য-বাদীর সমাজ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অপমান করে, তবে জন-সাধারণের দশা কি হয় ভাবুন দেখি।'

স—'আরো কিছু বক্তব্য আছে?'

খ—'আপাতত কিছু নেই। তবে আবার বলি, অত হিসেব-নিকেশ, অত প্ল্যান সৃষ্টি আমার শিক্ষার হোক বা না হোক, অভিজ্ঞতার প্রতিকূল। জন-সাধারণের ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম ছাড়া নয়, সেই ধর্ম্মবলে শক্তির স্ফুরণ হয় অন্তর থেকে। অতএব, হরতাল সুরু হবে, সামান্য ঝগড়ার বিষয় ছাপিয়ে সেটা দুকুল ভাসাবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আপন বেগে চলবে—এসব

সম্ভব একমাত্র আপন শক্তিতে। মানুষ, নেতা, স্রোতের বড় কুটো মাত্র, এই দেখলাম।'

স—'আপনি কখনও দলভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন?'

খ—'না। করতে পারি নি। একবার দলে এসে পড়ি, কিন্তু প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। আমি বলছিলাম, ব্যাপারটা চলৃতি, স্থাণু নয়।'

স—'কেবলছে স্থাণু! অনেক রাত হল না?'

খ—'তা হোক গে! খোলাখুলি তর্কের সুযোগ দিয়েছেন ব'লে সত্যই কৃতজ্ঞ অবশ্য তর্ক আর হলো কৈ! আপনি মুখ খুললেন না এখনও পর্য্যন্ত।'

স - 'আপনি যা বল্লেন তার আংশিক সমর্থন আছে। ১৯০৫।৬ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সুরু হয় সেটা অনেকটা বন্যার মত এসেছিল। তাতে সর্ব্বপ্রকার বিবর্ত্তন এসে পড়ে, মানসিক পর্য্যন্ত, কিন্তু স্থায়ী হল না এই জন্য যে বন্যাকে খাতে বওয়াবার কোনো উপায়, অর্থাৎ পার্টি ছিল না। তাই দশ বছর বৃথা গেল, তাই অত দামও দিতে হল, তাই অবশ্য অত লোকে কাঁদতেও পারলে। এই প্রকার ঘটনাকে সার্থক সংক্রান্তিতে পরিণত করতে পারে পার্টি। তার কাজ এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসের দিক্ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, পূর্ব্ব থেকে তার খাত তৈরী ও সাধারণকে তার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন করা। পার্টির নেতৃত্ব মানে সংস্থান বুঝে বিরোধকে ঠিক পথে চালান, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, সামাজিক শ্রেণীগত সম্বন্ধের নীচুতে বিরোধকে নামতে না দেওয়া, তাই থেকে শক্তি আহরণ ও তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। এটা আপনাদের জীবন-স্রোতের নিজের ক্ষমতার বাইরে। সেটা অন্ধ, তার চোখ দেয় পার্টি। তাই পার্টির একটা প্রাথমিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু তার কাজের মধ্যেই ডেমক্রাটিক পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচন জনমতের অতিরিক্ত নয়, তার চেতনাংশ মাত্র। জীবনস্রোতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। এতদিন ধরে ত' সেটা বইছে, তবু তার জোরে দৈনিক দুমুঠো অন্ন খড় কুটোর মতন গরীবের পেটে ভেসে

আসছে না কেন? সেখানে যে চড়া! কেন সেটা ব্যাঙ্কের দিকেই অনবরত ছুটছে? সত্য কথা এই : মুখে বলছেন স্রোত, কিন্তু ভাবছেন বৃষ্টি, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতন আকাশ থেকে ঝরছে, আর আমরা শুদ্ধস্নাত হচ্ছি। যদি এক জেলায় না পড়ল, বলবেন তার খামখেয়াল, অন্য জেলায় বেশী প'ড়ে যদি ভেসে গেল, তবু ভাবছেন তাঁরই লীলা। আপনি বল্লেন, মানুষকে অপমান করছি আমরা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কারা করছে বলুন ত! মানুষকে গাছ পালারও অধম ভাবছেন। তার বুদ্ধিকে, তার কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে, তার বাঁচবার চাহিদাকে, সমবেত চেষ্টায় যে-সভ্যতা গড়ে উঠেছে এতদিনে, এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত রক্তপ্রবাহের ভেতর দিয়ে, সেই সভ্যতাকে, সব জিনিষকেই আপনার ঐ স্বতঃপ্রবৃত্ত জীবনশক্তি নাকোচ করছে না কি? ঐ বস্তুটির প্রতি আস্থায় একটা দাম্ভিকতা আছে, যাকে পণ্ডিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আখ্যা দেন, কিন্তু যার স্বরূপ হল একটি মাত্র শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার ধোঁকা। সেটার জন্ম ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন তার বোলাবালাও, সেটা বাড়ল ফ্রান্সে যেখানে বারোটা ঘরোয়ানা সমগ্র দেশের উপর কায়েমী স্বত্ব দাখিল করছে। তার যৌবন দেখতে চান ত' জার্ম্মাণী, ইটালীতে যান, তারাও জীবনস্রোতের দোহাই দিচ্ছে। তাই ফেবীয়াম বার্ণাড শ' মুসোলিনীকে সমগ্র সভ্যতার শত্রু ভাবেন নি। দু'জনেই যে জীবনস্রোতে বিশ্বাসী! অনেক রাত হল না?'

খ—'আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, এইবার ওঠা যাক।'

সফীক খগেন বাবুকে ফ্ল্যাট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে! ড্রয়িং রুমের আলো জ্বলছে, বিজন সোফার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, বুকে একটা বই। নিজের ঘরের আলো জ্বাললেন, বিছানা পাতা, ছোট টেবিলে এক গ্লাস জল, ঢাকা নেই। রমলার ঘরের দরজা একটু ঠেলতেই শব্দ হল......বন্ধ। ফিরে এসে ড্রয়িং

রুমের দরজায় খিল দিলেন। আলো নেভাবার পর নিজের ঘরে এসে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে পড়লেন।

পার্টির প্রয়োজন স্বীকার করা তাঁর পক্ষে শক্ত। আশ্রমবাস তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল। নীচ কলহ, প্রাথমিক উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতা, যৌক্তিকতার বলিদান, গুরুভক্তি, সঙ্কীর্ণতা, সর্ব্বোপরি পরিবর্ত্তন বিমুখতা ও সমগ্র জাগতিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রাণপণ প্রয়াস তাকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করে ফেলছিল। পালিয়ে এসে তিনি বেঁচে গেছেন। তারপর রমলার সঙ্গে যোগ হল। দৈহিক সম্বন্ধে অশান্তির শেষ হবে আশা করেছিলেন। রমলার আশা ছিল ভিন্ন। সে চাইলে ফল, যার দেহ আছে, প্রাণ আছে, যাকে হাতে তোলা যায়, বুকে রাখা যায়, সাজান যায়, পুতুল খেলা যায়, যাকে কেন্দ্র করে সে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তা হল না, অমনি গেল বিগড়ে। পারিবারিক জীবন দৈনিক যুদ্ধের ছোট ঘাঁটি, লোহা আর সিমেণ্টের পিলবক্স। হুড়মুড় করে তার চারধারের কাঁটাতারের বেড়াজাল না ভাঙ্গলে সেই ঘুণ্টি থেকে নতুন বিপত্তির সৃষ্টি হবে, বিপদ বাড়বে, কারণ, গুলি চলবে পিছন থেকে। না, আর দল নয়। অন্ততঃ ও ধরণের নয়।

তবে যদি সচেতন ব্যক্তির সঙ্ঘ হয় তবে পৃথক কথা। কারা সচেতন? যারা অভিব্যক্তির ধারাটি বুঝেছে। অভিব্যক্তি জীবজগৎ থেকে আরম্ভ, সমাজে ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। প্রথম দিকটায় না হয় জীবনস্রোতের খেলা, তারপর কিন্তু মানুষের নিজের প্রয়াসই বেশী। প্রয়াস মানে পরিশ্রম নয় কেবল, ভেবে-চিন্তে পরিশ্রম। চিন্তার বিষয়বস্তু থাকা চাই, নিরালম্ব চিন্তা মস্তিষ্কের চঞ্চলতা। বিষয় হল সামাজিক বিবর্ত্তনের রীতি আবিষ্কার। সেটা সম্ভব তখনই যখন বিবর্ত্তনের প্রতিজ্ঞা মানুষের করায়ত্ত। প্রতিজ্ঞাটা হল বিরোধ। কিন্তু কার সঙ্গে কার? ওরা বলছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। অত কাটা ছাঁটা বিভাগে প্রত্যয় আসে না। বিভাগ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট। অবশ্য, স্পষ্ট হলেই সত্য হবে, এবং

অস্পষ্ট হলেই সেটা মিথ্যা, এ-ধরণের যুক্তি অচল। কবিতায় যে-ভাব প্রকাশিত হয় সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অথচ যে কবিতা যত অস্পষ্ট ভাবকে গোচরে আনে সে-কবিতা তত ভাল, তার কবির তত বাহাদুরি। সচেতন পুরুষ এই হিসেবে আর্টিষ্ট। এবং বৈজ্ঞানিকও জানবার পদ্ধতিতে। গ্রহ-উপগ্রহের প্রকৃতি অবিদিত ছিল সেদিন পর্য্যন্ত, আজ তার ধাতু, তার ব্যবহার সবই প্রায় জানা গেছে। তা ছাড়া, চিন্তার উদ্দেশ্য আছে। আত্মোন্নতি......সেটার পরিমান নেই, প্রমাণ নেই, আত্মপ্রসন্নতা ছাড়া তাতে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে যে-চিন্তার উদ্দেশ্য সামাজিক বিবর্ত্তনকে সাহায্যদান তার সাধনাই মঙ্গল। একার কাজ নয় কিন্তু। সমগোত্রের সহানুভূতি চাই। চৈতন্য যতই উন্নত হোক না কেন, একজন, দু'জন, তিনজন পুরুষের চৈতন্য অসম্পূর্ণ। এইখানে পার্টির আবশ্যকতা।

তবু কোথায় যেন খিচ্ লাগে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সৎ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। সফীকের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় যে সে উপায়ে মর্য্যাদা দেয় না, তার কাছে উপায় উদ্দেশ্যের অধীন। এটা অ-যৌক্তিক এইখানেই সন্দেহ হয় যে তার যুক্তি অবরোহী; সত্তাকে সে মূলাধার, সারাংশ ভাবে, তার ক্রমিক গতি, তাব পরম্পরায়, তার প্রকাশে সে বিশ্বাসী নয়। অভিপ্রায় উদ্দেশ্য খুলবে উপায়ের সৌজন্যে। যে ব্যক্তি দুটোকে পৃথক রাখে সে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য। সফীকের মধ্যে একটা জবরদস্তীর ভাব আছে, তার সঙ্গে মিশেছে সীনি-সিজম্, হতাশ আদর্শবাদ। তার ঔচিত্যজ্ঞান অ-বৈজ্ঞানিক, কারণ সেটার যুক্তি প্রণালী উদ্দেশ্যরূপ প্রতিজ্ঞা থেকে কর্ম্মে আরোহণ করছে না। সে বলবে, এইটাই বৈজ্ঞানিক, ঔচিত্যানৌচিত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর বাইরের সামাজিক সংস্থান, যেটা ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির সম্পর্করহিত, নৈরাত্ম্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মানুষে যখন বিচার করে তখন তার ভয়-ভাবনা আশা-ভরসা বিচারের সঙ্গে মিশে যায় সেগুলি-বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু বাদ দিলেই কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ হল!

অবজেক্টিভিটির চর্চ্চাই বিজ্ঞানের সর্ব্বস্ব নয়, তা ছাড়াও যুক্তিতর্কের অন্য বিশেষত্ব আছে। অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে না তুললে বিজ্ঞান নিরর্থক। অভিজ্ঞতা ছক কেটে চলছে সর্ব্বদা, অতএব উদ্দেশ্যও স'রে যাচ্ছে। তাই যদি হয় তবে অমন গোঁড়ামী সম্ভব কিসের জোরে? অভিজ্ঞতাই মূল। অবশ্য সচেতন অভিজ্ঞতা। আবার সেই 'চেতনা' ঘুরে ফিরে এসে গোলমাল বাধায়।

তার চেয়ে তাকে ধুয়ে মুছে তাকের ওপর তুলে রাখাই মঙ্গল, তার মাথায় হাতুড়ি মেরে বিছানায় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রাখাই ভাল, কবর দেওয়ার আগে যেমন বিলেতী রাজোয়াড়াদের রাখা হয়, মাথায় জ্বলুক মোমবাতি, পায়ের কাছে দাঁড়াক সুসজ্জিত প্রহরী ঘাড় নীচু করে, তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে, ভোর বেলায় আসবেন রাণী হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় মুখ বাড়াতে, রাজার হাতে চোখের জল ফেলতে। খগেন বাবুর হাতটা ছ্যাঁক করে উঠল। 'তুমি? কেন, কেন আবার এলে? এত কষ্টই বা কিসেব? এই ত' রয়েছি।'

(৪)

রমলা ভাবে দূরত্ব বেড়েই চলল। লেডী ডাক্তারে বলেছিল নিয়মিত ওষুধ খেলে তার সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে। এতদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ খেয়েছে, অথচ পরীক্ষা করবার সুযোগ মেলে নি। দম্ভের বশে পৃথক ঘরে রইল, কেন সে মান খোয়াবে? খগেন বাবুর জন্য সে কি কিছুই ত্যাগ করে নি, সুনাম, সামাজিক স্থান, সামান্য সুবিধা? অথচ তার প্রতিদানে প্রভেদ কমল না, নতুন আগ্রহ, নতুন ভাবনা এসে জুটল, নতুন সঙ্গী হল, সফীক, বিজন তাকে 'ওস্তাদ' বলে ডাকে বিজন, হাঁ, বিজন পর্য্যন্ত। যতদিন মাসীমার দাসত্ব ছিল, ততদিন তবু আশা ছিল। মেয়েতে মেয়েতে যুদ্ধ সম্ভব। মাসীমা কতটা দিয়েছেন—স্নেহ, মমতা, আশীর্ব্বাদ, টাকা, আদর? তার বেশী সে দিতে পারে, দিয়েছে, সঙ্গ, রূপ, যৌবন, বেশ রূপ না হয় নেই, যৌবন না হয় গেছে, তবু যা আছে তাতে, ওর না হয় লোভ নেই, অন্যের সুজনের হয়ত লোভ আছে। কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধ অন্যায়। সফীক

তাকে অপমান করলে কৈ ও ত' প্রতিবাদ করলে না! ওর কি উচিত ছিল না অন্যের সম্মুখে তার সম্মান রক্ষা করা? সফীক কি এমন দেবে, তার দলের কাছে ও কী এমন পাবে, যাতে ক্ষতিপূরণ হয়! ক্ষতিই বা কোথায়! এমন কি টাকার দিক থেকেও নয়। তবু কেন এমন ঘটে! কেনো সে বোঝে না তার কথা! তার কি কোন দিকই নেই! সব পুরুষই স্বার্থপর। ওদের উদ্দেশ্য কেবল নিজের কার্য্যসিদ্ধি, দেহের ক্ষুধা মেটান, আরাম পাওয়া· আর গৌরব-বোধ, সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, পায়ে লুটচ্ছে, কাঁদছে, মরছে। মেয়েদেরও ওপর ঘৃণা আসে। তার চেয়ে দরজা বন্ধ থাক······ডাকলে খিল খুলবে না, ডেকে ডেকে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু দেহের শিরা উপশিরায় ডাকবার সময় বিদ্যুৎ চমকায়, বুক গুরু গুরু করে, পা শির শিরিয়ে ওঠে, খানিক পরে দেহ অবশ হয়, চোখে অকারণে জল আসে। চিরটাকাল এই দৈহিক দৌর্ব্বল্যে ও যন্ত্রণায় মেয়েদের ভুগতে হবে, কোনো অব্যাহতি নেই কি! এই বাধ্য-বাধকতার ওপর ভিত্তি করে সমাজ আর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। রাতে ডাকলে মুখে উত্তর না দিলেও দেহে সাড়া দেয়—এই আদিম, প্রাথমিক জৈব দুর্ব্বলতাকে নিজেদের কাজে লাগান কি নীচ নয়! মেয়েরা পারে না থাকতে, এইটাই পুরুষের শক্তি। ইচ্ছা হয়, সব মেয়েরা সমগ্র পুরুষ জাতকে দুর্ব্বল করে দিক, সেজে, লোভ দেখিয়ে, নির্লজ্জভাবে। ও বল্লে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে, 'দেহের উগ্র বিজ্ঞপ্তি'। কেন বিজ্ঞাপন হবে না? মেয়েদের সম্মান নেই, রাগ হয় না! যতদিন এই ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন মেয়েরা নিজেদের যার-তার হাতে সমর্পণ করুক, বেটাছেলেরা জব্দ হোক, তাদের দম্ভ টুটুক, সমাজ ভাঙ্গুক, পারিবারিক সম্বন্ধ উচ্ছন্ন যাক।

এক এক সময় আবার রমলার সন্দেহ হয় খগেন বাবু অন্য পুরুষ থেকে ভিন্ন। সে বুঝতে চায়, তার দরদ আছে, অন্তত ছিল। গেল কেন? প্রথমে সন্ন্যাসী, তার পর বিজন, ঐ সফীক, ঐ বাইরের টানের জন্য। ও চায় না সংসারে জড়াতে, ও চায় বাইরে থাকতে। তা হয় না। তাই যদি বাসনা ছিল তবে কেন কানপুরে আসা?

দুর্ব্বল, দোলায় দুলছে, কচি খোকার মতন ঝুমঝুমি আর চুষি কাটি দিয়ে ভোলাতে হবে—তাই তার যোগ্য, তাই তার প্রাপ্য। ও চায় না সত্যি মানুষটাকে পেতে, ভুলতে পেলেই ও খুশী। বেশ, সেই ভাল। রমলা ঘর সাজাতে তৎপর হল, আবদার ধরলে সপ্তাহে এক সন্ধ্যা অন্তত সিনেমা যেতে হবে। বিজন এ কাজে সহায়তা করবে, তাই বিজনেরও চাহিদা বাড়ল রমলার কাছে।

লক্ষ্ণৌ, ফরাক্কাবাদ, জয়পুরের ছিট সহরে প্রচুর পাওয়া যায়, দামও সস্তা। কিন্তু ছিট্ দিয়ে চেয়ার কোচ টেবিল ঢাকা যায় না, ঘরদোর যেন খালি সেমিজ পরে রয়েছে মনে হয়। তার চেয়ে বিলেতী কাপড়ে আভিজাত্য আছে। খদ্দর অচল। ভাড়াটে আসবাবে বসতে ঘেন্না করে, টে'স ফিরিঙ্গীর এঁটো। বিজন নতুন স্বদেশী ডিজাইনের আসবাব দেখালে, দূর থেকে দেখতেই ভাল, কিন্তু বসা যায় না পা ঝুলিয়ে, পিঠে লাগে, অজন্তা আর মোগলাই-এর মিশ্রণে অসুবিধাই ফুটে ওঠে। তার চেয়ে বিলেতী আসবাবই ভাল, হোক তার গদির গরম, তবু দেহের বাঁকগুলো মেনে চলে। বিজন বল্লে বুর্জ্জোয়া রুচি। সেও অসহনীয়, ভারতীয় বুর্জ্জোয়া রুচি নয় এই ভাগ্য খগেন বাবুকে মধ্যস্থ মানাতে তিনি রমলার মতে সায় দিলেন।

রমলা দেশী ফিল্ম্ কিছুতেই দেখবে না। তার ভাববিলাস, তার মন্থর গতি, তার গান বাজনার আধিক্য, তার দৈর্ঘ্য, তার গল্পাংশের দুর্ব্বলতা, তার অনুকরণ, তার ফোটোগ্রাফি, কোনোটাই তার পছন্দসই নয়। মাত্র দু'তিনটে দেশী ফিল্ম্ তাকে দেখতে হয়েছে, আর দেখবার দুরাশা তার নেই। বিজন কিন্তু অতটা খারাপ বলে না, নতুন ছবিগুলো মন্দ হচ্ছে না, আদর্শ-বাদের একটা ছাপ পড়েছে, গানও মন্দ নয়, ফোটোগ্রাফি প্রায় নির্দোষ। তবে গল্প দুর্ব্বল নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় কি? সামাজিক সম্বন্ধকে অতিক্রম করা অসম্ভব কোনো আর্টের পক্ষেই। তবে ফিল্মের ভবিষ্যৎ আছে জনমতের পরিবর্ত্তন সাধনের দিক থেকে। খগেন বাবু এক্ষেত্রেও রমলার সঙ্গে একমত। বিলেতী ছবির ভাববিলাস অন্য ধরণের। তার অন্তরে একটা

সন্দেহ লুকিয়ে থাকেই থাকে। দেশী ফিল্‌ম্ অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, বালিগঞ্জের লেকের ধারে বেঞ্চিতে এণ্ডির পাঞ্জাবী পরা, কোঁচান চাদর ঝোলান সদর-অলার মতন, কেবল একশিরার জন্য যা একটু হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় উঠে নাই।

ক্লাবের কথা উঠতে খগেন বাবু কেবল এইটুকু বল্লেন, 'না পার একলা থাকতে পরে দেখা যাবে। আগে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হোক তার পর ভাল দেখে একটা ক্লাবের সভ্য হলেই চলবে। এত তাড়া কিসের?' বিজন অবশ্য ইডীয়লজির দিক থেকে ক্লাব-ট্লাবের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে মধ্যে মধ্যে যেতেই হয়, টেনিস খেলতে। তা ছাড়া যারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামছে না তাদের পক্ষে সময় কাটান দুঃসহ। অবশ্য, আজকালকার ক্লাবে এমন দু'একজন লোকের সন্ধান মেলে যারা ব্রীজ খেলা আর গাল-গল্প করাকে জীবনের চরম সাফল্য ভাবে না। তাদের অনেকেই বেশ পড়াশুনো করেছে; বিলেতী সঙ্গীতে দখল রাখে, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলে, প্রায়ই মার্ক্সিষ্ট, বেচারীরা কোথাও কথা কইতে পায় না, তাই সন্ধ্যায় ক্লাবে আসে। তবে ব্যাপারটা বুর্জ্জোয়া এটা ঠিক। মোটর নেই অথচ ক্লাবে যাব, এটা অসম্ভব।

খগেন বাবু রমলার পরিবর্ত্তনে খুশীই হলেন। দুজনে যখন একত্র বসবাস করতেই হচ্ছে, তখন সহজে আদান-প্রদান ভিন্ন গতি নেই। রমলা না এলেই পারত। এমন ত কত দৃষ্টান্ত হিন্দু-সমাজেই রয়েছে যেখানে দু'জনে পরস্পরকে আন্তরিকভাবে চাইছে, অথচ মিলন অসম্ভব জেনে আপন আপন নিয়তিকে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। ছেলেপুলেও হচ্ছে, ভাবও থাকছে। অবশ্য মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু নিরুপায়, তাই সম্বরণই রীতি, সংযমই নীতি। খগেন বাবু নিজেও এই বিপুলা পৃথ্বীর কোন অজানা দেশে প্রবাসী হলেই পারতেন, বিদেশ যাবারও দরকার হত না. লাইব্রেরীর মধ্যে বইএর ওপর মুখ গুঁজড়ে থাকলেই চলত, কোণে একটি নরম চেয়ার, পাশে একটা ছোট টেবিল, হাতলের ওপর লিখবার তক্তা, আর একটা ভাল চাকর, যে কফি আর পাইপ সাফ্ করতে জানে, আর তাক থেকে বই এনে দিতে

পারে। সে জীবনটা মন্দ ছিল না, কিন্তু প্রতীতি জন্মাল যে বহির্মুখিনতায়, কর্ম্ম প্রবাহে দ্বন্দ্বের অবসান আসবে। এইটাই জড়বাদের জয়, অশান্তির ক্ষয়, তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়। দেহের চর্চ্চায় যে সহজ আনন্দ জন্মায় তার মূল্য এই বিচ্ছিন্ন জগতে কম নয়। যখন হিন্দু সভ্যতা জোরাল ছিল তখন জড়বাদ হেয় হয় নি, তখন কামশাস্ত্রে চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটির কদর ছিল, খোঁপা বাঁধারই বা কত ঢঙ, গন্ধ-মাত্রারই বা কত রকম, মালাই বা কত রঙ বেরঙ ফুলের, তা ছাড়া, গান বাজনা নাচ, ন্যায়, পান সাজা পর্য্যন্ত। দেহের প্রতি অঙ্গের পরিশীলনে যেটা ফুটে উঠবে সেটা হবে দেহাতীত, এই ছিল উদ্দেশ্য। জড়, বস্তু, তথ্যই প্রথম, প্রথম হলেই সর্ব্বস্বতা আর থাকে না, ব্যাপারটা গৌণ হয়ে ওঠে। নচেৎ তাকে অবহেলা করলেই সেটা উঁকি মারবে, অজানিতে সব কৃষ্টিকে টেড়া করে দেবে, ফলে কাঁটার জন্ম, ফুল নয়, ফলও নয়। অতএব রমলার স্ত্রীত্বটাই তার সঙ্গে সম্পর্কের আদিম প্রতিজ্ঞা। তার ওপর খগেন বাবুর ব্যবহার যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন খগেন বাবু অন্য কাজে মন দিতে পারলেন।

ইতিমধ্যে কানপুরের ঘটনাবর্ত্তের চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করেছে। গুমোট ঘরে পাখার ঝড় ছাপিয়ে ঝির ঝিরে মৃদু মন্দ হাওয়া এল। লক-আউট আর হরতালে এখন কোনো প্রভেদ নেই। হরতাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রথমে সমগ্র মজুর সংখ্যার শতকরা বার জন হরতালী ছিল, এখন কুড়ি। কাগজে লিখেছে, অনুপাতটা যৎসামান্য, অতএব আন্দোলনটা আংশিক ও জনকয়েক বাইরের লোকের, যাঁদের কাজকর্ম্ম নেই, যারা সম্ভবতঃ কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের টাকা খেয়েছে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ ও মজুর-কিষাণদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক, ভদ্রতা, এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্তকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, যারা জাতীয়তার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন না বুঝে একটা কাল্পনিক শ্রেণীর স্বার্থ ও তারই বিশ্বজনীনতাকে শ্রেয় ভাবে, তাদেরই কারসাজি মাত্র। খগেন বাবুর বুদ্ধি ঐ সব যুক্তি গ্রহণ করল না, মন বিরক্ত হল তার অসারত্বে। দৈনিক কাগজ তিনি নিয়মিত কখনও

পড়তেন না, পড়লেও ব্যস্ত হতেন না। এখন সকালে অন্তত তিনখানি দৈনিক চায়ের টেবিলে থাকবে হুকুম দিলেন। তারপর কাটিং রাখার পালা, বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সংবাদ সংগ্রহেই যায়।

ঐ সব কাগজের টুকরো নিয়ে প্রত্যেক দিনই তিনি বিজনদের আড্ডায় যেতেন। সফীকের সঙ্গে আলোচনা হত। অনেকেই আসত, তার মধ্যে করিমকে বিশেষ ভাল লাগল। জীবনে তিনি ঐ ধরণের লোকের সঙ্গে মেশেন নি, তথাকথিত বড় লোকের সঙ্গ তিনি চর্চ্চা করেননি অবশ্য, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যাদের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন তারা কেউই অন্নকষ্টে ভোগেনি। শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিবেশই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই সর্ব্বপ্রথম অশিক্ষিত ও গরীবদের মধ্যে বুদ্ধি ও তেজের নিদর্শন তিনি পেলেন। বরাবর তিনি এই ভেবেছেন যে শিক্ষার অভাবেই দেশ স্বাধীন হবে না, অতএব জনগণের মধ্যে শিক্ষার যত বিস্তার হয় ততই মঙ্গল। উচ্চশিক্ষা না হলেও চলবে, কিন্তু অন্তত পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত, বি, এ, ডিগ্রী হলেই ভাল। অর্থাৎ মনটা সজাগ না হলে স্বরাজ-সাধনা স্বপ্নবিলাস।

করিমকে দেখে সজাগ রাখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। প্রথম উদ্দেশ্য যদি স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা হয়, তবে করিমের অ-শিক্ষাই যথেষ্ট। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, তার অতিরিক্ত সমাজের স্বার্থ, অর্থাৎ মঙ্গল। করিম অবশ্য সমগ্র সমাজের কল্যাণ কামনা ও কল্পনা করতে অসমর্থ, কিন্তু মনে হয় যে-ধরণের মঙ্গল সে চাইছে সেটা অধিকতর পরিব্যাপ্তির প্রতিকূল মোটেই নয়, বরঞ্চ অনুকূলই সে ভাবছে। এটা ঠিক, করিমের দলবল এখনকার ওপর স্তরের লোকজনকে সে-ভাবে দেখবে না, যে রকম বড় লোকেরা এখন গরীবদের দেখছে। কারণ সোজা, তখন ব্যবসায় মুনাফার হারবৃদ্ধির তাড়না থাকবে না। তবে করিমের চেতনায় ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি স্পষ্ট নয়। আবার সেই চেতনার কথা ঘুরে ফিরে আসে। সেটা বুদ্ধি নয়,

শিক্ষার্জ্জিত ফল নয়, জ্ঞানও বলা চলে না তাকে। খগেনবাবু তার কোনো সংজ্ঞাই দিতে পারেন না।

সফীককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে কূটতর্ক এড়িয়ে চলে, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ নয় বেশ বোঝা যায়। অবান্তর ব'লে, না, অনেক গোড়ার কথা কইতে হয় তাতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেটা সে চায় না, এই জন্য? মৌনতায় শক্তি বাড়ুক আর নাই বাড়ুক শক্তি ক্ষয় হয় না নিশ্চয়। ভাওয়ালীর নির্দ্দেশও হতে পারে। ভাওয়ালীর নামে প্রাণে আতঙ্ক জাগে। যারা নতুন সমাজ গড়তে যাচ্ছে কোথায় তাদের প্রাণের প্রাচুর্য্য থাকবে, পরিবর্ত্তে তাদেরই মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বেশী। প্রকৃতির কি ক্রূর পরিহাস? তারই প্রত্যুত্তরে কি সফীকের ঠোঁট বাঁকা? প্রকৃতির না প্রতিষ্ঠানের? যক্ষ্মা সামাজিক ব্যধি; দারিদ্র্যের রোগ; হয়ত সাম্যবাদ যক্ষ্মারোগীর সর্ব্বজনবিদিত আশাসর্ব্বস্বতা, বাঁচবার ব্যাকুলতা। তবু, রমলা কেন অসভ্যতা করলে! ইতিপূর্ব্বে টেবিলে সে কখনও অভদ্র হয় নি। আশ্চর্য্য লাগে। জিজ্ঞাসা করলে সেও কারণ বলতে পারবে না, কিংবা বলবে না, সফীকেরই মতন নীরব থেকে ব্যবহারকেই চরম পরিচয়ের বিষয়, সেইটাই মানব সম্বন্ধের একমাত্র যোগ, এবং তার অতিরিক্ত জ্ঞানের অপ্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন করবে। চারধারেই দরজা বন্ধ, দেওয়ালে মাথা ঠোকে, সর্ব্বত্রই জড়। তবে কি চেতনা কোথাও নেই, কোন্ ছিদ্র দিয়ে বহির্গত হয়ে মানুষ মানুষকে বোঝে, কবি স্বল্পবাক্যে অশরীরী ভাবকে মূর্ত্তি দেয়, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পদ্ধতি উদ্ঘাটন করে, একজন আরেকজনকে ভালবাসে? ব্যবহারটাই যথেষ্ট মানা অসম্ভব—আচরণের অনুরণন রয়েছে, উদারা মুদারা তারা পৃথক নয়, একত্রে বাজে, রেশ বাদ দিয়ে সুর নেই। আচরণ চৈতন্যের আশ্রিত, চৈতন্যের কাছে লোকে স্পষ্ট অর্থ প্রত্যাশা করে। পায় না, কারণ আচরণে অনেকখানি জড় মেশান রয়েছে—বিশেষতঃ মেয়েদের। রমলা বুদ্ধিমতী নিশ্চয়, কিন্তু ব্যবহারে অনিশ্চিত। কোন্ দিকে বেড়াল লাফাবে কে জানে? যদিও পড়বে শেষে সেই খাবারই ওপর, মাটির

পরে। মেয়েদের মধ্যে মার্জ্জার অংশই বেশী। সফীক জড়বাদী তবু তার ব্যবহারে জড়ত্ব নেই। রমলারই মতন ব্যবহার-সর্ব্বস্ব, তবু সে সুনিশ্চিত। চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—আগে বীজ না আগে ফল এ তর্ক বিফল—যে জানে অচ্ছেদ্য সেই সহজ, যে ভাবে পৃথক সে লজ্জা পায়, তাই সে অনিশ্চিত, খামখেয়ালী।

প্রথম প্রথম খগেনবাবুর আর সফীকের মধ্যে যে আড়ষ্ট ভাব ছিল সেটা ঘুচে গেল একটা কাজের মারফতে। সফীক খগেন বাবুকে অনুরোধ করলে যে যদি তাঁর সময় থাকে তবে মন্ত্রীপক্ষের জন্য একটা নোট লিখতে হবে। বিষয়টি হল এইঃ মালিকদের এমন কোনো অধিকার আছে কি না যাতে তারা মজুরদের তাড়াতে পারে। খগেন বাবু রাজি হলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত খেটে তিনি একটা খসড়া তৈরী করলেন। খগেন বাবুর মতে কোনো অধিকারই নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, কিংবা অবাস্তব ও জন্মগত নয়, অধিকার থাকলেই কর্ত্তব্য থাকবে। অধিকার ও কর্ত্তব্য দুয়ে মিলে আইনের চুক্তি। অন্য দেশের মজুর-সভার সঙ্গে মালিকদের বোঝাপড়া থাকে যাতে মজুরীর সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয়, সেই বোঝাপড়া সরকার স্বীকার করে নেয়। এ ক্ষেত্রে মজুর-সভাকেই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, অতএব বোঝাপড়া, অঙ্গীকার, স্বীকারের কথাই আসে না। তবে অন্য দিকে বলা চলে প্রভু-ভৃত্যের আইন-সম্মত সম্বন্ধে বরখাস্ত করবার ক্ষমতা মালিকদের ওপর ন্যস্ত হলেও সুনির্দ্দিষ্ট কারণের অবর্ত্তমানে চাকরী থেকে তাড়ানতে ক্ষতিপূরণের দাবী জন্মায়। কিন্তু কারণ দেখান মালিকের পক্ষে যেমন সোজা, অ-প্রমাণ তেমনই মজুরদের পক্ষে কঠিন, কারণ, ব্যয়সাধ্য। অতএব, 'কলেক্‌টিভ্‌ বার্গেনিং'-এর অধিকার অর্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত মালিকরাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

সফীক নোটটি পড়ে বল্লে এটা মন্ত্রীপক্ষের হাতে দেওয়া চলে না। খগেন বাবু একটু ক্ষুন্ন হয়ে উত্তর দিলেন, 'এখনকার ব্যবস্থা যা তার অতিরিক্ত লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব!'

স—'তা ঠিক। কি ভাবে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে সে সম্বন্ধে ধারণার অভাবে এর বেশী বলাও যায় না।'

খ—'বরখাস্তের অধিকার নিয়ে বিবাদ এখন সমীচীন নয়। আমার মতে কলেকটিভ বার্গেনিংএর ওপরই আপনারা জোর দিন।'

করিম বল্লে,—'সেটা পরে আনবে, আগে মজদুর-সভা যে কানপুর শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি এটাই ওদের স্বীকার করান চাই। অবশ্য বাবু যা বলছেন সেটাই দরকারী।'

খগেন বাবু উৎসাহের সঙ্গে করিমের বক্তব্য সমর্থন করলেন। সফীকের রূঢ়তায় মনটা ভারী হয়েছিল, এখন লঘু হল।

করিম বল্লে,—'বাবু সাহেব, সব চেয়ে কম মজুরী, যার কম দিলে কর্ত্তাদের জরিমানা হয় শুনেছি, সে বিষয় কেতাবে কি বলে? অন্য দেশে ঐ রকম কানুন আছে শুনেছি, এখানে হবে না কেন?'

বিজন—'ওরা বলছে মাত্র একটা সহরে, একটা প্রদেশে ঐ আইন চালান দুষ্কর, কোথাও এমনতর হয় নি।'

খ—'কাগজে দেখলাম বটে। ওদের মতে, নিম্নতম পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র, কাজটা প্রাদেশিক সরকারের নয়, কারণ প্রাদেশিক হার কম-বেশী হলে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শ্রমিকরা চলে যাবে।'

স—'মূলধনও ভাগবে ভয় দেখিয়েছেন।'

বি—'এর জবাব কি, ওস্তাদ?'

সফীক আর করিম, উভয়েই খগেন বাবুর দিকে চাইলে। খগেন বাবু বল্লেন যে তিনি ব্যাপারটি বিশদ করে বুঝবেন প্রথমে, তারপর যদি নোট দরকার হয়, তবে একটা লিখে দেবেন।

পরের দিন একজন কর্ম্মীর সঙ্গে খগেন বাবু লাইব্রেরী ঘেঁটে বেড়ালেন। যা

বই ও রিপোর্ট পাওয়া যায় সেগুলি পুরানো, তাতে কাজ চলে না। মজদুর সভার বাড়িতে ও বালাই নেই, খানাতল্লাসীর ভয়ে এবং অর্থাভাবে। সহরে অনেক কলেজ আছে, তারা নাকি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে চায় আবার! মজুর-সমস্যা সংক্রান্ত পাঠের কোনো বন্দোবস্ত নেই। যা পাওয়া গেল তাই পড়ে খগেন বাবু আড্ডায় গেলেন। ইংরেজীতে বল্লেন সফীককে যে কর্তৃপক্ষদের আপত্তি টেঁকে না। ক্যানাডায় প্রথমে প্রদেশে প্রদেশে, এমন কি আরো ছোটো ছোটো জায়গায়, রিজ্যনে, সর্ব্বাগ্রে নিম্নতম মজুরীর হার ঠিক হয়েছে, পরে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য অদল বদল করে সেই বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছে। সফীক খগেন বাবুর কাছ থেকে ছোট একটি নোট লিখিয়ে সেটা তখনই উধামজীর কাছে পাঠালে। খগেন বাবু জানতে চাইলেন, যদিই বা যুক্ত-প্রদেশে নিম্নতম হার ঠিক হয়, তবে ভিন্ন প্রদেশে মজুরীর হার কমবে না বাড়বে?

সফীক—'কমত—বাড়ত, যদি প্রবাসী হবার মোহ থাকত লোকের। তারা ঘরের কোণেই জন্মাবে ও মরবে। হার কতটা তারই ওপর নির্ভর করছে। যদি উঁচু হয়, তবে গ্রামে যাদের জমি নেই তারা কানপুর আসবে। কোলকাতা বোম্বাই, শোলাপুর, আমেদাবাদের গড়পড়তা মজুরীর চেয়ে এ-অঞ্চলে নিম্নতম মজুরি কিছুতেই যখন বেশী হচ্ছে না তখন ও-অঞ্চলের ক্ষতি হবে না। সেইখানেই এই প্রদেশের মজুর বেশী গিয়েছে। অতএব ক্ষতি কিছুতেই কারুর অর্শাবে না। এখানকার হার যদি সত্যই বেশী হয়, তবে কানপুর লোক আকর্ষণ করবে, সেটা লাভ, কারণ...'

খ—'ক্ষতি হবে মালিকদের, তারা কি মজুরীর অতিরিক্ত ভারে নুয়ে পড়বে না? কিছুদিন পরে তারা অন্যত্র মিল খুলবে, যেখানে ঐ সব ঝঞ্ঝাট নেই।'

স—'মিথ্যে কথা! তাদের লাভের হার দেখেছেন? যতদিন শ্রমিক-আন্দোলন চলেছে ততদিনে তাদের উৎপাদন বেড়েছে, কমেনি। কেবল

তাই নয়—এরই মধ্যে ক'টা নতুন কোম্পানি ও কল খোলা হয়েছে জানেন ? গোলমালের হাত থেকে রেহাই পেতে যদি অন্যত্র, আশ পাশের রিয়াসতে ফ্যাক্টরী খোলা হয় তবে সেখানকার লাভ, সেখানকার ফিউড্যালিজম্ শীগ্গির ধুলিসাৎ হবে। খাল কেটে কুমীর ঢোকানটা ভারি মজার! বোম্বাই থেকে আমেদাবাদের মিলগুলো উঠে গেল, না খেতে পেয়ে পুঁজিদাররা মরে যাচ্ছে ? টাকা সেখানে মাটিতে পোঁতা রয়েছে ?'

বিজন বল্লে, 'তা ছাড়া মজুরী বাড়লে কর্ম্মক্ষমতাও বাড়ে। সেই দিক থেকেও ওঁদের লাভ।'

বাড়ি ফিরে খগেন বাবু স্নানের কামরায় গেলেন। শুখনো গরমে নেয়ে সুখ নেই, তখনই তেষ্টা পায়। বাস্তায় ধূলো আর কয়লা, সফীকদের ঘর খুব নোংরা নয়, তবু তার অপরিচ্ছন্নতা খারাপ লাগে। পুরুষের চেষ্টায় ঘর দোর পরিষ্কার সহজেই রাখা যায়, তবে ছেলে-ছোকরাদের ওদিকে খেয়াল থাকে না। রমলার নজর অবশ্য একটু বেশী, চাকর খাটায় সাবিত্রীর চেয়ে কিন্তু সাবিত্রীর গিন্নীপনায় আপত্তি জমত, রমলার প্রভুত্ব সহজ ; চাকর-বাকরে বেশ বুঝে নেয় কোথায় ও কতখানি অবাধ্যতা চলবে। কারণ, গোটা মানুষের ব্যবহারে ফাঁক থাকে না যার ভেতর দিয়ে অবাধ্যতার আগাছা ফুঁড়ে বেরুতে পারে। কম মেয়েরাই আস্ত জীব। রমলার ব্যবহারে পূর্ব্বে একটা সামঞ্জস্য ছিল, কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, নইলে সাবানের বাক্সে জল থাকে ? এই ধরণের ঢিলেমি তিনি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করেন নি। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লোকে ভাবে সামান্য জিনিষ এগুলো, কিন্তু ভেবে দেখলে এই খুঁটিনাটি গাফিলতীতে অযত্ন ধরা পড়ে, চরিত্রের দুর্ব্বলতা, মনোভাবের পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন নিজের সাজসজ্জায় ত্রুটি নেই, ক্রমেই সেটা উগ্র হয়ে উঠছে।

রমলা আর বিজন টেবিলে অপেক্ষা করছিল। খগেন বাবু বসে গেলেন।

বয় স্যুপের প্লেট নিয়ে যাবার পর আড়ষ্টতা ভাঙল। বিজন কাঁটা ঠুকতে ঠুকতে বল্লে, 'উনি নাকি চাকরী করবেন!' খগেন বাবুর মুখে কোনো ভাবের চিহ্ন ফুটল না দেখে বিজন নিজেই মন্তব্য করলে, 'চাকরী অমনি কথার কথা আর কি! তাব চেয়ে মজুর পল্লীতে ছেলেমেয়েদের পড়ান ভাল! কি বলেন, খগেন বাবু?'

খ—'আমি কি বলব! ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।'

র—'তোমাদের উর্দ্দু আমি জানি না।'

খ—'পাড়াও অত্যন্ত নোংরা।'

র—'এখানে বাঙালী মেয়েদের স্কুল নেই?'

বি—'আছে, খুব ভাল স্কুল। কিন্তু দশটা চারটে, মনে থাকে যেন, পারবে? তা ছাড়া একটা বড় কথা আছে...সাধারণ ভাবে বলছি।'

খ—'বলই না! বড় কথাই ত' শুনতে চাই।'

বি—'ঠাট্টা ছাড়ুন; সব বাঙালী অ-বাঙালী, মেম মাষ্টারণীদের দেখলে দুঃখ হয়। যেন খেতে পায় নি কতদিন, চোখের কোল বসা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, হাতের চুড়ি ঢলঢলে, যেন জোর করে ঘরোয়া সাজ পরেছে। অথচ, একটু নজর দিয়ে দেখুন, সব যেন ওত পেতে বসে আছে, বিয়ের বেনারসী পরবার জন্য। আমি জানি ব্যাপারটা কি!'

র—'খুব খাটিয়ে নেয় বুঝি? শুনেছি সকলকেই প্রায় বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হয়?'

বি—'তা, খাটুনি আছে বৈ কি! স্কুলের সেক্রেটারী, সমিতির সভ্য, বড়লোক অভিভাবকদের বাড়ি ধন্নাটাও বাদ যায় না! তবে, টাকা? সেত' মজুররাও পাঠায় বাহাদুরীটা কোথায়?'

র—'কষ্ট আর অপমান দু-ই বেশী লাগে তাদের। ভদ্রঘরের মেয়ে সকলেই।'

বি—'ওটা মস্ত ভুল রমাদি। ভদ্রঘরের মেয়েদেরই অপমান কম লাগে। একবার মজুর-গিন্নিদের দেখো, এক একটি যেন রায়-বাঘিনী! কথায় কথায় স্বামী ত্যাগ!' বলেই বিজন অপ্রস্তুতে পড়ল। কথা ঘোরাবার জন্য খগেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে —'আপনি মেয়েদের রোজগার করা পছন্দ করেন?'

খ—'আমার পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায়? সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সব শ্রেণীর মেয়েদের খেটে ঘরে টাকা আনা দরকার।'

বি—'আলাদা তহবিল থাকলে আত্মসম্মান বজায় থাকে।'

খ—'কেবল তবিল নয়, রোজগার। স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, ওটা প্রারব্ধ নয়। রোজগারিতে কেবল আত্মসম্মানটাই একমাত্র লাভ নয়।'

বি—'তা ঠিক, ঝগড়াঝাঁটি থেকে পরিত্রাণটাও মস্ত জিনিষ।'

র—'তাতে অত ভয় কেন?'

বি—'মেয়েদের ও-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় যত না দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

খ—'সেটা সত্যকারের বিরোধ নয়।'

বি—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ওরা শ্রেণী নয় খগেন বাবু, ওরা ভিন্ন জাতি!'

র—'বিজন তোমার জ্ঞান খুব এগিয়েছে দেখছি। কোথা থেকে শিখলে এত?'

খ—'যতটা পৃথক থাকলে জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হয়, ততটা দূরত্ব বিজন বজায় রেখেছে কি না, তাই।'

বি—'যা বলতে ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু রমাদির মতন মেয়ে ও পারবে না। ঐ ভিন্ন জাতের জন্য, দেখবেন তখন। ওঁর মধ্যে যে বিরোধের বীজ আছে তাতে ফল ধরে না, ধরলেও সেই মাকাল! ফল ধরে কেবল শ্রেণী সংঘর্ষে।' রমলার চিবুক দৃঢ় হল।

খগেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সমঝোতার বিষয়ে বিজন তোমার মত কি?'

বি—'ওটা হবে না আমার বিশ্বাস। তাড়িয়ে দেবার অধিকার মালিকরা কখনও

ছাড়ে! অধিকার জন্মগত নয়, যাদের ভবিষ্যৎ আছে তাদেরই শক্তির জোরে অধিকার আছে, অন্যদের অধিকার স্বার্থরক্ষা। অবশ্য ওস্তাদ ভাবে, অধিকার নিয়ে লড়াই করা বৃথা।' রমলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, 'তবে ত' দেখছি ওস্তাদের মত অগ্রাহ্য করবার সামর্থ ধর!'

বি—'নিশ্চয়ই, কেন ধরব না? ওদের অধিকার থাকলে আমারও আছে খেটে খাবার। দুই অধিকারে লড়াই হোক!'

খ—'দুঃখ এই বিজন, প্রথমটার স্বীকার সরকারের পক্ষে সোজা, দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞান।'

বি—'আমাদের মন্ত্রীপক্ষে এমন লোক আছেন যাঁরা অজ্ঞান নন, তাঁদের আমরা খবর দিয়েছি। তাঁরা এসে পড়লে যাই-বোঝাপড়া হোক না কেন আমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না।'

খ—'সুখবর দিলে বিজন। একটা নিষ্পত্তি হলে রমাদি তোমাকে আরো কাছে পাবেন।'

বি—'তা আর পাচ্ছেন না। অনেক কাজ থাকে যেগুলো বাহাদুরীর নয়, তবু না হলে সব কেঁচে যায়। যেমন ধরুন পাড়ায় পাড়ায় ফাটকে ফাটকে বক্তৃতা, রাত্রে মজুরদের ছেলে পড়ান, রিপোর্টের মালমশলা যোগাড়। ওস্তাদ আপনার নোটের তারিফ করছিল। এই ত চাই! এত লেখা-পড়া শিখলেন, পুঁজি নিয়ে কি হবে? নেমে পড়ুন, বেড়ার ওপর আলগোছে চিরকাল বসে থাকা অচল। বিলেতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে, দিগগজ পণ্ডিত এধারে, অথচ শ্রমিকদলের সভ্য, পার্টির কাজও করছে। আপনি ভাবছেন স্বাধীনতা যাবে, নয়?'

খ—'অনেকটা ঠিক।'

বি—'অনেকটা নয়, পুরোপুরি। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা ঐ ছুতো তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায় ও কতটুকু? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি!'

খ—'সেটা চিন্তারই গলদ। ভয় ভাবনার খাদ সর্ব্বদাই মিশে রয়েছে, সেটা যখন যাবে তখন...'

বি—'তখন খাঁটি সোনাটুকু পড়ে থাকবে, এই বলছেন ত! বেশ, মানলাম যে ভাবের মিশ্রণ সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু ভাবগুলো কোত্থেকে উঠছে? আপনার শ্রেণী-স্বার্থ থেকেই। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তে তাদের অজানিতে বর্ত্তমান বন্দোবস্তর সমর্থন নেই? দোষ দিচ্ছি না, কারণ এই সংস্থানের কৃপাতেই তাঁরা খাচ্ছেন দাচ্ছেন। বুদ্ধিব দিক থেকে এটা বিশুদ্ধ? বড় বড় অর্থনীতির অধ্যাপক প্লানিং-এ বিশ্বাসী নন কেন? কারণ সোজা। প্ল্যানিং হলে তাঁদের হাতে কলমের জায়গায় কাস্তে ও হাতুড়ী আসবে, খাটতে হবে বেশী, আধিপত্য, খাতির সব যাবে ক'মে। ভিকটোরীয়ান যুগে এক স্ত্রীই ছিল ফ্যাশান, অমনি পণ্ডিতরা খুঁজে পেতে দিলেন যে অসভ্য জাতি, এমন কি পশুপক্ষীদের মধ্যেও বহু বিবাহ কখনও কোথাও প্রচলিত নেই, এমন কি এক স্ত্রী-এক স্বামীর সম্বন্ধটি জীবতত্ত্বের প্রাথমিক প্রবৃত্তি। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার দৃষ্টান্ত না হয় ভুলই। স্বাধীন চিন্তা কাদের পক্ষে সম্ভব? যারা ভাল স্কুলে কলেজে পড়েছে, বই কিনতে পেরেছে। কারা তারা? যাদের বাপেব পয়সা আছে। কিন্তু যারা পড়তে পায়নি, স্কুলের খাতা পেনসিল কেনবার যাদের সামর্থ্য নেই, আর বই কেনা যাদের স্বপ্নাতীত, যাদের চাকরী নেই, থাকলেও মাসিক বিশ টাকা, চারধারে বুভুক্ষু আত্মীয়স্বজন, তাদের চিন্তা নেই, সুযোগ নেই, অতএব স্বাধীনতার তাগিদই নেই। আপনি কি তাদের বাদ দিচ্ছেন সমাজ থেকে? তাদেরই যে সংখ্যা বেশী, খগেন বাবু! ধরলাম যে তারা প্রত্যেকে বড় কবি হবে না, তবু চারধারে ষ্টাণ্ডার্ড না উঁচু হলে আপনার চিন্তার স্তরই যে নেমে যাবে! কি রকম জানেন? যেন চারপাশে ঠেল চাই তবে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন, সার্থক হবেন। মাপ করবেন, খগেন বাবু, আমি সুজনদার মত বইটই পড়িনি, ছেলেবেলা টেনিস খেলেছি, মোটর চড়েছি, রমাদির আদর খেয়েছি, কিন্তু কানপুর আমাকে নতুন করেছে, ভেঙ্গে চুরে গড়েছে। ভাবি, আজ যদি ওস্তাদের সঙ্গ না পেতাম,

তবে সাউথ ক্লাবের সভ্য হয়েই জীবনটা কাটত। রমাদি, তোমার কাছে আসা কতদূর নিরাপদ জানি না।'

রমলা এতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক ছিল। বিজনের শেষ কথাগুলিতে তার চমক ভাঙ্গল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ার থেকে উঠে নিজের ঘরের দিকে গেল। যাবার সময় স্বপ্নাবিষ্টের মতন উচ্চারণ করলে, 'বেশ এস না।'

'রাগ হল, রমাদি!'

রমলা ম্লান হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে কি একটা শব্দ হল, চেয়ারটা বোধহয় উল্টে গেছে, বিজন ছুটে ঘরের মধ্যে যাচ্ছিল, পর্দায় রমলার সঙ্গে ধাক্কা খেলে।

খ—'কি পড়ল?'

র—'কিছু না। বসো, বিজন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।' রমলা দাঁড়িয়ে রইল, বিজন বসল।

র—'শুনলাম তোমার কথাবার্তা। অথচ তুমি ষ্টেশনে সেদিন বল্লে, ভালই করেছি। কোনটা ঠিক? আমার সঙ্গতে যদি ক্ষতিই হয়, তবে আমাকে ত্যাগ কোরো। তোমার ওস্তাদ আছে, তাই তুমি পারবে। তোমারও কি ঐ মত? আমাকে তোমরা দুজনে অপমান করছ কেন? আমার দ্বারা যদি সবই অসম্ভব তবে কেন কানপুর এলাম?'

খ—'রমলা, তুমি শোওগে যাও।'

র—'যাব না, বলতে হবে। কি করেছি আমি যাতে বিজন প্রমাণ পেলে যে আমি...ঐ রকম?'

বি—'আমি কিছুই বলিনি, রমাদি। সাধারণভাবে কথা হচ্ছিল, তুমি সামনে ছিলে, তাই তোমার নামটা জুড়ে দিলাম।'

র—'আমার সঙ্গ বিপজ্জনক কেন?'

বি—'মোটেই নয়, ঠাট্টা বোঝনা তুমি। মেয়ে মানুষ, পয়লা নম্বরের। আচ্ছা, আমি এখন যাই। সারাদিন ঘুরেছ, বিশ্রাম নাওগে যাও। কাল যদিসময় পাই আসব।'

র—'আসতে হবে না।' বিজন ধীরে ধীরে চলে গেল। খগেনবাবু নীরবে বসে রইলেন। রমলা ঘরে যাবার পর টেবিলে বসে কাজ সুরু করলেন।

ডিভিডেণ্ড দিয়েছে শতকরা দশ থেকে পনের, বিশ পর্য্যন্ত। মূলধনে আবার মুনাফা জমা হয়েছে, তাই হার কম দেখাচ্ছে। এ-কোম্পানী ও-কোম্পানীর সঙ্গে জোড়া, একটার কম লাভ, হয়ত লাভ নেই, অন্যটার পনের—বোঝা যায় না লাভের গড়পড়তা হার কত। মোটামুটি দশের কম নয় যদি ধরা যায়, তবে পনের টাকা নিম্নতম মজুরী ঠিক করলে উৎপাদন খরচায় জোর আড়াই পারসেণ্ট বাড়বে, তবু থাকে ৭॥০ শতকরা, মন্দ কি? গবর্ণমেণ্ট পেপারগুলোর হার তিন, তার দুগুণ থাকবে তবু। অবশ্য বড় ফ্যাক্টরীগুলো। ছোট ফ্যাক্টরীতে মজুরী আরো কম, সংখ্যাও বেশী নয়। তাদের আপাতত বাদ দিয়ে বড় ফ্যাক্টরীর মজুরী ধরলে বিশেষ ক্ষতি হবে না মনে হয়। প্রেফারেন্স শেয়ারগুলোর বাজার দর অত কেন? নিশ্চয়ই যারা শেয়ার খেলে তারা জানে লাভ রীতিমত হচ্ছে! তারা আট-দশের কম খেলেই না। কেন যে মিলওয়ালারা বলছে পারবে না বোঝা গেল না। তাদের হিসেবে নিশ্চয়ই গলদ আছে। কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। হরেকরকমের কাজ পিছু কত মজুরী তারও পাত্তা নেই। কোনো সিদ্ধান্তে আসা চলে না। সন্দেহ হয় যেন পনের টাকা মজুরী ঠিক হলে লাভের হার শতকরা একটাকা কমবে, যদি অবশ্য উৎপাদনের খরচের অন্যান্য অঙ্গগুলো যা ছিল তাই থাকে। খগেনবাবু পৃষ্ঠা তিনেকের একটা নোট লিখলেন।

ভেতরে যেতে ইচ্ছে হয় না। রমলা হঠাৎ মেজাজ না দেখালেই পারত। বিজন এমন কিছু অপমানসূচক কথা ব্যবহার করেনি যার জন্য রমলা তাকে কটুকথা শোনাতে পারে। তার ধারনা সে জানিয়েছে মাত্র। হয়ত ভুল। বিরোধের বীজকে লালন পালন করানইত ত' মেয়েদের ধর্ম্ম। মাতৃত্বের অর্থই তাই। নতুন বৌ

এসে ভাইএ ভাইএ মনোমালিন্য ঘটায়, তার উদ্দেশ্য নতুন ঘর বাঁধা। অবশ্য তার পর কেবল সেই সংসারকে পাকা করা ছাড়া ;অন্য কিছু কর্ত্তব্য থাকে না, তবু একটা সীন্থেসীস্ হয় ত! বিজন এইটাই বলতে যাচ্ছিল। ছেলে মানুষ, তাই মন্তব্য পরিষ্কার সাজাতে পারে নি। কিন্তু মাথা বেশ পেকেছে এই অল্প বয়সে। এখনও ভাবের ঝোঁক রয়েছে, তা থাক, কিন্তু শিখল কোত্থেকে? ওস্তাদের ওপর ভক্তি অগাধ। তার সঙ্গে মতের পার্থক্য থাকতে পারে এ-সন্দেহটুকুর অস্তিত্ব সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, তাই সেটা ধরিয়ে দিলে চটে। ভক্তির প্রসাদে চিন্তা সরল হয় না কি? নিজের বেলা হয় নি। অবশ্য ভক্তির যুগ তাঁর নিজের জীবনে আসেনি। নিশ্চয় অন্য কারণ। চিন্তার চর্চ্চা না করেই বিজন আসরে নেমেছে। কর্ম্মের আগুনে বুদ্ধি সাফ হয় না, ঝলসে যায় কেবল। কি ভাবে হল কে জানে, তবে বিজন আরেক ধাপে উঠেছে। সেখান থেকে সে কথা কইল এতক্ষণ। বক্তৃতার মক্স···তা হোক। রমলা সে-ধাপে ওঠে নি, তাই গেল চটে। যেন সাবিত্রীরই দিদি, রাগ আর রাগ, মুখ ঝামটা দেওয়া মজ্জাগত। অঙ্গার শতধৌতেন ···মাষ্টারী পারবে না। কিন্তু চাইল কেন করতে? একলা থাকার ভয়ে? কত রকম একাকিত্বই না আছে এই সংসারে! এই নীরবতার মধ্যে আরেক নীরবতা, সহরের নিরর্থক শব্দপ্রবাহতে থেকে মন নিরাগ্রহ হল, একটা ফাঁক এল, মন বসল কবিতা রচনায়, অশরীরী রূপ পেল, অমনি এল আরেকটি অবসর, সেটি পড়লে সহৃদয় পাঠকে, লেখক পাঠকের মিলনে চতুর্দ্দিকে অবকাশের সৃষ্টি হল। কেন, কি ভাবে একান্তিকের এই চীনে বাক্স তৈরী হয় বোঝা যায় না। শূন্য শাঁখে সমুদ্রের ডাক। মিলনের মধ্যেও বাষ্পের পর্দ্দা, সেটা বিকিরণকে রুদ্ধ করে। বুকের মধ্যে মুখ লুকালো রমা, ধুক ধুকুনি শুনলে, তবু একা, নচেৎ, কেন মাষ্টারী করতে চায়! পার্থক্য সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়, তর, তম-তে পৌঁছবার আগেই ভয়ে কম্পন, গেল ছিঁড়ে, গেল ছিঁড়ে। ছিঁড়ে যাবে—বিজন বলছে রমা পারবে না।

নোটটি আবার পড়লেন। ভাষা ভাল হয় নি। ইংরেজীতে তৈরী কথার ছড়াছড়ি, ধরতাই বুলির চোরা-বাজার, সস্তায় যত চাও পাবে। বাংলা ভাষার গুণ ঐখানে। নতুন ধরণের বাংলা গদ্য অবশ্য। পুরানো চালের বাংলা গদ্যে খাদ বেশী। তবে শুনতে ভাল লাগত। খগেন বাবু কাটাকুটি করে নতুন খসড়া লিখলেন। সফীকের পছন্দ হবে কি না কে জানে! সে জমকাল বিশেষণ-বহুল ভাষার পক্ষপাতী নয়। ভাষা হবে কার্পাস্তিয়ারের দেহের মত, এক টুকরো অতিরিক্ত মাংস থাকবে না, চওড়া হাড় নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাংসকে গ্রথিত করবে। রমলা বলবে রক্ত মাংস নেই। তা বলুক গে! কাজের ভাষায়, সব ভাষারই গোড়ায় ও শেষে কাজ, চাই হাড়, শক্ত হাড়। খসড়াটি আবার পড়লেন। সংখ্যায়, দফায় সাজানই ভাল। মন্দ দাঁড়ায়নি…তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তথ্যগুলো ঠিক কি না কে জানে, যদিও বা ঠিক হয়, তবু তর্কে অনেক ফাঁকি রয়ে গেল। সফীক ও করিম চেয়েছে তাই লেখা। সফীকের ভাল লেগেছে বিজন বলছিল, তা মনে হয় না। ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না জানলে জ্ঞান বিবৃতিতেই আটকে যায়। সফীক ঠিক ধরেছে, পণ্ডিতী রচনার দোষই তাই। বিজন একটা আস্ত ছেলেমানুষ, যেমন বিজনের মতে রমা একটা আস্ত মেয়েমানুষ। তবু শ্রদ্ধা বটে! কথায় কথায় ওস্তাদ, নাম উচ্চারণে বাধে, কিন্তু উল্লেখের জন্য উন্মুখ। যেন ওস্তাদের ভাল লাগাটাই শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক। খগেন বাবুর মুখে হাসি ফুটল।

রমলার ঘরের দরজা বন্ধ নয়—নিশ্চয় ভুলে গেছে, স্বেচ্ছায় খুলে রাখবে না, অন্ধকারে রমলার গালে হাত পড়তে রমলা উঠে বসল।

'তুমি এখনও ঘুমোও নি?'

'না। আলো জ্বালো।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'তা হোক, আলো জ্বালো।' খগেন বাবু আলো জ্বাললেন। রমলা বিছানা

ছেড়ে উঠে পড়ল। 'চল, বাইরের ঘরে।' বাইরের ঘরে এলেন। 'ঐখানে বোসো।' খগেন বাবু কোণের ইজিচেয়ারে বসলেন।

'একটা কথার উত্তর দেবে? আমাকে এনে ব্যতিব্যস্ত হয়েছ, নয়? তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়েছি, নয়? আমাকে ঠকিয়ো না, যা ভাবছ আমাকে বল, বিহিত করব।' খগেন বাবু উত্তর দিলেন না। 'তোমাকে আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না, নিজে তোমার সঙ্গে এসেছি, জানি নিজে, অতএব স্মরণ করাতে হবে না। কিন্তু আমাকে না হলে তোমার চলছিল না ভেবেছিলাম, এখন দেখছি বেশ চলে।'

'কেন রমলা এ-সব কথা তুলছ? আর এ-সব মান অভিমানের পালা ভাল লাগে না। তুমি ত' অন্য ধরণের...অন্তত: এই আমার বিশ্বাস। সেটা ভেঙ্গো না।'

'অন্তত:, অন্তত: অন্তত:...বেশ, আমি একটা মাষ্টারি খুঁজে নেবো, বাধা দিও না।'

'পারবে?'

'যে চলে আসতে পারে সে ওটুকুও পারবে।'

'ঐ জন্যেই যদি না পাও' বলেই খগেন বাবু চমকে উঠলেন। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল···কেন বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়···'রমা, চল যাই।'

তাড়াতাড়ি উঠে রমলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। চৈতন্যের অগোচরে বাক্যের সৃষ্টি...কোনটাই বা চৈতন্যের অধীন! কপালে এক্স্-রে যন্ত্র নিয়ে বেড়ান আর মাথায় গল্পের সেই চক্র নিয়ে জীবন্ যাপন একই বস্তু। অন্তরালের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়োজনই বা কি! থাক সেটা ঢাকা, তবেই সুখ বজায় থাকবে— বিশ্লেষণের শেষ বেশ একটা অভিশাপ মাত্র। অন্যায় হল...কিন্তু আসতই একদিন অমন-ধারা যখন রমলার সঙ্গে সম্বন্ধটি মন-ভোলান মাধুর্য্যে আবৃত থাকত না। যেটা সত্যি, তাকে স্পষ্ট দেখাই মঙ্গল, যত সত্বর তার স্বভাব প্রকট হয় ততই মঙ্গল।

মনকে চোখ ঠেরে দিন যাপন নিরর্থক। কাজ করুক রমলা, কে বাধা দিচ্ছে! ঝোঁক কেটে যাবে, শরীর পাত হবে তখন বুঝবে। বুঝেছে বল্লে। ছাই বুঝেছে। দেহের গোলমাল, তাই মাথার মধ্যে পোকা ঘুর ঘুর করে উঠল। সাবিত্রীরও ঐ রকম ছত! সব শেয়ালের এক রা।

খগেন বাবু আবার নোট নিয়ে বসলেন টেবিলের ধারে। ক্ষতি হবে না মিলওয়ালাদের, মুনাফায় এমন টান ধরবে না যাতে তারা মিল বন্ধ করতে বাধা হয়। ধর্ম্মঘটে যা লোকসান হয়, তার বেশী আর কি হবে! তা ছাড়া, মজুরী পনের টাকা ধার্য্য হলে তারা ফুর্ত্তিতে কাজ করবে—পরে লাভ, এখন না হয় টানা-টানি। বেশী মজুরীর গুণ ঐখানে। এতদিন লাভ করেছে মোটা, এখন না হয় একটু কম হোক, সফীক এই বলবে। ঠিকই। চিরটা কাল এক কদমে সংসার চলে না, কখনও লাভের, কখনও ক্ষতির বরাত।

হঠাৎ মনে হয় পুরাতন কক্ষ থেকে চ্যুত হয়ে নতুন কক্ষের আবর্ত্তে ঘুরছেন। মাথায় চক্কর লাগে। কুঁজো থেকে জল নিয়ে রুমাল ভেজান, সেটা মাথায় রাখেন। মাথাঘোরা থামে···অভ্যাস হবে ধীরে ধীরে।

[৫]

"তুমি কি আসতে পারবে—চিঠি লিখছি"—তার পাঠিয়ে রমলা সুজনকে কি লিখবে ভেবে পেলে না। সব কথা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। কলম ধরলেই ভাবনাগুলো ছুটে পালায়। তাদের একটি যদি সুতো থাকত, তবে তার খেই খুঁজে বোনা চলত। এ যে অদ্ভুত সম্বন্ধ, ভালমন্দ তরতমের জট পাকান, খানিকটা অতীত, খানিকটা বর্ত্তমান, এটা ওর ঘাড়ে পড়ছে, কুকুরছানার খেলা যেন। রমলা জানে স্বামীরা কি চায় এবং স্ত্রীরা কি দেয়। খগেন বাবু তার অতিরিক্ত আরো কিছুর প্রত্যাশা রাখেন, অথচ নিজেই জানেন না সেটা কি। স্বামী

পণ্ডত্বের দাবী করেছিল, সে পূরণ করতে পারলে না, তাই চলে এল। ইনিও তার কম কিছু চান নি, কিন্তু মানুষ হিসেবে, প্রাণের প্রাচুর্য্যে, তাই অপমান লাগে নি দৈহিক লেন দেনে, অনিচ্ছার আত্মগ্লানি স্বেচ্ছার গঙ্গাজলে গেল ধুয়ে। কিন্তু প্রাচুর্য্যটাই কাল হল। প্রচণ্ড ক্ষুধার নিবৃত্তির পরও যেন অতৃপ্তি থাকে। উদ্বৃত্তের ছটফটানি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তাও আবার সুজনকে! পরকীয়ার এই পরিণাম, না সব পুরুষেরই এই দশা! চাঞ্চল্য বশ করতে বাইরের কাজ, প্রতিদিন রাত্রে ফেরা, খাবার ঠাণ্ডা, আর প্রতীক্ষা। এই যদি মনে ছিল তবে আপন পায়ে দাঁড়ালেই পারত। সফীক আর শ্রমিক, কাজের বিরাম নেই. ঘুম নেই, ঘুমের মধ্যেও ঐ ভাবনা ঘুরছে। ভূত ছাড়াতে সে সেজেছে, স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছে, নায়িকা হয়েছে, তার চেয়েও নির্লজ্জ ব্যবহারে আপত্তি জানায়নি। কোনো ফল হল না, দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এখন প্রায় স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধে এসে পৌছল। এত কথা কি লেখা যায়, না নিজের কাছেই মুখ ফুটে মানা চলে!

কেমন করে অন্যকে জানাবে, বোঝাবে যে তার ভালবাসা বিফল, তার স্বার্থত্যাগ অস্বীকৃত, তার সব চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে? যারা এখনও বুকের ভিজে পর্দ্দার ও পাশে কাঁপছে তারা কোন সাহসে পর্দ্দা ঠেলে সামনে এসে নাচবে? এ কি জানান যায় যে তার হার হয়েছে, শেকল নিয়ে ঝটপটানিই সার, জোর উস্‌কো-খুস্‌কো পালক খুঁচিয়ে দেহটা তৈলাক্ত করা, যাতে জল যায় ঝরে আর বাইরের লোকে না বোঝে লালমণিটির কি দশা! বাইরের বাঁধন তবু ছেঁড়া যায়, নিজের পরা শেকল বওয়া ছাড়া উপায় নেই যে! কিন্তু আত্মধিক্কারটা উবছে পড়ে, তাড়নায় গরল ওঠে। পুরাণের নীলকণ্ঠ মহাদেব, এ-যুগের নীলকণ্ঠ সতী, নীল দাগ ঢাকবার জন্য মুক্তার সাতনরী। টেবিলের আয়নায় চোখের চারপাশের কালো দাগ দেখা যায়, কণ্ঠা বেরিয়েছে, আঙরাখা কাতর, অসমর্থ, বাহু থেকে বুক ফসকে গেল, পৃথক হল, সুজন ও দেখেছে হাত ছিল দেহের অঙ্গ, একখণ্ড সাদা পাথর থেকে

কাটা। সুজনের বয়স হল কত? এক বয়সী নিশ্চয়, এখনও তার দেহে যৌবনের সামঞ্জস্য অটুট। সু-পুরুষ, সুন্দর নয়, ঝলকায় না তার রূপ বিজনের মত, কিন্তু আভা আছে, সুস্থির প্রদীপশিখা, নিজের রসদ নিজে যোগায়, শান্তি আছে, বিষাদ থেকে তার উত্থান। বিষণ্ণ কেন? বঞ্চিত তাই বিষণ্ণ। কেনই বা একজন চিরজন্ম বঞ্চিত থাকবে, আরেকজন স্বেচ্ছার দান পায়ে ঠেলবে! সুজন আসুক, আর সে ঠকবে না। রমলার মুখ উজ্জ্বল হয়, তাই দেখে লজ্জা আসে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

সফীকের না হয় হৃদয় ব্যাকুল হোক কুলীদের জন্যে, কিন্তু বিজনের ব্যাকুলতা নিরর্থক। কখনও সে গরীবদের ঘর দোর পর্য্যন্ত দেখেনি। তার কল্পনার দৌড়ও এত বেশী নয় যে তাতে অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ হয়। আর উনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সফীকের সঙ্গে কাটাচ্ছেন তারও মূলে না আছে প্রত্যক্ষ অনুভব, না আছে সুদূর দৃষ্টি। এ কেমন দৃষ্টি যেটা সামনের জিনিষ এড়িয়ে চলে! বরঞ্চ সে দৃষ্টি, সে অনুভূতি, সে কল্পনা আছে সুজনের। পরের বাড়ি মানুষ হয়েছে, বিজনের বাবা বড়লোক, তিনি সমান ভাবে রেখেছেন দুজনকে, তবু এই অপক্ষপাত সুজনকে ভোলাতে পারে নি, ভদ্র ভাবে সে তাকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু স্বার্থে প্রয়োগ করে নি, সহজে পরের উপকারে এসেছে, আচরণে আড়ষ্টতার প্রমাণ দেয় নি, তাই তার স্বভাব সুমিষ্ট হয়েছে। একটু হয়ত মেয়েলী, মুখের হাসিটা অত নম্র পুরুষের হয় না। কেন সে সর্ব্বদা পিছিয়ে থাকে; কেন এগিয়ে এসে নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠিত করে না? আপন অধিকার কেড়ে নেয় না? এক সময় রমলা নিজেই অমনোযোগী ছিল, তাকে হয়ত নিজেই মনের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। 'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল...' এই লাইনটা ঘুরে ফিরে কেবলই আসে... পরিচিত...কখন প্রথম আসে রমলা মনে করতে যায়, মনে পড়ে না। এবার জেগে থাকবে, তন্দ্রা আসতে দেবে না। এবার এলে সে সব পাবে...মুছাব পা আকুল কেশে...

সরম আসে...কেন সে আবার নিজেকে দেবে? সেই কোন যুগ থেকে মেয়েমানুষ দিয়েই এল; লোভ দেখিয়ে, আদর করে, কখনও খোকা সেজে, কখনও যাত্রার বীরের পোষাক পরে ওরা খাজনা নিয়েই গেল, মেয়েদের আপত্তি নেই, উল্টে কৃতকৃতার্থ, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি, ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, যেন তাদের প্রাপ্য, তারপর হতশ্রদ্ধা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে থাকা, কিনা কাজ, ছাই কাজ, কাজের মুখে আগুন, মিথ্যার সম্ভার, নচেৎ শ্রমিকদের জন্য হৃদয় বিগলিত, আর ঘরের মধ্যে একজন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ধন্নাই দিয়ে যাচ্ছে, তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা কিছুই নেই, কিছুই থাকবে না, থাকা উচিত নয়, থাকা পাপ। এ-অত্যাচর অনাদি অনন্ত ওতঃপ্রোত। কবি বলেন এই মেয়েদের স্বভাব, তাই পা মোছান চাই, বাঙালী বলে বাঙালী মেয়ের মিষ্টতা, তাই প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হবে। কিন্তু স্বভাব নয়, সংস্কার, যার দম ফুরিয়েছে বহুকাল। রমলা বিছানা থেকে উঠে কলম নিয়ে বসে।

'সুজন, তোমার শেষ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। অবশ্য ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমিও প্রত্যাশা কর নি। উপদেশের একমাত্র উত্তর, পালন······'

উপদেশ দিয়েছিল, কোথায় গেল চিটিটা? রাগের বশে নিশ্চয় সেটা ছিঁড়ে ফেলেছে, কিন্তু উপদেশ ছাড়া আরো কিছু ছিল প্যাঁচালো ভাষায়, যার অর্থ আবিষ্কৃত হল...সুজন তাকে প্রেম নিবেদন করেছে...তাই আপদ দূর হল, পাছে··· কাঁটার মতন সেটা সর্ব্বাঙ্গে চরে বেড়ায় ..তবু বুঝলে না। রমলা হঠাৎ উঠে হাত-বাক্স খুলে ঘাঁটতে থাকে...এই যে চিঠিটা রয়েছে...হাতের লেখা সুন্দর শান্ত, মিষ্টি —লিখেছে...

"আশা করি এতদিনে তোমার একাকিত্বের অবসান হবে। অথচ, পরাশ্রয় আমার অগোচর নয়। তবু আমি তোমার জন্য খুশী। তোমার সাধনায় তুমি ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করেছ, খগেন বাবুরও 'পুরুষ সিদ্ধি' নিষ্ফল হয়নি আমার ধারণা। দুজনেই মানুষ না হলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ শেকলই থেকে যায়! তুমি নিজের

জোরে আপন অধিকার বিস্তার করেছ, তার সামনে বাধা বিপত্তি স্থায়ী হবে না। এমন কি আমরাও সেখানে অবান্তর। অবান্তরের স্থান নেই যখন সে বুঝতে পারে তখন সে 'বোকা'। তুমি যখন আমাকে 'বোকা ছেলে' বলেছিলে তখন আমি ঠিকই বুঝেছিলাম অর্থাৎ তোমাদের জীবনপথে আমি অনাবশ্যক। কষ্ট হয়েছিল বলতে এখন লজ্জা নেই, কারণ তার জন্য অর্থ পেতে প্রাণ ব্যাকল হয়, ক্ষণিকের জন্য। আজ আমার কষ্ট নেই। বিজনের এখন আপন মতামত হয়েছে, সেই অনুসারে সে কাজ করছে। তাতে কি আমার দুঃখ হওয়া উচিত?"

"কেবল একটা কথা মনে ওঠে। যদি নতুন কর্ম্মপ্রবাহে জীবন চালাতে পার তবেই সার্থক হবে—অবশ্য সেখানে তোমার কাজ নেতিমূলক। যে এতদিন একলা থাকতে পেরেছে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

"তোমরা কোথায় থাকবে যদি জানতে পারি, এবং তোমাদের এখান থেকে বই কি অন্য কোনো জিনিষ পাঠাবার যদি দরকার হয় তবে আমাকে লিখো। অন্য কোনো প্রয়োজন হয়ত উঠবে না, যদি ওঠে, তবে সঙ্কোচ যেন না হয়।"

'বোকা ছেলে'...মনে পড়ে সেই রাতে অক্ষয় বাবুর বাড়িতে' সুজনের ঘর, সুজন বিছানায়, আরাম কেদারায় নিজের সারারাত কাটল, সুজন মড়ার মতন শুয়ে রইল। অবান্তর ব'লে বোকা নয়, মোটেই নয়, না বোঝবার ক্ষমতা অসীম। কী আশ্চর্য্য। কোনো পুরুষের মাথায় কি এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই!

'উপদেশের একমাত্র উত্তর পালন' নতুন কর্ম্ম প্রবাহে জীবন বহান .শুনতে বেশ, গালভরা কথা। এর নাম কর্ম্মপ্রবাহ! কার কর্ম্ম! যার কেউ নেই সে শ্রমিক আন্দোলন করুকগে···সফীকের মা নেই বাপ নেই নিশ্চয়, নচেৎ ভাওয়ালী পাঠাতে হয়! বাপে তাড়ান মায়ে খেদান ছেলেরাই এই হুজুকে মাতবে···জোর করে প্রেম হয় না...যার কর্ম্ম তার সাজে অন্যের লাঠি বাজে। সুজন এ-ধরনের উপদেশ কিছুতেই দেয় নি...সে বলতে চেয়েছে, পুরানো ইতিহাস ভুলে নতুন অধ্যায় খোলো...ও যত পড়ে পড়ুক, লিখুক, কে বাধা দিচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত বইয়ের পাতায় চোখ সেঁটে থাক...কে মানা করছে ..কিন্তু এ-সব কি! সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-চর্চ্চা খুইয়ে তর্ক, আর মজুরদের জন্য নোট লেখা! একে 'কালচার' বলে না। কথায় কথায় 'ইতিহাস' কপচান···অথচ কোথায় ইতিহাসের বই তার পাত্তা নেই। নীল মলাটের লম্বা লম্বা বই, সংখ্যায় ভরা, ছাপা বাঁধাই যাচ্ছে তাই, তাই হল খোরাক! কেমন করে তাদের দৌত্যে দুটি প্রাণী এক হয়! 'নেতিমূলক', অর্থাৎ খাবার টেবিল সাজান, আর তার পাশে চুপ করে বসে থাকা, তাও নিমন্ত্রণের নাম নেই, একজন ভদ্রলোককে খেতে বলা হয় নি এতদিনে, সহরে কি ভদ্রলোক নেই, এলেও তাদের এই সরঞ্জামে কষ্ট হবে, সফীকের এই যথেষ্ট, বিজন এইতেই খুশী...নেতিমূলক···অর্থাৎ খগেন বাবুকে আরাম দাও যত পার, আর তার চোখে স্বার্থের ছানি পড়তে থাকুক! কি চমৎকার বন্দোবস্ত! এ অচল ···সুজন বোঝে না চিঠিতে বোঝান যায় না, সে চলে আসুক...ও আপত্তি করবে না, ওর সুবিধা হবে, সুজন আর বিজনের হাতে সমর্পণ ক'রে সে সফীকের জন্য নোট লিখবে, তার সঙ্গে রাত বারটা পর্য্যন্ত আড্ডা জমাবে। রমলা নতুন চিঠির কাগজে আবার লিখতে সুরু করল।

'সুজন, নিশ্চয়ই তুমি আমার তার পেয়েছ। তোমাকে পেলে আমরা সকলেই খুশী হব। কানপুরের মতন সহরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু সেই জন্যই তাদের প্রয়োজন বেশী। বিজন ও সেই সঙ্গে এরাও 'নতুন কর্ম্ম প্রবাহে' অবগাহন করছেন। যে-ফ্ল্যাটে আছি সেটা মোটেই ভাল নয়। শীঘ্রই অন্য বাড়ীতে উঠে গেলে সব দিক থেকে সুবিধে। আমাকে তুমি বিশ্বাসে ধন্য করেছ, তাই বলছি যে তুমি 'অবান্তর' নও। কবে আসবে পত্রপাঠ জানিও।

ইতি—রমলা'

রমলা চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে বসবার ঘরে এসে একটা ক্যান্ভ্যাসের চেয়ারে বসল। হাতে পশম আর কাঠি। সোফায় একটা বই পড়ে আছে, নামটা পড়া যায় না। তার চোখ খারাপ হল না কি? চশমা পরলে কেমন দেখাবে?

কালো ডাঁটির চশমা পরুক মার্কিন মেয়েরা, যারা জিনিসপত্র বেচে বেড়ায়, পাদ্রীগিরি করে, আর পরুকগে রুশ মেয়েরা, যারা চুল ছেঁটে, চামড়ার খাপে কেতাব আর কাগজ পুরে গ্রামে আর সহরে কম্যুনিজমের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। প্যাঁসনে-র কাল গেছে। ফ্রেম্ না থাকাই ভাল—না হয়, হোয়াইট গোল্ড। রমলা সোফার কাছে যেতে অক্ষরগুলো স্পষ্টতর হয় না। তবে কি চালশে ধরেছে? না, চশমা এক প্রকার গয়না, কখনও গহনার ওপর তার মোহ ছিল না, এই বয়সে আর শোভা পায় না। রমলা বইটা তুলে নিয়ে দেখলেন অর্থনীতি, মেয়েদের শেখবার অযোগ্য, যাদের সর্ব্বদা টাকা-আনা-কড়া-ক্রান্তির হিসেব রাখতে হয় তাদের পক্ষে অর্থনীতির মূল্য নেই।

বাড়িতে একটা নভেল কি গল্পের বই নেই যে সময় কাটান যায়। পুরুষের আগ্রহে স্ত্রী ভাল রাখবে কেন? স্ত্রীর যখন সন্তান সম্ভাবনা হয় তখন ত পুরুষে নতুন অতিথির সম্বর্দ্ধনায় কালক্ষেপ করে না···প্রথমটা ভয় পায়, ভয় ছাড়া কি? খগেন বাবুকে যেদিন সে সন্দেহ—মাত্র সন্দেহটুকু জানালে তখন তাঁর চোখের তারা ভয়ে নিশ্চল হয়েছিল; ভয় নিশ্চয়, এ আবার কে এল ভাগ বসাতে সম্পত্তিতে, আরামে, দাসীগিরিতে; কেবল অজানার ভয় নয়, এক লাইনে রেলগাড়ি বেশ চলছিল, অন্য লাইনে কেন যাবে, কেন ধাক্কা খাবে সহজ জীবনটা? ওরা বলে 'এক্স্‌প্লয়টেশন' চলছে, কিন্তু গোড়ার পাপ ঐখানে। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধেই তার প্রকাশ, চরম বিকাশ, তার বাইরে যেতে হয় না, কলকারখানায়।

হাঁ, যদি পুরুষে কবি হয়, গল্প কি নভেল লেখে তবে স্ত্রীজাতি সাহায্য দিতে পারে, কারণ তারা জানে ব্যাপারটা কি! বৈজ্ঞানিক স্বামীর বৈজ্ঞানিক স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ···কুরী আর মাদাম কুরীর তুলনা কোথায়! জোর মেয়েরা টাইপ করবে, স্লাইড ধোবে আর স্বামীর বক্তৃতার সময় সামনের বেঞ্চে বসে থাকবে। যে পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে ব্যস্ত তাদের স্ত্রীদের কর্ত্তব্য কেবল খাবার টেবিলের পাশে অপেক্ষা করা। এর বেশী আর কিছু নয়। মেয়েরা শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে।

কিন্তু সময় কাটে না। সুজন এলে খানিকটা সময় কাটবে। ততদিন কি কাজ নেওয়া যায়? নিজের খেয়ালে বই পড়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভাল লাগে না। কখনও খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। কন্‌ভেন্টের শিক্ষাপদ্ধতিতে বাড়িতে পড়বার সুযোগ নেই, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্কুল, আর খিল-খিল হাসি বেণী দুলিয়ে, সেই মেয়েতে মেয়েতে ভালবাসা, না হয় মাষ্টারনীর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। সিষ্টার সিসীলিয়ার কথা মনে পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, হিন্দু দর্শনের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাই ভারতবর্ষে আসে, গুজোব উঠল সে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করবে। নীহার এসে বল্লে, মিথ্যে কথা, হিঁদু ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, তাই ছুতো করে চলে যাচ্ছে। মুখটা মিষ্টি ছিল, কি নীল চোখ, সোনালি চুল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত, বাপের জমিদারীতে ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে শেয়াল মারতে গিয়ে পড়ে যায়। নীহারটা কেবল নিন্দে করত, তবু, মন ছিল তার সরল, যা মনে আসত তাই বলে ফেলত গল্‌ গল্‌ করে। মাদার সুপিরিয়ার বলেছিলেন, কথার আমাশায় ভোগে নীহার···কোথায় আছে কে জানে! একবার একটা গল্প বেরোয় তার নামে...কনভেন্টের কথা ছিল, নিশ্চয়ই নীহার···আর কে অমন কুৎসা রটাতে পারে!

খগেন বাবুর সঙ্গে বিজন এসেই রমলাকে চা দিতে অনুরোধ করলে। কুরুশ-কাটি আর পশমের গোলা গুছিয়ে রেখে রমলা ভেতরে গেল। বিজন স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুলো। যখন বেরিয়ে এল তখন তার চেহারা ভিন্ন, চুল 'ব্যাক-ব্রাশ' করা, ফরসা জামা ও প্যান্তালুন, পায়ে কাবলী চটি।

'রমাদি ভাগ্যিস এখানে জামা কাপড় রাখতে বলেছিল! আঃ বাঁচলাম! আপনিও একবার স্নান করে আসুন, আরাম পাবেন।' খগেন বাবু উঠলেন না। বয় চাএর ট্রে আনল, সঙ্গে পেষ্ট্রি। হাত পা না ধুয়েই খগেন বাবু পেষ্ট্রি তুলে নিলেন।

'সত্যি বলছি, খগেন বাবু, ওস্তাদকে বুঝি না, দেখলেন ত' ব্যাপারটা ! অমন সুবিধা কেউ ছেড়ে দেয় ? মার্ক্স নিজে বলেছেন যে বিরোধের কাছে সব পদ্ধতিই সমান, কোনোটা বড় আর কোনোটা হেয় নয়।'

ব্যাপারটা এই : একজন কর্ম্মী এসে সফীককে খবর দেয় যে একটা ফ্যাক্টরীতে যার মালিক মজুরদের পুরী হালুয়া কাবাবের লোভ দেখিয়ে, ফাটকের মধ্যে শোবার বন্দোবস্ত ক'রে কাজ চালাচ্ছিল, সেই ফ্যাক্টরীর একজন মজুর অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অসহ্য গরম থাকাতে ধ্যানে বসেছে, যতক্ষণ না বৃষ্টি পড়ে ততদিন সে উপবাসে থাকবে। অনেক লোকজন জমায়েত হচ্ছে দেখে কর্ত্তৃপক্ষ দু'মিনিট আগেই দুপুরের ছুটি দেয় সীফ্‌টের বাঁশি বাজিয়ে। ফ্যাক্টরীর মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য, রীতিমত কাজ হচ্ছে না। গোলমালের ভয়ে ওরা রাতে তাকে ভাগাতে পারেনি, সঙ্গে অনেক লোক ছিল। সাহেবরা ভয় দেখায়, কিন্তু লোকটা কথাই কয় না। পরের দিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ! মজুররা 'বাবা' 'বাবা' করছে, চড়াই দিচ্ছে, মালিকরা ভীষণ গোলমালে পড়েছে। বৃষ্টি যদি না পড়ে আর মেঘ যদি উড়ে যায়, তবে কাজ বন্ধ থাকবে। কলের সাহেব বলেছে যে সন্ধ্যার আগে যদি লোকটা সরে না যায় তবে পুলিশের হাতে দেবে। ইতিমধ্যে ফাটকের বাহিরে সিপাহি এসে হাজির, মজুররা ক্ষেপে উঠেছে। ঘটনা শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়। বিজন বলে ভগবানের না হোক ইতিহাসের আশীর্ব্বাদ এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা যেকালে উচিত নয় তখন শীঘ্রই ব্যাপারটাকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াই সঙ্গত। খগেন বাবুরও তাই মত, কারণ বিবাদ যখন চলছে, এবং হরতাল যখন অসম্পূর্ণ তখন সুযোগটা গ্রহণ করাই ভাল। করিম নীরবে ছিল। সফীকের কোনো আগ্রহ না দেখে বিজন একটু হতাশ হয়। যেন কিছুই নয় ভাবটা, নিতান্ত হালকা ভাবে খগেন বাবুকে অনুরোধ জানায় হরতালীদের নাম-ধামের সূচীপত্র তৈরী আর চাঁদা খরচের হিসাবের ভার নিতে। খগেনবাবু সফীককে অবশ্য বলেছিলেন, 'বিজনের কথাটা ফেলবার নয়।' কিন্তু

সফীক উত্তর না দিয়ে কেবল করিমকে দেখিয়ে দিলে। করিম ইতস্তত করছিল। খগেন বাবুর সোজা প্রশ্নের উত্তরে সে সোজা উত্তর দিলে, 'হিন্দু বাবাজীর পিছুপিছু ফকীর সাহেবও আসবেন, তখন ওদেরই লাভ, হিন্দুমুসলমানদের দাঙ্গা বাধবে, পুলিশ ঢুকবে সব কলের মধ্যে।'

এই উত্তর বিজনের মনঃপূত হয় নি। লড়াইএর সময় বাচবিচার অচল, দাঙ্গার ভয়ে বিরোধ বন্ধ রাখা অনুচিত প্রভৃতি যুক্তি দেবার সময় সফীকের মুখে হাসি ফোটে। সেই দিনই সন্ধ্যায় দু' ফোঁটা বৃষ্টি হয়, 'বাবা' মহারাজ হয়েছেন, ফাটকের বাইরে যাগযজ্ঞ ক'রে একটা ডেরা তুলেছেন। ইতিমধ্যে একটা বেশী মাইনের চাকরী খালি হয়েছে, পদোন্নতিতে মহারাজের এইবার বোধ হয় ধ্যানভঙ্গ হবে।

চা খেতে খেতে বিজন বল্লে, 'আপনি জানেন যে ওস্তাদকে আমি কত শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কখন যে কি ক'রে বসে তার হদীস পাই না।'

খ – 'এক হিসেবে সমর্থন দিতে পারি। দাঙ্গা বাধত, এবং সেটায় হরতালের ক্ষতি হত। করিমেরও তাই মত।'

বি—'বলতে বাধে, কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ভুল ঠাওরাবেন না, করিম, সফীক মুসলমান ব'লে বোধ হয়, ঠিক এই সব হিঁদুয়ানী পছন্দ করে না। তাদের কোনো গোঁড়ামি নেই, বুদ্ধিতে, কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়!

খগেন বাবু কঠোর ভাবে চাইতে বিজন উত্তেজিত হয়ে বল্লে, 'পজিটিভ ভাবে মোটেই নয়, কখনই নয়, কিন্তু যদি তাদের কার্য্যকলাপ দেখে কেউ ঐ ব্যাখ্যা দাখিল করে তবে তাকে দোষী ভাবা যায় না। কেনই বা আমাদের এমন আচরণ হবে যে সম্বন্ধে ভুল ভাবা সম্ভব! আমাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যদি কারুর কখনও সন্দেহ ওঠে তবে আমাদেরই সর্ব্বনাশ! তাছাড়া, কার্ল-মার্কস্, লেনিন ঠিক বিপরীত উপদেশ দিয়েছেন, সেদিন একটা বইএ দেখছিলাম।'

খ—'তাঁরা হিন্দু মুসলমান সমস্যার ধার ধারতেন না। ঘটনাটা বড়, না মতামত

বড়। এই ধরণের পবিত্র, শুদ্ধ মার্ক্সিজম-কে মার্ক্স ও লেনিন উভয়েই আচ্ছা করে ঠুকেছেন জান না?'

বি—'কিন্তু লোকে ভুলই বা বুঝবে কেন?'

খ—'তারা কারা?'

বি—'অনেকে, আপনি জানেন না। এই ধরুন, ওস্তাদ মধ্যে মধ্যে একেবারে ডুব দেয়, কোথায় গায়েব হয় কেউ জানে না। নানা লোকে তাই নিয়ে কাণাঘুষা করে—কারুর মতে, ওস্তাদ তখন শুষ্ক কর্ম্মে বিতৃষ্ণা হয়ে রূপচর্চ্চায় মগ্ন থাকে, কেউ ভাবে, যেমন আমি, ঐ ফাঁকে ওস্তাদ ভাল ভাল বই পড়ে। সত্যি কথাটা কি তাকে একবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেমন যেন অবহেলার হাসি, 'হু কেয়ার্স' ভাব!'

বিজনের স্বরে, তার প্রতিবাদে, আলোচনায়, অনুযোগে অভিমানেরই রেশ রয়েছে। অবিশেষ বিরোধের মধ্যে সে ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধের অবিচল কেন্দ্র চায়। সফীক এই চাহিদার প্রশ্রয় দেয় না। সফীক-বিজনের সম্পর্ককে অমানুষিক বলা যায় না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা নিবিড়তার প্রতিকূল। জড়ের কাঠিন্যের অপেক্ষা বায়ব শূন্যতা মানবিক প্রসারকে দমন করবার শক্তি রাখে...জড়ের আঁশ অনুসারে যন্ত্র চালালে তাকে বশে আনা সম্ভব, কিন্তু পঞ্চ ক্রোশের উর্দ্ধে ঈথরের চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা খামখেয়াল, কোনো বৈজ্ঞানিক তার নিয়ম কানুন ধরতে পারলে না, পাইলটরা তাকে বশে আনতে অপারক হল। কন্‌কনে পাগলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। সফীক স্নেহহীন নয়, কিন্তু তাকে স্নেহশীল আখ্যা দিতেও বাধে। মেয়েরাও খামখেয়ালী, প্রহেলিকা, কারুর ভাঁড়ার খালি তাই, কেউ বা দিয়ে ফিরিয়ে নেয়, সম্পর্কের স্থিরতা ও সাতত্য রাখে না, যেমন রমলা। কিন্তু সফীক যে মর্ম্মে জীবন চালায় তার তর্ক-পদ্ধতি ভাব-রহিত, যুক্তি-বুদ্ধিবিবর্জ্জিত। খগেন বাবু বিজনকে বল্লেন।

'সফীক ডায়েলেক্‌টিকস্ ধরেছে।'

বি—'তা হয়ত ধরেছে, কিন্তু তাই বলে কোনো যুক্তি মানবে না, ব্যবহারে কোথাও নরম হবে না!'

খ—'আমি অবশ্য তাকে বেশী চিনি না, কিন্তু একটা দিক থেকে তার আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব।'

'ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা, কেবল ব্যাখ্যায় বুক গেছে শুকিয়ে, হৃদযন্ত্র বন্ধ, খুলির সামনেকার ঢিবি বেড়েই চলেছে, এইবার শিঙ্ বেরুবে, তার পর দাড়ি গজাবে, দেখাবে মজার ভেবে রমলা হাসল। হাসি চোখে পড়তে খগেন বাবু অসোয়াস্তি বোধ করলেন, ব্যাখ্যার খেই গেল হারিয়ে, খুঁজতে গিয়ে একেবারে গোড়ার কথা ধরলেন।

'ব্যাপারটা এই ঃ তুমি···কোনো কিছুকে, ধর, সম্বন্ধকে স্থির ভাব, না বদলাচ্ছে ভাব? সুবিধের জন্য স্থির ভাবতেই হয়, কিন্তু সুবিধার ফাঁকে সত্যবস্তুটা ফসকে যায়।'

'যাই বলুন না, একটা খোঁটা চাই।'

'খোঁটা অবশ্য লোকে চায়, কিন্তু কি ধরণের? জড়বাদীরও খোঁটা আছে আদর্শবাদীদের মতন।'

'জানি, তবু চাই, সেটা ধরুন, প্রগতিতে বিশ্বাস, মানুষকে ভালবাসা।'

'প্রগতি এবং ভালবাসা—একত্রে? কি বলছ, বিজন! তোমাদের প্রগতি মানে নিশ্চয় সেই পুরানো উন্নতিবাদ নয়, আর মানব-প্রেম, সে ত' য়ুটোপীয়ান সোশিয়ালিজম!'

'আমি বলছি ইতিহাসের নিয়ম-কানুন।'

'আমি যদি বলি সফীক সেটা বুঝেছে, কেবল মাথা দিয়ে নয়, হৃদয়ঙ্গম করেছে, তবে তোমার আপত্তি টেঁকে না। তোমরা ইতিহাসের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছ, রক্ত বেরুচ্ছে, সকলে আহা করছে, মহিলারা বিশেষতঃ, রমাদিও, আর ভাবছ এক একজন মার্টার!'

বি—'রমাদিকে কেন আবার ! রমাদি একটা মজা দেখেছ, খগেন বাবু তর্কে তোমাকে না নিয়ে এসে থাকতে পারেন না ? তুমি তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছ ...আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক...উনি মুখ ফুটে স্বীকার করবেন না, কিন্তু ওঁর সকল চিন্তায়, সকল কর্ম্মে আছ তুমি। ওঁর বুদ্ধির চর্চ্চা একার নয়। সত্যকারের প্রেরণা তুমি দিয়েছ ওঁকে, রমাদি।'

খগেন বাবু হাসলেন না দেখে বিজন রমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'রমাদি তোমার মত কি ?

রমলা বল্লে, 'অমন সুবিধে ছাড়তে আছে !'

খগেন বাবু কেবল চাইলেন রমলার দিকে—তার মুখ হঠাৎ যেন সুন্দর হয়ে উঠল তারা দুটো চোখের কোণে গেছে, চক্ চক্ করছে, বাঁ হাত থুৎনীতে, ক'ড়ে আঙ্গুল দাঁতে, হাতের রেশমী রোঁয়ায় চুড়ির সোনালি আভা, গ্রীবা বাঁকা, এলো খোঁপা কাঁধে লুটিয়েছে। খগেন বাবু দেখছেন বুঝতে পেরে রমলার মুখ কঠিন হল। 'বিজন, পেট্রি কেমন হয়েছে ?'

বি—'চমৎকার। মেয়েদের বুদ্ধিতে যা আসে তা আমাদের মাথায় আসে না।'

র—'সব পুরুষদের অবশ্য নয়। আমরাই ও-সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।'

বিজন জোরে হেসে উঠল। 'কেমন মানতে হল ত !' খগেন বাবু ঘর থেকে উঠে গেলেন।

রমলা বিজনকে বল্লে, 'তোমাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে। আজ তুমি আর ক্লাবে যেও না, মেয়েদের বড়ই দুরবস্থা হবে—আমারও হিংসে হবে।'

বি—'ঘ্যাখ, রমাদি, ঐ ধরণের ঠাট্টা আমাকে কোরো না। কানপুরে এসে আমি পাকিয়ে গেছি জানি, তাই বলে...তা ছাড়া, আমাকে নিয়ে তোমার রসিকতা শোভা পায় না—সে বরং সুজনদার প্রাপ্য।'

র—'আজ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে ? কতদিন তোমার টেনিস খেলা

দেখি নি, গলা খোলা শার্ট, দুধের মতন শাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, আর এমারেল্ডের মত ঘাস, ঘন নীল পর্দা...বিজন বাবুর ঘন কালো চুল, হাতের পেশীতে ঢেউ খেলছে, ব্যাক্ হ্যাণ্ডের মার, বল তীরের মতন, ফিঙের মতন লাল নেটের কালো টেপ্ ছুঁয়ে গেল, পড়ল গিয়ে ডান দিকের চূণের দাগের... বাইরে।

বি—'না, রমাদি, বাইরে নয়, লাইনের ওপর। যাক্‌গে ও-সব কথা। তুমি ক্লাবেই ভর্ত্তি হও, মাষ্টারি তোমার ভাল লাগবে না। একলা থাক জানি, মন আমার খারাপ হয়...কি জানি, তোমরা কি করলে! যাই হোক... সুজনদাও যদি থাকত। মানুষ সামাজিক জীব—কথাটা সোশিয়ালিষ্টদের মানতেই হয়।'

র—'মানো মানো, তুমি? তবু ভাল।' রমলার মুখে সামান্য যেটুকু উত্তেজনার চিহ্ন ফোটে সেটা মুছে যায় ঘন স্থূল সুনিশ্চিত কণ্ঠস্বরে। একটু কাসতে গলার ঘড়ঘড়ানি কেটে গেল। বিজন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্লে, 'তুমি যদি ক্লাবে যেতে না চাও, তবে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও আছে, ঐ সব মজুরদের ছেলে মেয়েদের জামাটামা দেওয়া, লেখাপড়া শেখান, এই সব আর কি! তবে...'

র—'তবে কি? নতুন আপত্তি মনে উঠল বুঝি?'

বি—'ওটা মালিকরা খাড়া করেছে কি না, তাই—'

র—'অর্থাৎ ওস্তাদ পছন্দ করবে না, তাই বিজন বাবুর পছন্দ নয়। বিজন বাবু চান না যে তাঁর কোনো আত্মীয়া ওদের কোনো অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন, বিজন বাবুর দলের কাছে, তাঁর হীরোর কাছে সম্মান যাবে কেমন?'

বি—'মোটেই না। ওস্তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা হস্তক্ষেপ করি না, কেনই বা সে আমাদের বেলা করবে?'

র—'একটু তফাৎ এই যে তোমার প্রাইভেট কিছু নেই, এবং তাঁর প্রাইভেট অনেক কিছুই আছে।

বি—'ওয়েলফেয়ার সমিতিতেও যোগদান আমার মনোমত নয়। যত সব বুর্জ্জোয়া মেয়েরা মোটর চড়ে মধ্যে মধ্যে চামানগঞ্জ, জরীব-কি-তলাও-এর ধোঁয়া ও ধুলো খেতে যান, আত্মপ্রসন্ন হয়ে ফিরে আসেন, স্বামীদেরও আত্মগ্লানি কমে, গর্ব্ব বৃদ্ধি হয়, তাঁরাও বলতে পারেন…'

র—'থাক, আর বুদ্ধি দেখাতে হবে না। ও আমি পারব, কি করতে হয়?'

বি—'আগে ভেবে দেখ। মোটর না হলে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে খাতির নেই।'

র—'টঙ্গাতেই চালাব, তারপর যা হয় হবে। কাল সভ্য হবার ফর্ম্ম আনবে?'

বি—'অমনি ক্ষেপে উঠলে! আগে জিজ্ঞেস-পত্র করি, তুমিও খগেন বাবুকে একবার বলে কয়ে ঠিক কর…'

র—'তুমি কাল খবর দেবে কি না—সোজা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

বি—'দেবো। কিন্তু পারবে না। তার চেয়ে মিক্স্‌ড্‌ ক্লাব ঢের ভাল। সব চেয়ে ভাল হয় যদি সুজনদা এসে পড়ে। সুজনদা, তাকে কতদিন দেখি নি… যাকগে…আমার আবার কাজ পড়েছে, এখনই যেতে হবে। আরেকদিন তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যাব, রমাদি কেমন? রাগ করলে না ত? ভাল কথা, রমাদি, একটা চমৎকার বাড়ি দেখেছি, সামনে ফুলের বাগান, একেবারে নতুন ডিজাইনের…কী বলব৳ যেন ছবি!'

র—'খুব বেশী ভাড়া?'

বি—'তা জানি না, তবে আমি বাড়িওয়ালার ছেলেকে জানি, ক্লাবের আলাপী।

বোধ হয় লীজ চাইবে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করব'খন। তবে কোলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা।'

(৬)

বিজন চলে যাবার পর খগেন বাবু ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসলেন। রমলা পশম বোনার কাটি তুলে খগেন বাবুর মুখের দিকের স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মাথার পিছনটা চ্যাপ্টা বেশী, যা বোধ হয় সরষের বালিশে না শুইয়ে তুলোর তাকিয়ায় শুইয়েছিল, মাসীমাও নজর দেয় নি, নাক লম্বা কিন্তু ডগা ভোতা, টিপে ঠিক করা যেত,. ঘাড়ে রোঁয়া এত গজায় কেন, চোয়াল চওড়া, ঠোঁট একটু ঝুলে পড়েছে, দুর্ব্বল, দুর্ব্বল নিতান্ত, চেষ্টাকৃত কাঠিন্য, তাই গোঁড়ামিই প্রকট হয়, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের নীতি দ্বিতীয় ভাগে কৃত্রিম ভাষায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। নতুন মানুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। সফীক হল আদর্শ, প্রগতিতে বিশ্বাস হল ধর্ম্ম! ঝুঁকি মানুষ, একরোখা লোক, তবু দুর্ব্বল, কারণ পারম্পর্য্যবিহীন, যত দুর্ব্বল তত পরিণতির অনিবার্য্যতায় বিশ্বাসী! তার চেয়ে সুজনের মাথা অনেক ঠাণ্ডা, দোরোখা জামিয়ার। সে ধর্ম্ম মানেন না, তবু তার স্বভাব সুসম্বদ্ধ। এদের ভগবানের নামে আপত্তি, কিন্তু সুজন হলে গুছিয়ে বলত, ইতিহাস তার চেয়ে ভীষণ ভগবান, দয়াহীন, মায়াহীন, অ-মানুষিক, নৈর্ব্যক্তিক। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যের, জেসুইটদেরও হৃদয় আছে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক কৈবল্য সাধনায় মানুষ যায় শুকিয়ে। তাই সফীকের মুখ-চোখ রুক্ষ, সেই রুক্ষতার তাপ পড়েছে খগেন বাবুর মুখে। বিজনের আন্তরিক আর্দ্রতা তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু এ যাবে জ্বালানি কাঠ হয়ে। নচেৎ সাবিত্রী মরে! রমলার ভয় হয়. ভয় করতে কথা কয়।

'মেয়েদের একটা সমিতি আছে এখানে শুনছিলাম।' 'বেশ ত! সেখানে যাও না, সময় কাটবে। হয় কি?' 'এই সেলাই বোনা শেখান থেকে…'

'কত লোককে সেলাই শেখাবে !' রমলা সাবিত্রীকে সেলাই শিখিয়েছিল এটা কি তারই ইঙ্গিত !

'যে শিখতে চায় ।'

'আগ্রহ কাদের হয় ?'

'জানি না ! অন্য কথা কইতে পার ত কও ।'

'কি কথা সম্ভব ?'

রমলার হাত থেকে বোনার কাটি পড়ে গেল। খগেন বাবু একবার দেখে বইএ মনোনিবেশ করলেন। অনর্থক এই বোনা আর বোনা, কেবল ফাঁকভরা, তাও আবার যন্ত্রের মতন, মনের বালাই নেই, অন্য দিকে চেয়ে আঙ্গুল চালাও, মাসীমার মালাজপার মতন, যখন ভ্রূ কুঁচকে ঘর গুণতে হয় তখনকার একাগ্রতা একেবারে যৌগিক ! নিজেকে ঠকান পরোপকারের অজুহাতে যার দশটা পশমের জামা তার জন্য পিসিমা একাদশ জামা বুনছেন। জর্জ্জেট পরে চোখে সুর্ম্মা টেনে, অনাবশ্যক ফার্-কোট চাপিয়ে, উঁচু জুতো পরে, মোটর চড়ে সেলাই পার্টি, হঠাৎ—বড়লোক পাঞ্জাবী ভাটিয়া মেয়েরা চুলে সোনালি রূপালি গুঁড়া মাখিয়ে সমবেত হয়েছেন জনসেবায়, আর মেম সাহেবদের মুখ থেকে ডাক-নাম শুনে কৃতকৃতার্থ হওয়া। সাম্যবোধ ! মেয়েদের সাম্যবোধ আসে না, মাতৃত্বেও নয়, ননদের ছেলে আর ভাজের মেয়ে হল, আসুক দেখি সাম্যজ্ঞান ! দিল্লীতে মহিলাদের আচরণ দেখলে রমলা বুঝবে বৈষম্য কারা চিরস্থায়ী করে রেখেছে। তার ওপর এই ব্যবসায়ী সহর, নতুন বুর্জ্জোয়ার লীলাক্ষেত্র এখানে জনসেবা অচল। বড় শক্ত এখানে মনুষ্যত্ব রাখা...

'বড় শক্ত'। রমা চাইল। খগেন বাবু বল্লেন।

'আমি জানি শক্ত, এই বিজন ধর, বড় শক্ত...বুদ্ধির প্রয়োগ। কেউ পারে, কেউ পারে না। চরিত্র মানে অন্য কিছু নয়, যে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তারই চরিত্র আছে, অন্যরা জড়, খায় দায় ঘুমোয় মরে, তারা মানুষ

নয়, অথচ এই জড় নিয়েই কারবার। স্থাখ, রমলা, সাহিত্য সর্ব্বনাশ করেছে মানুষকে জড় ভেবে, কিনা 'স্বাবাবিক' হওয়া চাই! ওটা কি জান? বুদ্ধিকে ভয়, তাই বুদ্ধির প্রয়োগকে জীবন থেকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিকতা, অর্থাৎ ভদ্রতা,···বিজন খুব ভদ্র। আর তোমাদের বাঙলা সাহিত্যের চাহিদা 'স্বাভাবিক' মানুষের চরিত্রাঙ্কন' 'স্বাভাবিক' মনোভাবের কবিতা, প্রকৃতির 'প্রকৃত' বর্ণনা' আরো কত কি! আমি অ-স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।' রমলা চুপ করে বসেই রইল।

'প্রয়োগ কথাটা হয়ত ঠিক নয়, কি বলব? প্রদীপ্ত, জীবনের প্রতি আচার ব্যবহার কর্ম্ম ইচ্ছা প্রেরণা পদ্ধতিতে বুদ্ধির আলো পড়ুক, হঁা, ভাবগুলোরও ওপর প্রবৃত্তিগুলোও অন্ধকারের বাদুড় হয়ে থাকবে না? একবার উদ্ভাসিত হোক, তখন দেখবে কত মজা! লোকে ভাবে বুদ্ধি বিশ্লেষণ করতেই জানে, এবং বিশ্লিষ্ট হলেই নাকি সৌন্দর্য্য কর্পূরের মতন উবে যায়। আমি মানি না, বিশ্লেষণের ফলে আনন্দ বাড়ে, কমে না। তবে সেটা এতই নতুন ধরণের যে দুঃখ, হঁা, দুঃখ বলে ভুল হয়। এই ধর···তুমি···'

'তুমি থাম, থাম, অনুরোধ করছি থাম, জোড় হাত করব আরো!' 'এই ধর তুমি···আমার বসার ভঙ্গীটা, যদি হাত দুটো উবুড় করে উরুর ওপর সোজা শুইয়ে রাখতে তবে মনে হত মিশরী প্রতিমা, মনের মুকুরে প্রতিফলিত হত চিরন্তনের শান্ত গভীর ভাবমুর্ত্তি; কিন্তু, হাত দুটো কোলের ওপর গুটিয়ে রাখতে,···'রমলা হাত সরিয়ে নিলে।

'হাত নড়ালে কেন? এবার কিন্তু অন্যরূপ···নেমে এলে কেন পাথর থেকে রক্ত মাংসের মানুষে? যেন নেহাৎ সাধারণ মেয়ের মতন বিরক্তিভরে উঠতে যাচ্ছ, পায়ের জোরে নয়, শির দাঁড়ার জোরেও নয়, কেবল কনুইএর ভরে, অর্থাৎ কৃত্রিম রোষে, এমন কবি বাংলা দেশে আছেন যাঁরা এই ভঙ্গিমাতেই সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আমি···'

রমলা উঠছে, এমন সময় খাগেন বাবু হ্যাঁচকা দিয়ে তাকে টানলেন, টাল সামলাতে না পেরে রমলা খগেন বাবুর চেয়ারে বসে পড়ল। ছিঃ রাগ করতে নেই। তুমি জান যে তুমি আমাকে ভরে দিয়েছ। শুনলে ত বিজনের মতটা।' বরফের চাঙ্গড়ের মতন রমলা বসে রইল।

'তোমার এখনকার ব্যবহারকে ডাক্তারে বলবে 'ফ্রিজিড'···অথচ, তা নও। ঢাকাই পোরো না, খস্ খস্ করে না? জাপানে স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নান করে, অথচ জাপানী মহিলাদের পোষাক স্ত্রীত্বের 'কফণ।'

'তোমার কি হল বল ত! কেবল মেয়েদের দেহ আর পোষাকের কথা মাথায় ঘুরছে!' রমলা চেয়োর ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে গেল, সঙ্গে খগেন বাবুও গেলেন।

আবার কেন বন্যা এল? জোয়ার ভাটার মত দেহের ক্ষুধায় যে ছন্দ আছে তাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রায় ধরা যায় না। নববধূর লজ্জা রমলার কখনই ছিল না, সাবিত্রী দৈহিক সম্বন্ধকে ঘৃণা করত, রমলার যে ঘৃণা নেই তা সে খুঁটিনাটি ব্যবহারে প্রমাণ দিয়েছে। অথচ স্বামীর ব্যবহারে ঘৃণাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই ব্যাকুলভাবে চেয়েছিল, কিন্তু হতাশ হল যখন তখন থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে আরম্ভ করলে। সিষ্টিন চ্যাপেলের মোছা ছবি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনের দূরত্ব যত বেড়ে চলে ততই দেহের সংযোগের প্রয়োজন হয়—ক্ষতিপূরণ হিসেবে। যত বেশী ক্ষতি ততই পূরণের আগ্রহ। কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসে না। মধ্যেকার ব্যবধান দুর্ভেদ্য। ফ্রিজিডিটি—ওটা ত নাম, পরের ঘাড়ে দোষ চাপান! মানসিক স্তরের পার্থক্য? সেটা চিরন্তন, এক হবার সময় বুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ চিত্ত শূন্য হলে দৈহিক আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষণিক সুখের লোভে, স্নায়ুর ক্ষণিক শান্তির জন্য মানুষ পশু হবে! বিরোধ থাকবেই থাকবে। প্রেমের চরমক্ষণে দ্বন্দ্ব, সন্তান হবার পর দিন কয়েকের জন্য শান্তি এল। আবার দ্বন্দ্ব এল। কিন্তু পুনরাবৃত্তিটা সমাধান নয়। যারা নূতন আগ্রহের

সন্ধান পেলে, কজনই বা পায়, তাদের কিছুদিনের জন্য আরাম মেলে। এই চলল চিরটা কাল, শাঁখের রেখার মতন, ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে ওঠা-নামা। শেষে? শেষ-বেশ নেই, যার আদি নেই, তার অন্তও নেই। এই যদি সত্য হয় স্ত্রী-পুরুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরতম সম্বন্ধের বেলা, তবে ডায়েলেকটিক্স্ অপ্রযোজ্য কোথায়? মন গোলোযোগ বাধায়, কিন্তু সেই ভয়ে তাকে বলি দেওয়া কাপুরুষতা, অমানুষিকতা। তন্ত্র-সাধনার একটি স্তরে সাধকদের দৈহিক সম্বন্ধের সময়ে মন্ত্র জপ করবার আদেশ থাকে। মোটেই অ-স্বাভাবিক নয়, পুরুষের পক্ষে সেইটাই সহজ। মেয়েদের মনের বালাই নেই। রমার কথা স্বতন্ত্র…কি যেন একটা ভাবে …পদ্মের ওপর লক্ষ্মীর মতন মন তার ভাসে।

সন্দেহ ওঠে হয়ত বা মনের অধিকারীত্বটাই শেষ কথা নয়। সক্রিয় হওয়াটাই দরকার, সেটাও যথেষ্ট নয়, সমন্বয় চাই, সেখানেও থামা চলে না, সমন্বয়ের পর ওপরে ওঠা। এক-একটি ধাপে আটকে গিয়ে এক-একটি ধরণের মানুষ হল। বিজন সক্রিয়, সুজন সমন্বয়ী, সুজন পরের স্তরের। কেউ কাউকে বুঝবে না--বাদুড় কখনও চিলকে বোঝে? বিজন ভাবছে সফীক বড় ঠাণ্ডা, খাদ পুড়ে যাবার পর খাঁটি সোনা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে। অবশ্য স্বভাব শীতলকে বুকে ধরে গরম করা শক্ত। কোনটাই বা সহজ! অঙ্ক সহজ? ব্যতি-রেক-বর্জ্জিত সাধারণ বিশেষকে প্রাণবন্ত করতে ব্যগ্র হবে কেন? ধরাই যাক, কাজটা ক্ষমতার বাইরে, তাই বলে সেটা অগ্রাহ্য? যেটা অসহজ সেটাই নাস্তি? যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ যখন দ্রুত তখন রাগিণীকে চেনা কঠিন, কিন্তু আনন্দ দিতে সেকি অক্ষম? আরাবেস্ক, য়্যাবষ্ট্র্যাক্ট ছবি ও মূর্ত্তিতে মানুষের ছোঁয়াচ নেই, কিন্তু তারা কিছু রসোৎপাদনে অকৃতকার্য্য নয়। সভ্য অভ্যাসের দোষে খাদ্যে বাজে জিনিষ এসে গেছে, ও-গুলো মসলা, তরকারীর প্রকৃত স্বাদ নষ্ট করাই তাদের কাজ, শেষে রুচি এমন বিকৃত হল যে মসলা না হলে চলে না, কেবল তাই নয়, যে সিদ্ধ তরকারী চাইবে তার নাম হবে বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব, কোল্ড, আরো কত কি! সফীকের

মধ্যে শুদ্ধির তাগিদ আছে, সে চলিষ্ণু, তার বিবর্ত্তনের ক্রিয়ায় মূল্যহীন বিশেষ খসেছে। উখোর গুঁড়ো উড়ে যাক, চুলোয় যাক, অন্যেরা পোড়াক গে, যতক্ষণ কাঠের টুকরো ঝকঝকে তক্‌তকে হয়ে আন্তরিক নির্ম্মাণবিন্যাস উদ্‌ঘাটিত করছে।

'চল রমা বেড়াতে যাই, একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে!' 'মাথা ছাড়ল না?'

'ছেড়েছে, এখনও একটু টিপটিপ করছে।'

'চল, বেশী রাত হল না?'

'তা হোক্ গে, চল যাই। ভাল সাড়ি পর একটা, যেটা দেহের হুকুম মানে, তাঁবেদার-সাড়ি।' রমলা হেসে কাপড় বদলে এল।

খগেন বাবু রমলাকে নিয়ে পার্কের কোণে একটা লোহার বেঞ্চে বসলেন। আরেকটা বেঞ্চে একজন লোক মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। চৌকীদার হবে। মোটরের হেড্‌লাইট মুখে পড়তে রমলা দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকল—পাংশুবরণ, রঙ আর পাউডার মিশখায় নি, যেন ননদবৃন্দ ভাগ্যবতী এয়ো-জার মৃতদেহ সাজিয়েছে— খগেন বাবু বলেন, 'ভাবি কখন তোমাকে ভাল দেখায় বেশী, সকালে স্নানের পর দেখেছি গরদের সাড়ি প'রে, সন্ধ্যায় দেখেছি বিজলী বাতির নীচে, এখন দেখছি আবছায়া অন্ধকারে, ঠিক বুঝি না...' রমলা খগেন বাবুর হাতটা টিপে দিলে। নিজের মনে লজ্জা হয় মিথ্যা আচরণে, রমলা পাশের লোকটার বিপক্ষে সাবধান করে দিচ্ছে ভাবেন; 'বসে থাক্ না।' রমলা আরেকটু জোরে হাত টিপলো; 'কেন?'

'কিছু না, চুপ করে বসে থাক, আমার খুব ভাল লগেছে।' আবার একটা মোটর গেল পার্কের পাশ দিয়ে হেড-লাইট জ্বেলে, ফ্যাকাশে রঙ হলদে হয়ে গেছে, 'চল, রমলা, এখান থেকে উঠে যাই।'

'এইখানেই বোসো।'

'যা বলেছ, সভ্যতার বেশী দূরে থাকতে পারি না, অথচ কাছে থাকলে তার

কুৎসিত রূপটাই চোখে পড়ে। তবু আমি ভালবাসি, সত্যি বলছি, রমলা, ভালবাসি'।

'তবে কেন আপত্তি করছ?'

'কিসে?'

'এই বিজন যা বলছিল......'

'ওতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধত।' রমলা চুপ করে রইল। খগেন বাবু বল্লেন 'ও ঐ কথাটা! সত্যি তুমি ওদের সমিতিতে যোগ দিতে চাও?'

'কি করব বল একা বসে থেকে? তা ছাড়া···'

'তা ছাড়া কি?'

'না, কিছু না।'

'কেন, আমি ত সর্ব্বদাই রয়েছি তোমার, সঙ্গে না হোক, আশে পাশে। এতদিন কানপুরে রয়েছি, এক মিনিটের জন্য...তা ছাডা বিজন ত প্রায়ই আসছে আজকাল। আচ্ছা, বিজনের মনে কি একটা হয়েছে বলত? যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

'জানি না।'

'সকলেরই জীবনে একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন সহজ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে চোখে পড়ে। তখনই আতঙ্ক হয় বুঝি বা মাথার ওপরকার আকাশটাই খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে যাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম সেটা ছিল নিজেরই কামনা মাত্র। বিশ্বাসের প্রকৃতি হল ইচ্ছাপূরণ। আমাদের ইচ্ছাগুলোও আবার ভীষণ কাঁচা, আকাশের দোষ কি! না যাচিয়ে আদর্শ খাড়া করা আমার ধাতে নেই, তাই, রমলা, সহজে আমি হতাশ হই না, আশ্চর্য্যও লাগে না। বিজন সফীককে মহাপুরুষ ঠাউরেছিল, লোক মন্দ নয়, ভালই, বেশই ভাল, যতটুকু দেখেছি, মাথা পাকা, তাই বলে আদর্শ ব্যক্তি নয়। তুমি যেন, রমলা, আমাকে উঁচু চাতালে বসিও না, নিজেই বিপদে পড়বে··· তখন ভীষণ কষ্ট পাবে, সাবধান করে দিলাম আগে থাকতে।'

কোথায় যেন সততার অভাব রয়েছে সন্দেহ হয়···ও সাবধানের অর্থ নেই··· ও চায় উঁচু চাতালেই বসতে—কচি খোকার মতন নিজেকে ঠকাচ্ছে···আত্মম্ভরি ধার্ম্মিক·· ইংরেজীতে কি একটা নাম আছে···প্রীগ···রূঢ় বিচারে রমলার মনে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আলগোছে খগেন বাবুর উরুতে হাত রাখে।

কি বলতে চায় রমলা, যে সে বিপদে পড়বে না, যে তার বিশ্বাস ঠুনকো নয়, ভিত পাকা, বেদী অটল, গগনচুম্বী তার শিখর? 'আচ্ছা, রমলা, তুমি আজকাল কথা কও না কেন, কানপুরে এসে কি বোবা হয়ে গেলে, কি ভাব বসে বসে? একটা বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা কর না জানি, মেয়েরা পারে না, একত্রে একাধিক ব্যাপার তাদের চোখে পড়ে, তোমাদের সময় আমাদের নয়, সেলাই করছ কথা কইছ খোকার খেলা দেখছ উনুনের দুধ উথলে উঠল কিনা ভাবছ—ঐ একই ক্ষণের ছকে নিজের চেহারা ভয় ভাবনা স্মৃতি আশা ভরসা এসে জুটছে—এই যে আজকাল-কার ছবি, সাহিত্যের টেলিসকোপিক দৃষ্টি, সব তোমাদেরই আশ্রয়ভুক্ত, মেয়েলী। এককালীনতা আর ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য—দুটো পরস্পরের বিরোধী নয় কি? মেয়েলী আর পুরুষালী প্রত্যয় দুটো—সেই পুরানো চীন, কেবল চীন কেন, আদিম সভ্যতা মাত্রেই এই দুটিকে প্রাথমিক হিসেবে ধরেছে। নূতন সভ্যতা সুরু হল সেদিন যেদিন পারম্পর্য্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে মানুষ বুদ্ধিমান হল, তারই ফলে বিজ্ঞান, সেটা পরীক্ষাগারে, তার বাইরে বুদ্ধির পরিচয় আর প্রয়োগ পাচ্ছি সোশি-য়ালিজমে। অবশ্য, সাধারণতঃ যাকে চিন্তা বলে সেটা স্নায়ুর চাঞ্চল্য মাত্র, তাই এনার্কিজম্ আসতে পারে জোর, তার উদ্দেশ্য নেই, গড়ন নেই, জেলীর মত থক্‌থকে কাদার স্রোত, হাঁ, চলছে, কিন্তু সে চলার ছন্দ নেই, রীতি নেই, গন্তব্য নেই—চলাটাই সর্ব্বস্ব নয়—খানার জলও চলে, তাকে হরিদ্বারের গঙ্গা ভাবা ভুল। খানিকটা তুলে এনে জালায় ভর, ফটকিরি দাও, তলায় কাদা রইল, কেবল ওপরের জল ছেঁকে খাও···এই হল জীবনযাত্রার উপযোগী দর্শন···এ জল বরফ-গলা পাহাড়-ফোঁড়া পানীয় নয়···এই ময়লা স্রোত নিয়েই কারবার চালাচ্ছে সকলে, কে আর

চুড়ো থেকে বরফ আনছে বল ?···কি ভাবছ ?···আমি এ ব্যবসায় যোগ দিতে নারাজ ···অন্যে পারে চালাক, এই থেকে অন্নসংস্থান করুক···আমি পারি না এইটুকু জানি···কথা কইছ না যে! পার্কে বসেও চুপ ?'

রমলা নীরবে বসে রইল; অন্ধকারের মোটা তুলিতে স্থূল হয়ে দেহের পরিচিত রেখাগুলো মুছে গেল; দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হয় কষ্টিপাথরের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি; আরেকবার, বহু পূর্ব্বে, রমলা স্মরণ করিয়েছিল আরেক মূর্ত্তির কথা···তার রূপ ছিল সুনিবদ্ধ, সম্পূর্ণতার অভিমুখী, কিন্তু এ যেন ভাঁটি, পাথর আনাই সার, বাটালির দাগ রয়েছে মাত্র···তাই কি! নিশ্চয়ই এর রূপ আছে। খগেনবাবু চোখ কুঁচকে রমলাকে দেখেন। 'তোমার ঈজিপ্টে জন্মান উচিত ছিল, রমলা, কেন জানি না, কেবল তাই ভাবছি। মুখটা ফেরাও, এইবার স্পষ্ট হচ্ছে রাস্তার আলো প'ড়ে, না, গ্রীক টাইপ নয়, ইতালীয়ান নয়, বাঙালী মুখ নয়, অমন তুলতুলে আদুরী মুখ নয় ···এই বার ধরেছি, মিশরী···কিন্তু কোন যুগের, আমেন হোটেপ—তুতেন খামেন যুগের ? না; তখন পচ ধরেছে পূবে হাওয়ার পরশ লেগে···তারও আগেকার, থীবান যুগের···মিশরী থীবান। ভারি মজা, রমলা, মিশরীরা বাঁচত মৃত্যুর জন্য, তাদের জীবনের প্রধান বৃত্তি ছিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, মৃত্যুর পর দেহ কি খাবে, কোথায় শোবে, কোথায় যাবে তার খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করা, কবরে জল, খাবার, কাপড় মায় নীল নদের নীচে স্বর্গে যাবার বাধা খাগড়া কাটার কুড়ালটা পর্য্যন্ত···অথচ মিশরী পোর্ট্রেট নিতান্ত জীবন ধর্ম্মী, মাংসপেশীর প্রতি অংশটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট ফোটান। তুমি তার আগেকার নয় জানি। অথচ, গ্রীকরা মৃত্যুর পরে কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, এই জীবনই তাদের আদি, মধ্য, অন্ত,—ব্যয়াম,দৈহিক ও মানসিক পরিণত সৌন্দর্য্যের পাটই তাদের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু তাদের ভাস্কর্য দেখলে মনে হয় যে তারা নর-নারীর ওপর দেব-দেবীর অবিশেষত্ব আরোপ করবেই করবে...আরোপ করা আমার ভাল লাগে না...তুমি বলবে আমি আরোপই করি···ওটা ভুল, একদম ভুল···একটা গ্রীক মূর্ত্তিকে বলতে পার না যে এটা অমুক মানুষের প্রতিকৃতি।

মিশরী ভাস্কর আত্মাকে দেহ দেয় গ্রীক ভাস্কর দেহকে আত্মিক করে। আমি মিশরী ভঙ্গী পছন্দ করি, এতে দেহ আছে, যেমন এক একটা মদের 'দেহ' থাকে—আদর্শবাদী আমি নই, বিজন আদর্শবাদী, তাই সে সফীককে হিরো বনিয়েছে। তোমার···ঠিক বলা যায় না, নয় রমলা ?'

রমলা হাত সরিয়ে রাখলে! 'খুব বক্তৃতা দিলাম—নয় রমলা? কেনই বা দেব না ? আচ্ছা, বিজন কি তোমাকে ক্লাবে ভর্ত্তি করে দিতে পারবে ?'

'ওর সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে।'

'থাকাই স্বাভাবিক। বড় লোকের ছেলেরাই কমরেড হয়।'

'ওকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে ?'

'তা বটে···দেখো, যেন···'

'থাক, অনেক রসিকতা হয়েছে, মাষ্টার মশাইএর। কিন্তু, কি করে ক্লাবে যাব ভাবছি।'

'টঙ্গায় যাওয়া হবে না বলে দিলাম।'

'ওগো তা যাব না, তোমার খাতির আমি রাখব।' রমলা খগেন বাবুর কাছে এল। হাত টিপে বল্লে, 'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে। বিজনকে অত্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়, ও একটা টু-সীটার কিনবে, স্পোর্টস্ মডেল, একেবারে নতুন, অথচ সস্তা।'

'ও কিনলে তোমার কি ?'

'ওই আমাকে পৌছে দেবে মধ্যে মধ্যে, আমি ত আর রোজ হাজরে দিচ্ছি না তোমার মতন!' খগেন বাবু খনিক পরে বল্লেন, 'যাবে না কি ?'

'বোসো না, বাড়ি গিয়ে কি হবে! যা ছিরি ফ্ল্যাটের!'

'বিজনকে বল না নতুন ফ্ল্যাট দেখতে ?'

'ফ্ল্যাটে আমি যাব না।'

'ভালই ত বাড়ি পেলে।'

'একটা বুঝি ছোট বাঙলো আছে, নাম মাত্র ভাড়া, সামনে লন্ আর ফুলের ছোট বাগান। খোলা জায়গায় তোমারও ভাল লাগবে। তবে লীজ চায় ছ-মাসের। বিজন ধরে বসেছে এখনই নিতে, আমি বলেছি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তার পর কথা দেব। চল না কাল দেখে আসি। বিজন কাল এলে কি বলব?'

'ফুলের বাগান, বেশ ত, তোমারও ভাল লাগবে, সেই ভাল। আমার কাজ আছে, তুমি আর বিজন গিয়ে দেখে এস, পছন্দ হয় কথা দিও—আমাকে এর মধ্যে কেন? কাল আবার কাজ আছে, ওদের কী হল জানতে পেলাম না…চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'বোসো না একটু আমার পাশে। উস্‌খুস্ করছ কেন? ওটা দারোয়ান। আমার কি ইচ্ছে হয় না, আমি কি বুঝি না তোমার কষ্ট হচ্ছে, চাই না কি তোমাকে ভাল রাখতে? এখানে এসে পর্য্যন্ত তুমি যেন কেমন ধারা হয়েছ…অত কেবল নিজের দিকে দেখতে নেই গো দেখতে নেই, লোকে স্বার্থপর বলবে। সত্যি কথা কও...আমিও কি তোমার জন্য কিছু করিনি, খোঁটা দিচ্ছিনা...কি নিয়ে থাকি বল? বিজন আমাকে কি দিতে পারে যা আমি চাই, যা তুমি একবার আমাকে দিয়েছিলে, যা পেয়েছি? তুমি কি চিরটা কাল ছেলে মানুষই থাকবে?' রমলা হঠাৎ খগেন বাবুর মুখ বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। 'আঃ কি করছ! চল বাড়ি যাই।'

'না, যাব না, এখানে বসে থাকব সারারাত, তুমি যেতে চাও যাওগে ঐ ফ্ল্যাটে, দারোয়ান আমাকে পাহারা দেবে।' খগেনবাবু হাত ছাড়িয়ে দূরে বসলেন। কেমন যেন ঘিন ঘিন করে...ছলাকলা এই মান অভিমান, হিসেব-নিকেশ এই দান-প্রতিদান, মিথ্যা আচরণে বক্তব্যের এই মুখ ফিরিয়ে দেওয়া, এই আদর-আপ্যায়ন, এই স্ত্রীত্ব থেকে মাতৃত্বে দ্রুত পরিবর্ত্তন। সত্যি কথা, রমলা পারছে না ফ্ল্যাটে থাকতে, মোটর না চড়ে, স্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে না মিশে। কেন এই জুয়াচুরি! জবরদস্তীতে সে আপন হবে না। 'সেই ভাল, বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যেও, তার দিদি হিসেবে খাতিরও হবে।' রমলা বিদ্রূপ বুঝলে না, সম্মতি আদায় করে উল্লসিত হল দেখে

মন বিষিয়ে ওঠে। রমলার বোঝা না-বোঝা অ-বোঝা ইচ্ছাধীন, উদ্দেশ্যাধীন, স্বার্থাধীন, ইচ্ছা উদ্দেশ্য স্বার্থ নিজের নয়, যে পংক্তিতে বসে এসেছে তারই। কিছু পরে খগেন বাবু আর রমলা বাড়ি ফিরল। সে-রাত্রের ব্যবহারে মনে হল রমলা নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে।

পরের দিন বিকেলে বিজনের সঙ্গে রমলা নতুন বাঙলো দেখতে গেল। খগেন বাবু একলা বাড়িতে রইলেন। সফীক চেয়েছে চাঁদার হিসেব, হরতালীদের নামধাম, কাজের সূচীপত্র। ভাল লাগে না, কুড়েমি আসে। এককাল ছিল যখন বাড়ি নিয়ে মন খুঁতখুঁত করত, তখন বাড়ি ছিল সম্পত্তি। সাবিত্রীর মৃত্যু হল, দেশ বিদেশে ঘুরলেন, বাড়ির মোহ কেটে গেল। খগেন বাবু মার্ক্সের চিঠিপত্রের বই নিয়ে বসলেন। কি আশ্চর্য্য। মাত্র একখানি চিঠিতে, ৫ই মার্চ্চ ১৮৫২ সালে, হ্বীডেমেয়ারকে, মার্ক্স মজুরদের একাধিপত্যর উল্লেখ করেছেন। এর পূর্ব্বে আছে ১৮৫০ সালের "ফ্রান্সের শ্রেণীবিরোধের" তৃতীয় অধ্যায়ে, এর পরে, ১৮৭৫ সালের "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনায়।" মাত্র এই তিনবার-এর বেশী শ্রমিক একাধিপত্যের ব্যাখ্যা কার্ল মার্ক্স করেন নি। এঙ্গেল্‌স্ মাত্র দুবার করেছেন, তাও স্পষ্ট সাধারণতন্ত্র হিসেবে। তা হোক, শ্রেণী রয়েছে, শ্রেণী বিরোধ চলছে, সেটা একটা মস্ত শক্তি, যার প্রয়োগ হবে সময় বুঝে, তবেই যাবে সংঘাত, এবং ইতিমধ্যে এই সংঘাতের অজানা ভয়ে কেউ যাবে ওপরতলার আশ্রয়ে, কেউ ভাসবে নিচের স্রোতে। আজ না হয় মজুর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা নাই হল, কিন্তু এই চেষ্টায় একটা বড় ফাঁকি ধরা পড়ল—এটাই কি কম লাভ!

হাতের বই হাতে থাকে। বিজন ঠিক ধরেছে, প্রত্যেক চিন্তায় রমলা এসে পড়ে। সফীক হয়ত ভাবে যে কানপুরের আবহাওয়ায় এই বদল ঘটেছে। তা নয়, গোড়ার তাগিদ ঐ রমলা, সোশিয়ালিজমটা বুদ্ধি দিয়ে মনকে চোখঠারা মাত্র। খগেনবাবু খাতাপত্র কলম নিয়ে বসেন। বই তুলে রাখতে দুঃখ হয়। বইএর সঙ্গে সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ছাপা পৃষ্ঠা বাঁধান হলেই চলত, ভালবাঁধাই হলে ত'

কথাই নেই, তার ওপর যদি নতুন বক্তব্য, নতুন তথ্য, নতুন অভিজ্ঞতা থাকত তবে পোয়া বার,...নবাব-বাহাদুরের প্রতিদিন কুমারী চাই। এখন যাতে তাতে মন বসে না, মনের সে হ্যাংলামি নেই, এখন বইএর কাছে মন তার নিজের দেয় নিয়ে উপস্থিত হয়, যদি লেখককে গ্রহণ করে তবে আগ্রহ জাগে, নচেৎ সময় নষ্ট করতে মন নারাজ হয়। আধুনিক হবার মোহ এবং সময় কাটাবার নেশা এই ছিল তখনকার উৎসাহের রাসায়নিক রচনা। এখনও ছোঁক ছোঁক যে করে না তা নয়, কিন্তু সামলান যায়। এখনও বই পড়ে সময় কাটাবার প্রয়োজন ওঠে, ওঠে বৈ কি! মজুর সভার জন্য নোট লেখার পরেও, সফীকের সঙ্গে তর্ক করার পরেও ওঠে বৈ কি! একটা ফাঁক থেকেই যায়, রমলা ভরাতে পারলে না, দূরত্ব বেড়েই চলল। অবশ্য, রমলা কি বইএর প্রতিভূ? তাই কখনও সম্ভব! জ্যান্ত মানুষ মরা কেতাব হতে চাইবে কেন! নতুন নতুন বিয়ের পর সকলেই বৌকে জীবন্ত পুস্তক ভাবে, বেশ আঁটসাঁট পরিপাটি গেট্‌-আপ্‌, চমৎকার জ্যাকেট, ওপরে মজাদার ছবি আর বৌএর বাপের বাড়ির ঝি আর ঠাকুমার বিজ্ঞপ্তিতে ভরা, আর ভেতরে নায়িকা, সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, অর্থাৎ অরিজিন্যাল কবিতায় ঠাসা! সাবিত্রীকেও হয়ত তাই ভাবা হয়েছিল, রমলার কাছেও কি সেই প্রত্যাশা! কেবল কবিতার রূপটাই আধুনিক! আবার রমলা মাথার মধ্যে জুড়ে বসে...সে বলে হাতে তার কাজ নেই, তাই পার্কে অনুযোগ করলে, কিন্তু সেটা তার অবসর মাত্র, ভরাক না সংসারের চিন্তায়। তাও পারবে না, মা নয় যে! তাই রাজবালা বিরহবিধুরা, সাবিত্রীও তাই, পার্থক্য নেই। আবার সাবিত্রীর কথা মনে ওঠে কেন? কোথায় গিয়ে মন হাজির হয় কে জানে! দূরে চলে যায়, সহরের ঘুঁড়ি পাড়াগেঁয়ে, সহরের ছোকরা লাটাইএ সুতো গোটায়, গ্রামের ছেলে ইঁটে সুতো বেঁধে ঘুড়ি ধরে...কিন্তু ভো কাটা!

রমলা সরে গেল। হয়ত অন্যায় হয়েছে তার দিকটা না দেখে। কি বল্লে, আত্মসর্ব্বস্ব না আত্মকেন্দ্রিক? তবে নিশ্চয় এটা স্বার্থপরতা নয়, অন্তর্মুখিতা মাত্র, সেটা মজ্জাগত, বহির্মুখীরাই সুখ দিতে জানে, যেমন বিজন বিজন। সুজনের মধ্যে

তুইই আছে? কাজের মধ্যে এলেই অন্তঃশীলতা ঘুচবে। ধর্ম্ম-ঘটের খবর পাননি সারাদিন।

রমলা ও বিজন ফিরল।

'খগেন বাবু, বাঙলোটা কিন্তু আমার আবিষ্কার, মাত্র আশী টাকা, গ্যারাজ পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে, স্যানিটারি ফিটিঙ্ চমৎকার।'

'গাড়ি কেনা হয় নি?

'সেটা অবশ্য আপনারা বুঝবেন। রমাদি বলছিলেন যে টু-সীটারের বদলে…'

'নিশ্চয়ই, কিনতে যদি হয় সীডান্ বডি কেনাই ভাল।'

'অবশ্য আমারও তাই মত, এ অঞ্চলে যেমন ধুলো তেমনি গরম, যেমনই শীত, তেমনই ধোঁয়া। অবশ্য খরচ একটু বেশী পড়ে। তবে কমান যায় অতি সহজে, একটু নজর রাখলে।'

'সে তোমরা যা হয় কোরো। যা দিতে হবে আমাকে বোলো।'

'রমাদি কিন্তু...ও-বিষয় তোমরা বোঝাপড়া করগে, আমি সহজেই দফায় দফায় শোধ দেবার বন্দোবস্ত করছি, কোম্পানীর মালিকের ছেলে যে আবার ক্লাবের মেম্বর!'

'মজুর, মালিক, মেয়ে—ভাগ্যবান! তার ওপর সবার সেরা রুমাদি। একটা অফিসের ঘর পাওয়া যাবে? ছোট? তা হোক! তাই চাই। ওপরতলায়? চমৎকার! এখানে নোটিশ দিতে হবে না কি? তাও সহজে হবে? তবে আর কি! গুছিয়ে নাও তোমরা। ওস্তাদের খবর কি হে! রমলা, সুজনের ঘর হবে বাংলোতে?'

'ভারি মজার কথা কিন্তু! বাড়ি খুঁজে বের করলাম আমি, আর এসে থাকবেন সুজন দা! অর্থাৎ, বিজন নয়।'

রমলা নিজের ঘরে গিয়ে টেবিল খুঁজলে, সুজনের চিঠি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাইরে এসে দেখে বিজন নেই, খগেনবাবুও নেই।

(৭)

কয়েকদিন ধ'রে তর্ক বিতর্কের ফলে যখন করিম ও অন্যান্য মজদুর-সভার কর্ম্মী বিতাড়িত মজুরদের গৃহীত হবার আশা রইল না, তখন কিষণচাঁদ ছুটে এসে সফীককে বল্লে, 'ওস্তাদ, আমরা তৈরী। ওরা নতুন লোক নিয়ে মিল্ খুলবেই, আর আমাদের বন্ধ করতেই হবে।' সফীক বর্ম্মা-চুরুট ফেলে দিয়ে ছুটল ডেপুটিপাড়ার দিকে। ভোর হতে তখনও দেরী রয়েছে। একটা দোকানের দরজায় টোকা মারতে একজন বৃদ্ধ মুখ বার করলে। 'আও, বেটা।' জন কয়েক লোক চা খাচ্ছিল। 'ওরা রাজি হয় নি শুনেছ?' 'সঠিক শুনিনি বটে, তবে কেই বা শোনবার জন্য কান পেতে বসেছিল!' 'অন্য বন্দোবস্ত?' 'রাত ন'টা থেকে ফাটকের সামনে লোক জমেছে।' 'ষ্টেশনে?' 'তৈরী।' 'ব্রীজে?' 'সেখানেও।' 'কিষণ, সাইকেল ক'রে দেখে এস ফাটকের সামনে এখনও লোক শুয়ে আছে কি না। ভোর বেলাতেই সিঁধেল ঢোকে। আসবার সময় উধামজীর ওখানে ঢুঁমেরে আসতে পার। হয়ত সারারাত তর্কবিতর্কের ফলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিংবা জয়োল্লাসে জাগ্রতই দেখবে।' কিষণ বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দোকানদার বড় বাটিতে চা এনে দিলে, এনামেলের প্লেটে শিক্ কাবাব। সফীক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড় রাস্তায় তখনও নিয়ন-লাইট জ্বলছে। চৌরাহার ঘুন্টির বাইরে কনষ্টেবল্, কালো কোটের হাতে সাদা কাপড় জোড়া। 'কি খবর, জমাদার সায়েব! ভাই সাহেবের চাকরী হল?' 'কোথায় চাকরী ভেইয়া! বড় নখাড়া বাধিয়েছে, পঁচিশ রূপেয়া চাইছে।' 'ভাই সাহেবকে না হয় আমার কাছে পাঠিও, উধামজী বলছিলেন মুন্সীপালের দফ্তরে একটা নোকরী খালি আছে। ভাই সাহাব ত' ইংরেজী জানে?' 'তিন দরজা পাশ করেছে, ইংরেজী জানবে না! ডিউটি খতম হলেই পাঠিয়ে দেবো।' কনষ্টেবল্ সেলাম ক'রে সফীককে একটা সিগারেট দিলে।

'ভোরের দিকে শীত করে, তাই বিলেতী চীজ পোড়াতে হয় ভেইয়া।' সফীক হেসে ফেল্লে। 'বিলেতী চীজের তারিফ করতেই হয়।' 'নিশ্চয়ই, রূপেয়া ত' বিলেতী!'

বড় রাস্তা ছেড়ে সফীক গলির মধ্যে ঢুকল। বেশ্যাপল্লী—একবার বিজন সঙ্গে আসছিল এই গলি দিয়ে, কি রাগ বুর্জোয়া সভ্যতার ওপর, সব চেয়ে জঘন্য এই পাড়া তার মতে। বই-পড়া রাগ, যেমন যুবকদের বই-পড়া কাম? কিন্তু বেশী রাগ কেন? রাগই বা কেন? গোয়ালটুলী, জুহীর চেয়েও পচা? যে ব্যাপারটা বুঝেছে তার রাগ আসবে না। জ্ঞানের পর যে-ভাবটি থিতোয়, মানুষের সর্ব্বাঙ্গে সকল ব্যবহারে যেটি ওতঃপ্রোত হয়, তার প্রকৃতি রাগের মতন উদ্বায়ী নয়। সেটা তৈলাক্ত ধাতুমলের মতন থকৃথকে, ঘন, ঘৃণার মতন স্থায়ী, গভীর আর ব্যাপক। ঘৃণা, সৌখীন দুঃখবাদ নয়, সদ্‌ভাব, মোড় ফেরান আদর্শবিলাস নয়, যার সক্রিয়তায় গোটান হাত পা খুলে যায়, শুখনো মাথা রসাল হয়। কাজের মূলে ব্যাপক অথচ শান্ত ঘৃণা না থাকলে সেটি অকাজ হয়ে ওঠে। যেমন পল্লী-সংস্কার, সেবা-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা হয়েছে। কাজের ক্ষেত্র যখন ছোট এবং রীতিনীতির ভিত্তি যখন বড়, তখন কাজের ফল ধরবে রীতিনীতিরই প্রয়োগে। ওরা বলবে, কেউ কেউ বলেছে, বোঝাপড়া হতে বাধ্য এই অবস্থায়।

অবস্থাটা কি? হরতাল সম্পূর্ণ, চাঁদা উঠেছে, যদিও আশানুরূপ নয়, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে নি, বাধবারও সম্ভাবনাও নেই, কিষণচাঁদ ও আরো অনেকে খবর দিয়েছে যে ফাটকের সামনে হরতালীরা জমায়েৎ হয়েছে। হয়ত মাত্র ভিড় করে আছে, একবার দেখলে হয় নিজে। মজুরদের বিরোধজ্ঞানে ভাঁটা পড়ে নি, নিশ্চয়। তবু বোঝা-পড়া হবে কেন? এই সঙ্কটে মিটমাট হলে সর্ব্বনাশ হবে। এগিয়ে চলুক বিরোধ, বেঁচে থাক জীদ্, তাকে জুড়ুতে দেওয়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। খগেন বাবুও যেন ঐ কথাই বলছিলেন সে রাত্রে, বিরোধ চিরন্তন, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলি ফুটেছিল, লোকটির সততা

আছে, যা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে থাকে না, কত ছুতোনাতা ফুঁড়ে কলি গজায়! কতদিক থেকেই না বাধা আসে! একে ত' বাইরের চাপ, তার ওপর স্বকৃত ফাঁকির বোঝা। কিন্তু সুযোগও আসে তাইতে। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা এক হতে বাধ্য, সকলেরই মূলে জীবন, সকলেরই মধ্যে দিয়ে জীবনের উর্দ্ধগতি। অথচ খগেন বাবু জীবনস্রোতে বিশ্বাসী নন। যুক্তিটা গ্রহণ করা যায়। পার্টির প্রয়োজন ভদ্রলোক ধরতে পারেন নি, নিতান্ত স্বাভাবিক, তাঁর সংস্কার ব্যক্তি-গত, অন্তর্মুখী, জোর ক'রে, কল্পনার জোরে বাইরের সংস্থান বুঝতে চাইছেন, তবু ভাল, বিজনের চেয়ে। বিজন কেন্দ্রচ্যুত হচ্ছে, অবশ্য কেন্দ্র তার ছিলই না। বিজনের কথা ভাবতে সফীকের চিবুক দৃঢ় হয়। প্রাণবান ছেলে, কিন্তু মাত্র প্রাণ নিয়ে কি হবে! গলির দুধারে এইত' প্রাণের পরিণতি! গলির মোড়ে বাতি টিম্‌টিম্ করেছে, একটু জ্বলে উঠল, নিবল না, বিজলী বাতি। মিউ-মিউ শব্দ কানে এল, মরা ছানার পাশে বেড়াল কাঁদছে, কেবল কাঁদছে, আর কাঁদাছেন ভারতমাতা, হাপুসনয়নে, বিধবার বেশে, ওঠে দাঁড়ান না, চোখ পুঁছে ঘাঘ্‌রা ঘুরিয়ে হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে আসেন না! সফীক বেড়ালটাকে লাথি দেখিয়ে তাড়ালে, মরা ছানাটাকে ঠোক্কর মারতে মারতে গলির মোড়ে নিয়ে এল। সমঝোতা নেহী হোনা চাহিয়ে, নেহী হোগা...মোলকের চোখ জ্বলছে সামনে, ম্যয় ভুঁখা হুঁ। আহুতির যোগান চাই।

মজুর-পাড়ার কিনারা যেন দেখা যায়, আলোর আশীর্ব্বাদে নয়, তমসার ঘনতর প্রলেপে। ধোঁয়া নেই, কল বন্ধ, চুলাও বন্ধ, তবু আকাশটা ত' স্পষ্ট। তারমধ্যে প্রবেশ করতে জাগরণের মৃদু কম্পন অনুভব হয়, তিন মাসের ভ্রূণের মতন, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবে বাড়বে, যথা সময় প্রসূত হবে। নেতারা নিজেদের ভাবেন জন্মদাতা, দম্ভের শেষ নেই তাঁদের, তাঁরা ধাই মাত্র, দেশী ধাই, তাই আঁতুড় ঘরেই মরে মা ও বাচ্চা উভয়েই, শিক্ষিত ধাই চাই, পরে নার্স, তার পরে শিক্ষয়িত্রী, শেষে চ'রে খাকগে। অনেক দেরী লাগান প্রকৃতি ঠাকরুণ সহুরে ভদ্র ঘরের বাপ

মায়ের মতন। জৈব-অভিব্যক্তির বিকাশ দীর্ঘকাল ব্যাপী। এতদিন তাতে আসত যেত না, কোটি বছর লেগেছে এক-একটা জাতি জন্মাতে। কিন্তু আজ অচল তার এই মন্থর-গতি। বিজ্ঞান এল, কল-কব্জা এল, জীবন-যাত্রার উপায় পরিবর্ত্তিত হল, এখনও সমাজ-বিবর্ত্তন মহাকালের খেয়ালের তাঁবেদারী করবে! কিলিয়ে কাঁটাল পাকাতে হবে, পাতা ঢাকা দিয়ে, তাপ দিয়ে কাঁচাকে ডাঁসা, ডাঁসাকে পাকাতে হবে, তবে বাজারে চলবে। আমেরিকায়, রাশিয়ার যব গম পাকছে তিন সপ্তাহে, আর মানুষ সচেতন হতে লাগবে বিশ বছর! তা হয় না—অত বেহিসেবীপণা মধ্যযুগে চলত; অচল বিশেষতঃ আজকাল, যখন দারিদ্র্যের দুর্দ্দশার অন্ত নেই, ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা প্রকৃতির নিয়মাধীন নয়—অন্ততঃ যে-রীতি নিয়ম বলে চালান হয়েছে এতদিন যাবৎ। বিরোধের পর বিরোধ, হাতুড়ির ঘা-এর ওপর ঘা, এক ঘা-এ হল না ত' বিশ ঘা, এতে হারজিত নেই, ধারাবাহিক আঘাতের ফলে চৈতন্য আসবে। উধামজী ভাবছেন এটা বুঝি সরকারের কাজ। সরকারের চোদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা নেই। ওরা নিজেরা লড়ুক। পার্টির কাজ জাগান, জাগিয়ে রাখা। সাপে কামড়ান লোক ঘুমলেই মরে, তাই ঠেলে বসাতে হয়, চড়-চাপড়-ঘুষি দিয়ে। এতে হারজিত নেই, সবটাই জিত।

'করিম, তোমাদের পাড়ার খবর কি?'

'আমাদের পাড়ার জন্য ভাবি না, কিন্তু অন্য পাড়া যেন তৈরী নয় সন্দেহ হল। তারা বলে বোঝাপাড়া হওয়াই মঙ্গল।'

'সেখানে কে কে আছে?'

'সরযূপ্রসাদ, উধামজীর লোক।'

'সারাও তাকে। পাড়া থেকে নিজেদের লোক খাড়া কর।'

'আগেই বলেছি ওস্তাদ, ওদের নিয়ে চলে না। সরযূপ্রসাদের চার-চার-খানা বাড়ী।'

'জানি, কিন্তু না নিলে আপাতত চলে না, তাই সরযূর মত লোক এসে পড়ে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন?'

'কাল পর্য্যন্ত দেখি।'

'কালের বাকি কি। সকাল হয়ে এল। তোমার মিলের সামনে...'

'আমাদের মিল-কমিটির আওরাৎরা বাচ্ছা নিয়ে চলে গেছে আধ ঘণ্টার ওপর। ওস্তাদ...'

'কি ?'

'যদি ওরা ঘাবড়ে যায় !'

'কারা ?'

'ও পাড়ার দল...'

'তখন প্রত্যেক মিলের সামনে যারা শোবে তাদের মাথায় ও পায়ের কাছে আমাদের লোক থাকবে, তারা লরি আটকাবে, লরি যদি চলে তাদের বুকের উপর দিয়ে প্রথম চলবে।'

'আচ্ছা ওস্তাদ, মজদুর সভার...'

'মজদুর-সভা লীড্ দেবে তখন, যখন আমাদের পিকেটিং সুরু হবে—প্রস্তাব গৃহীত হতে লাগবে দুতিন দিন—অত দেরী সহ্য হয় না, ইতিমধ্যে হাজার লোক হাজির হবে। আমাদের তৈরী থাকা চাই।'

'কেবল তৈরী ওস্তাদ ?'

'ঠিক বলেছ করিম, কেবল তৈরী থাকলে চলবেনা। ব্যাপারটা বাধিয়ে দিতে পারলে মজদুর-সভা বাধ্য হবে আমাদের সমর্থন করতে।' করিম চলে গেল।

আগে এটা হোক্ পরে ওটা হবে ! কিন্তু এটা-ওটার মাঝখানে প্রকাণ্ড অবসর, সেই ফাঁকে কর্ম্মপ্রবাহে ভাঁটা আসে, লোকে আরাম খোঁজে, ঝুলে পড়ে, ভিজে যায়, নিবে যায়। ধাক্কার পর ধাক্কায় গাঁথুনি নিরেট হয়, নয়তো বালির প্রাসাদ। যে বিশ্রামে ঘুম আসবে অচেতনদের, সেই বিরামে বিরোধের নতুন ফন্দী আবিষ্কৃত হোক্। তার বদলে মিউ, মিউ, মিউ, ..স্বদেশ-প্রেমিকের রচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। বিরামে সাহিত্য, চারুকলাও তৈরী হয় না। যে অবস্থায় কর্ম্মের

সুযোগ ঘটে তাকে বিরাম বলে না—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তি এল, আধ-জাগন্ত আধ-ঘুমন্ত মনটা তখনও অচেতন হয় নি, সেই সময়েই গুপ্ত কামনা মুখর হয়। অকাজের আই-ঢাই থেকে বেলোয়ারী, ঠুন্‌কো জিনিষই পয়দা হয়। সহরের হঠাৎ-বড়লোকদের বাংলোর চিম্‌নী যেন! ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা পড়ে,... আরও এক কাপ চা পেলে ভাল হত।

গোয়ালটুলির চৌরাহায় আলো নিবেছে, সূর্য্যের আলো পড়তে দেরী। যাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, তারা এখনও উপস্থিত হয় নি। অত্যন্ত দেরী করে এরা···কিষণচাঁদ কথা অমান্য করে না···হয়ত অত রাত্রে উমাধজীর দেখা পায় নি। খগেন বাবু পলিটিশিয়ান নন, তবু খেটে ভাল নোট লিখলেন। উপকারী জীব··· বুদ্ধিস্বর্ব্বস্ব বলে অভিমান আছে। সন্তুষ্ট রাখলে কাজ পাওয়া যাবে। বিজন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। স্ত্রীলোকটি···স্ত্রীলোক...সাধারণ স্ত্রী...বিজনের আরাম মিলবে ...একটু বিপদ আছে। তখন অন্যত্র সরিয়ে দিলেই চলবে।

'কিষণ চাঁদ।'

'ওস্তাদ! তুমি নিজে একবার চল। লোক রয়েছে, তবে যেন যা চাইছ, তা নয়। উধামজী বলছিলেন, সরকার ভয় পাচ্ছেন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাতে।'

'বাধবেনা। যদি বাধে, সরকার রয়েছেন কি করতে! গুলি ফুরিয়েছে!'

'ওঁরা চালাবেন না।'

'শান্তিপ্রিয়, বুঝেছি। টিয়ার গ্যাস—তাতেও বাধা!'

'জানি না।'

'সাইকেলটা দাও, দেখে আসি কতদূর বন্দোবস্ত হল। সরযূপ্রসাদের পাড়ায় প্রথমে যাব।'

•পথে একটা দোকানে চা খেয়ে সফীক জুহীর পথে একটা মজুর-পল্লীতে হাজির হল। মেয়ে-পুরুষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মিলের ফাটক থেকে হাত পঞ্চাশ দূর পর্য্যন্ত রাস্তায় মজুর নেই, কিন্তু জনকয়েক পালোয়ানের মতন চেহারার

লোক মোটা মাটা লাঠি বগলে রেখে হাতে খয়নি মলছে। মহবুবের সঙ্গে দেখা হতে সফীক প্রশ্ন করলে, 'কি হালচাল ?'

'ভাল নয় ওস্তাদ।'

'শুনেছি। কি করবে ?'

'আগে থাকতে বলতে পারছি না। দেখি, ওরা কি করে ?'

'ওরা ত বেশ এন্তাজাম করেছে! গুণ্ডাগুলো যদি প্রথমেই মারপিট সুরু করে তবে এ-পাড়ার মজুররা ভয়ে পিছিয়ে যাবে। তার পূর্ব্বে যদি হুড় হুড় করে সব মজুর ওদের ঘিরে ফেলে তবে আমাদের সুবিধা। একবার অন্তত জয়ের স্বাদ পেলে আর ভাবি না। এক কাজ কর—তুমি ভিড়ের ঐ দিকটার পাড়ায় যাও, আমি এ দিক্‌টায় ঢুকছি। পাড়ার লোকদের ঝগে যে আরো গুণ্ডা আসছে, তার পূর্ব্বে এদের ঘিরে ফেলা চাই চালাকী করে।'

মহবুব কথামত চলে গেল, সফীক ওভারকোটের কলার নামিয়ে কোমরের বেল্ট এঁটে ঢুকে পড়ল জনতার ডান দিকের পাড়ায়। তাকে যেতে দেখে জনকয়েক লোক ছুটল সঙ্গে। চারপাশে খোলার ঘরের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, যত রাজ্যের ময়লা জমেছে, একটা নর্দ্দমায় পচা জল, সবুজ বুদবুদ ফুটে আছে, দুটো ঘেয়ো কুকুর চেঁচিয়ে উঠল, বেড়াল ছুটে পালাল, মুরগী ও হাঁস চরছে কাদা মেখে, খোলার ঘরে দরজায় চটের ছেঁড়া পর্দ্দা ঝুলছে, ন্যাংটো ছেলে মেয়ের মাথায় পশমী টুপী, গায়ে জামার ওপর জামা, জাঙ্গিয়া নেই কারুর, হামাগুড়ি দিচ্ছে তিনটে বাচ্চা। জন পনের মজুর জমল সফীকের পাশে—পর্দ্দার আড়াল থেকে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছিল।

সফীক বল্লে চেঁচিয়ে, 'তোমরা মরদ না আওরাৎ? ফাটকের সামনে গুণ্ডা জমায়েৎ, লরিভর্ত্তি আরো আসছে, যদি নয়া মজুর আসে তবে তোমাদের খানা-পিনা জুটবে না, যদি গুণ্ডা আসে তবে তোমাদের বিবিদের ইজ্জৎ থাকবে! ওরা মুসলমানদের জেনানা ভেঙ্গে দেবে, আর তোমরা দাঁড়িয়ে সহ্য করবে ?'

একজন মেয়ে মানুষ পর্দ্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল অভদ্র ভাষায়, 'পরশু থেকে আদমী বেহোঁস হয়ে পড়ে রয়েছে, আরো দারু চায়, বলে পিয়াস লেগেছে, আওরাতের সারা অঙ্গে কালসিটে, এ আদমী কোন কাজের লায়েক নয়, বাইরের গুণ্ডা এলে তাদের সঙ্গে ভাঁটিতে যাবে জেনানা ছেড়ে।'

'চুপ্ রহো—চুপ রহো ..'

'কাহে চুপ্ রহুঙ্গী' বলে মেয়েমানুষটি বেরিয়ে এল বোরখা পরে। সফীক তাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'এ আওরাতের কি দশা হবে ভেবেছ···তোমরা এখনই বিহিত কর। তোমাদো সর্দ্দার কে।···নেই! বেশ, এখনই সর্দ্দার ঠিক কর, এটা লড়াই, সর্দ্দার চাই।'

একজন বুড়ো বল্লে, 'এরা যদি চায়, আমি রাজি আছি।'

'তোমরা রাজি আছ ?' তিন চার জন একত্র বলে উঠল, 'খাঁ সাহাব বড় কাবিল আদমি।'

সফীক—'আচ্ছা, খাঁ সাহাব আপনার মতে কি এখন ঘরের ভেতর বসে থাকা উচিত, না বেরিয়ে এসে ফাটকের সামনে যে সব গুণ্ডা জমায়েৎ হয়েছে তাদের তাড়ান উচিৎ ?'

খাঁ সাহেব বল্লে, 'প্রথম থেকেই মার দেওয়া মরদের কাজ।'

স—আপনি যা বলবেন এরা তাই শুনবে, কেমন ?' সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'খাঁ সাযেব, তবে আপনি জন কয়েক বাছা-বাছা লোক নিয়ে ফাটকের দিকে চলুন—জন তিনেক জোয়ান-পাট্টা এইখানে থাকুক—আপনি যাকে যাকে বেছে নেবেন তারাই যাবে, বাকী লোক এখানে থাকবে—আপনিই সর্দ্দার।'

সফীক ছেঁচতলার গলি দিয়ে অন্য পল্লীতে পড়ল।

অত সকাল বেলাতেও কথক ঠাকুর চাঁদোয়ার তলায় ব'সে আছেন। পণ্ডিতজীর গলার মালা শুকিয়েছে, অখণ্ডপাঠ নিশ্চয়। হারমোনিয়াম বেজে উঠল, পণ্ডিতজী গাইতে সুরু করলেন ভাঙ্গা গলায়, তবলার ঠেকা টিমে লয়ে। মধ্যে মধ্যে

পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিচ্ছেন, অযোধ্যায় রামরাজ্যের গুণবর্ণনা, বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, মহারাজ প্রজাবৎসল, ব্রাহ্মণদের গাভী দান করেন, 'যাগযজ্ঞ লেগেই আছে, ভোরের বেলা নহবতে সানাই বাজে। সফীক পাশের লোকের কাণে কাণে বল্লে, 'এ রাজ্যে মিলের ভোঁ'। লোকটা হাসলে। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেই, (এখানে খেতে পায় না) মরাই-ভরা গেঁহু আর যব (এখানে খালি), গোয়াল-ভরা গাই, দুধের দাম দিতে হয় না, (এখানে দুধ মাখন খেতে পাও নাকি হে !), যত পার খাও (যত পার খেটে মর), সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, প্রত্যেকের জমিজরাত, (ভেইয়া, তোমার তালুক থেকে ক' হাজার রূপেয়া ওঠে !) পাশের দু'তিন জন লোক সফীকের টিপ্পনী শুনে মুচকে মুচকে হাসিয়াছিল। সফীক ভাল মানুষের মতন জিজ্ঞাসা করলে, 'পণ্ডিতজী সে সময় জমিদারী ছিল না, লাগান দিতে হত না ?' পণ্ডিতজী থতমত খেয়ে বল্লেন, 'কথার সময় বিরক্ত করিতে নেই, পাপ হয়।' সফীক বিনীত মুখভঙ্গী করে অতিশয় নম্র কণ্ঠে মাপ চাইলে। সামনের জন কয়েক লোক পিছন ফিরে দেখলে। পণ্ডিতজী গান সুরু করতে সফীক এগিয়ে গেল তাঁর সামনে। 'বাঃ বাঃ পণ্ডিতজী, ইয়ে আপিকা কাম। ঠেকা দ্রুত চলছে, পণ্ডিতজী উৎসাহিত হয়ে গাইছেন, সফীক তাল দিচ্ছে সকলে তালি দিতে সুরু করল, সফীক উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে তাল দিতে লাগল, মনে হয় যেন আড়িতে বাজাচ্ছে, লোকগুলো তাল রাখতে পারছে না, ক্রমে যেন তাল ভ্রষ্ট হল, পণ্ডিতজী তবলচিকে ধমকাইলেন, সে তালচিমে করে সিধে ঠেকা দিতে সুরু করলে। সফীক বল্লে, 'ওস্তাদ, জোরসে, ফুর্তিসে বাজাইয়ে।' পঞ্চাশ জোড়া হাতে তখন ঘন ঘন তালি চলছে। পণ্ডিতজী গান থামালে সফীক দশাপ্রাপ্ত ভক্তের মতন মাথা নাড়তে লাগল। 'বা, বা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ...জয় রামচন্দ্রজীকো জয়'—পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

একজন লোক এসে খবর দিলে, 'খাঁ সাহেব লোকজন নিয়ে ফাটকের দিকে গেল, বাইরে থেকেও নাকি গুণ্ডা এসেছে'। সফীক উচ্চ কণ্ঠে বল্লে, 'আমিও শুনেছিলাম বটে আসচে, তারা এরি মধ্যে হাজির হয়েছে ? মুসলমান গুণ্ডা ?

তোমাদের পাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত চাই।' 'নিশ্চয়ই,' জনকয়েক সফীককে ঘিরে দাঁড়াল।

'পঞ্চায়েৎ বানাও, এ পাড়ায় একজন গুণ্ডাকেও ঢুকতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' পঞ্চায়েৎ তৈরী হল তৎক্ষণাৎ। 'এইবার পঞ্চায়েৎ একটা সর্দ্দার খাড়া করুক।' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে সফীক বল্লে, 'কেউ কাউকে বিশ্বাস কর না দেখছি। ও-পাড়ার খাঁ সাহেবের মতন মরদ একজনও তোমাদের ভেতর নেই, অথচ সে হল বুড়ো থুড়থুড়ে।'

'খাঁ সাহেবের কথা দুসরী, সন্ সাতাওয়নের জোয়ান।'

'বেশ পঞ্চায়েৎ বানিয়ে মার খাও সকলে মিলে। যদি না পার, অন্তত পাশে খাঁ সাহেবের পাড়া আর তোমাদের পাঁড়া এককাট্টা করে পাহারা দাও। এস জনকয়েক আমার সঙ্গে।' জন কয়েক ছোকরা সফীকের সঙ্গে চলল। পথে সফীক তাদের বল্লে, 'বড়ই লজ্জার কথা—তোমরা জোয়ান, আর বাইরের লোক এসে কাণপুরের মিলে কাজ করবে, কাণপুরের মজুরদের বাড়ী ঢুকে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে, ঘর দোর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ী অবশ্য তোমাদের নয়...হা, হা, হা...কার বাড়ী কে জ্বালায়...' সঙ্গীরা হেসে উঠল।

'কিন্তু বড়ই লজ্জার কথা।'

'আপনি কি বলেন ?

'আমার ত' মনে হয়, মারপিটে কাজ নেই।'

'নিশ্চয়ই, মারপিটে বহুৎ লোকসান।'

'কিন্তু আমি বলি—না খেতে পেলেও লোকসান। যেই বাইরে থেকে মজুর আসবে তখন তোমাদেরই সর্ব্বনাশ। ওদের আসা বন্ধ করতে হবে। এখন পর্য্যন্ত মাত্র জন কয়েক এসেছে। বেচারীদের দোষ কি! তাদেরও বালবাচ্চা আছে। তাই আমি বলি—ভালয় ভালয় তারা ফিরে যাক্।'

'তাই কখনও যায় !'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'দেখবেন তখন, গলা ধাক্কা না খেলে তারা ভাগবে না।'

'অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মাজী বলেন…'

'তা ঠিক…সত্যাগ্রহ করতে হবে।'

'সত্যাগ্রহ করবে তোমাদের জাতভাইদের বেলা। আর যারা লাঠি নিয়ে যমদুতের মতন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে?'
'তাদের…?'

'আমি ভাবছি তাদের চারধার থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। যেই তারা দেখবে অনেক লোক, তখন তারা ভাগবে নিজে থেকেই।'

'সেই ঠিক—কিন্তু লোক?'

'তার ভাবনা নেই। তোমাদের পাড়ায় ক'জন মরদ?

'পঞ্চাশ-ষাট।'

'খাঁ সাহেবের সঙ্গেও তাই। ঐ রকম আরও শতখানেক চাই। রাস্তার দু'দিক থেকে ঘিরতে হবে। তোমরা এ ধার থেকে যাও, আমি অন্য পাড়ার লোক আনছি।'

সফীক যখন ফাটকের সামনেকার বড় রাস্তায় এল, তখন বিস্তর লোক হাজির হয়েছে। তখনই মহবুব প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে এল। দুটো ভিড় মিশে গেল।

'মহবুব, এ হবে না, সকলেই একদিকে রয়েছে, শতখানেক লোক নিয়ে ওপাশে যেতে পার কাউকে না জানতে দিয়ে? যদি না পার, তুমি ওদিককার পাড়ায় খবর দাও যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই আসছেন, তারা ঝাণ্ডা নিয়ে চলে আসুক, সামনে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তুমি এগুবে, পাশে থাকবে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা, সেইটে আগে রাখবে বড় রাস্তায় পড়লে লাল ঝাণ্ডা সামনে—বুঝেছ?

মহবুব চলে যেতে সফীক এ পাশের ভিড়কে এগিয়ে নিয়ে চলে গেল। সফীক একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের ঝাণ্ডা নেই? লাল ঝাণ্ডা?'

'কংগ্রেসের ঝাণ্ডা আছে।'

'তাই নিয়ে এসো জলদি।' লোকটা ছুটল। সফীক খাঁ সাহেবকে দেখে বল্লে, 'আপনি একবার কষ্ট করে এদের বুঝিয়ে দিন যে মারপিট মজুর পল্লীতে চলবে না, ছুঁচ গলেনা এ-পাড়ায়, লাঠি ত মোটা।' খাঁ সাহেব উত্তর দিলে যে বক্তৃতা তার ধাতে নেই, সে জানে লাঠি ধরতে ছুরি খেলতে।

'আপনি এ-পাড়ার শের—আওয়াজ দিলেই হবে। ভেঁইয়ো, খাঁ সাহেবের কিছু কথা আছে। তোমরা বসে পড়।' সকলে মাটিতে বসল। খাঁ সাহেব বল্লে, 'আমি বুড়ো হয়েছি—এককাল ছিল যখন লাঠির জোরে একা দশ দুষমণের শির ভেঙ্গেছি। এখন পারি না।'

সফীক বল্লে, 'এখনও পারেন, কেঁও ভেঁইয়া, তোমরা ভাবো পারেন না?'

'উনি আবার পারেন না, সেবারকার হাম্‌লায় একা তিন জনকে কে সাবাড় করলে!' 'রহীম যে রহীম অত বড় পালোয়ান, ছুটল খাঁ সাহেবের গণ্ডাশের তয়ে!'

খাঁ সাহেবের মুখে হাসি ফুটল—'ব্যাটা ভারী বদমায়েস ছিল, রামখেলাওয়নের লেড়কীকে নিয়ে ভাগবার মতলব। ব্যাটাকে সমঝে দিলাম, এ-পাড়ায় ও-সব চালাকি চলবে না, বদমায়েসী করতে চাস্ অন্য যায়গায় চলে যা, যতদিন এখানে থাকবি ততদিন চুপচাপ থাক্।'

সফীক নীচু স্বরে বল্লে, 'কিন্তু খাঁ সাহেব, ওরা বাইরে থেকে এনেছে।'

'ভেতবে আসতে পাবে না—এক পা এগিয়েছে কি মরেছে!'

'লরি-ভরা লোক আসছে।'

'আসতে দেওয়া হবে না, আদমীর দেওয়াল উঠবে।'

সফীক জোরে জোরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগল। সকলে বল্লে, 'জরুর, দেওয়াল বন্‌-যায়গা।'

'কিন্তু সামনে?'

খাঁ সাহেব—'সামনেও তাই হবে।'

'নিশ্চয়ই খাঁ সাহেব, তাই ঠিক। কিন্তু ওরা ফাটকের সামনে, পিছন থেকে পুরী হালুয়া কোপ্তা কাবাব আসবে, যতদিন ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকবে, পরোয়া নেই, আর আমাদের যেতে হবে ঘরে খানার জন্য, ঘরে যা খানা আছে তা ত জানি! হা, হা, হা, তবু—আমি বলি, ওদের লোক কম, আমরা বেশী, যদি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই দু'পাশ থেকে ওরা কোণ-ঠেসা হবে, ভয়ে তখন ফাটকের ভেতর পালাবে, তখন ফাটকের সামনে ধন্না দিলেই চলবে।'

'বহুৎ আচ্ছা বেটা!'

'ওদিকের বন্দোবস্ত করে আসছি, আপনি তৈরী থাকুন।'

সফীক ছুটে গলির ভেতর দিয়ে রাস্তার অন্যদিকে পৌঁছুল। মহবুব বিস্তর লোক এনেছে, তারা মন্ত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। সফীক বল্লে, 'এগিয়ে নিয়ে এস সক্কলকে, ওদিকে খাঁ সাহেব তৈরী, জাঁতাকলে পিষে মার। সামনে মুসলমান রাখ, যতজন আছে ততজনেই হবে, তাদের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দাও, তুমি পিছনে থেকো। ওপাশ থেকে এগুচ্ছে দেখলেই তোমরা এগুবে—আদৎ কথা, মুখোমুখি যেন দুটো ভিড় মেশেনা, একটু ত্যারছা ভাবে চোলো, যাতে ফাটকের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ভাবে যে তাদেরই দিকে এগুচ্ছে···বুঝেছ...কিছুতে মুখোমুখি নয়। আমি যাব, না এইখানে থাকব?'

'ওস্তাদ, তুমি এই পাশটায় দেখ, আমি ওধারে যাচ্ছি...এদের মেজাজ ঠিক বুঝতে পারছি না, এসেছে এরা মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করতে, যদি উল্টা বোঝে?'

'সোজাকে উল্টা করতে হবে। মহবুব, তুমি ওদিকে যাও, দেখ যেন ফাটকের দিকেই এগুচ্ছো, দারোয়ানেরা এই সন্দেহই করে।'

মহবুব সরে যাবার পর সফীক পাশের লোককে একটু উঁচু গলাতে বল্লে, 'আমার মনে হয়, মন্ত্রীরা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না। সকাল থেকে আবার মিটিং বসেছে, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে তাদের আসা উচিত নয়।' লোকটি উত্তর দিলে, 'তাঁরা এখনই আসবেন আমি খবর পেয়েছি!'

'পাকা খবর?'

'নিশ্চয়ই, আমার কাছে কাঁচা খবর আসে না।' পাশের লোক হেসে মন্তব্য করলে, 'চৌধুরীর কাছে কাঁচা খবর, কি বলছ ভেইয়া! উনি নিজে ছাপাখানায় কাজ করতেন, এখনও ওঁর জামাই তেল ঢালে।'

সফীক ক্ষমা চাইলে ভুল খবরের জন্য।

'কতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়ান যাবে, তার চেয়ে মিলের দেওয়ালের পাশে ছায়া আছে, সেখানে চৌধুরী সাহেব দাঁড়াবেন চলুন। ঐ যে ও-পাশের লোকেরাও এগুচ্ছে—বা রে! ওরা আবার অত লোক কেন? সে হয় না, আমরা আগে পৌছুব ..কি বলেন, চৌধুরী সাহেব?'

'নিশ্চয়ই, সকলের ছায়াতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়!'

'নিশ্চয়ই, কে আগে ছুটে পৌছুতে পারে! এক, দুই, তিন...'

সফীক একটু দ্রুত ভাবে হাঁটতে সুরু করলে, সঙ্গে চৌধুরী সাহেব, আরো দশজন, কুড়িজন—তাই দেখে ও-পাশের লোকেরাও দ্রুত এগুতে লাগল। যখন দুটোদল প্রায় ফটকের সামনে তখন সফীক এগিয়ে এসে জোর গলায় হেঁকে ফাটকের দারোয়ানদের হুকুম দিলে, 'ভাগো হিঁয়াসে...' ও পাশ থেকে খাঁ সাহেব বল্লেন, 'ভাগো হিঁয়াসে', মহবুব আর সফীক দুজনে প্রহরীদের সামনে এসে বল্লে, 'জলদি ভাগো হিঁয়াসে...'

দারোয়ানদের চোখের পাতা কেঁপে উঠল, হাতের খয়েনি খসে গেল, এক-

জনের গলা থেকে গয়ার ওঠার মত শব্দ হল...চোখের ওপর চোখ রেখে সফীক মুখে হাসি এনে বল্লে, 'দেখছো না ভেঁইয়া, ওরা কেবল ফাটকের সামনে আসতে চায়, ভেতরে ঢুকবে না, তোমরা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে পাহারা দাও... তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না···যাও, এই বেলা ভেতরে যাও, আমি ওদের সামলাচ্ছি ...'

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, 'মারপিট যদি করে, আমরাও পিছপাও না, কি ভাবে আমাদের !'

'ওরা মারপিট করবে না···শীগ্‌গির ভেতরে যাও...এই যে মহবুব···ওদের বল যেন ফাটকের দশ পা দূরে আসে, যাও...রুখে দাও···যাও'...

সফীক দুটো হাত বিস্তৃত করে জন্‌ তিনেক প্রহরীকে ফাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, যেন তাদের রক্ষা করছে। মহবুব দেখতে পেয়ে ছুটে এল...দুজনে মিলে হাত জুড়ল, তাই দেখে দুদল থেকে আরো জন কয়েক হাত জুড়ে বাকী ক'জন প্রহরীকে ভেতরে ঠেলে দিলে। সফীক ছুটে গিয়ে খাঁ সাহেবকে অভিনন্দন জানালে ···'এবার আদমীর দেওয়াল গাঁথুন, রাজমিস্ত্রী...' সফীক চৌধুরীকে খাঁ সাহেবের সামনে টেনে হাজির করে বল্লে. 'চৌধুরী সাহেব বলেন যে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে হলে রাস্তার ওপর হয় না। আপনার কি মত ?'

'নিশ্চয়ই।'

'মহবুব, তুমি না হয় একবার ছুটে যাও, খবর নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আমরা দেখব যেন ফাটকের বাইরে অন্য কোন লোক না আসে। সব বসে যাও। সরকার এলে উঠব, লরি-ভর্তি গুণ্ডা-আর মজুর এলে সত্যাগ্রহ করব।' মহবুব চলে গেল। খাঁ সাহেব ও চৌধুরী উৎসাহের সঙ্গে জনতাকে বসাতে, ওঠাতে, হঠাতে লেগে গেলেন। পানওয়ালা, হুক্কাওয়ালা, জিলেবীওয়ালা ঘুরতে লাগল।

সফীক পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। দু-পেয়ালা চা, দুটো পরেটা খাবার পর একটা বর্মা চুরুট ধরালে। এখনও এরা নাবালক, এক দুই তিন বলতেই

ছোটে, খগেন বাবু চেয়েছিলেন এরা নিজেরাই কর্ত্তা বেছে নেবে, এ-অবস্থায় তা' হয় না, আপাতত পার্টি বাছবে, তারপর দেখা যাবে...এখন কাদা, এঁটোলো মাটি চাই, তবেই এধারে ওধারে টেপো, রূপ পাবে। একমাত্র উপায় বিরোধ, ধাক্কার উপর ধাক্কা···বলে কিনা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বাধবে···চাপা হাসিতে ক্ষণিকের জন্য চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে গেল। কিন্তু যদি বোঝা-পড়া হয়ে যায়, তবে এই জনতা ঝুলে গিয়ে ভিড়ে দাঁড়াবে...সে হয় না। কিন্তু যদি সমঝোতার খবর পাকা হয়, তবে! মজদুরসভা যেন কিছুতে সমঝোতা না করতে দেয়···ভোটে যদি নিষ্পত্তি হয়, তবেই সব যাবে...উধামজীর ওজস্বিনী বক্তৃতায় বাধা টিকবে না। তাঁকে সরান উচিত...কিন্তু কে সরাবে? উপকারী জীব ইতিহাসের শত্রু।

চায়ের দোকানে মহবুব বল্লে, 'সমঝোতা প্রায় হয়ে গেল। শুনছিলাম, মন্ত্রিপক্ষ বলেছেন, ওদের বাদ দিয়ে যদি মিল খোলা হয় তবে ১৪৪ ধারা জাহির হবে। তাইতে মালিকেরা ঘাবড়ে গেছেন। গুজোব এই যে তাঁরা রাজি হয়েছেন মজুর-দের নিতে। শুনে সফীক বর্ম্মা চুরুট ফেলে দিয়ে যাবার সময় বল্লে, 'মন্ত্রীরা আসছেন, তাদের অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়...যতক্ষণ মজুর সভা বোঝাপড়ার সর্ত্ত না নিচ্ছে, ততদিন ফাটকের সামনে সত্যাগ্রহ চলবে···এটুকু পারবে···না তুমিও একটা বোঝা পাড়া করে নেবে? আমি আড্ডায় যাচ্ছি···ঘুমুব।'

মহবুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ...বিড়বিড় করে কাকে গালাগালি দিলে অভদ্র ভাষায়...'আবে শালে...চায়ে লেয়া...'

(৮)

আড্ডায় ফিরে এসে সফীক বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই দেহটা কত সহ্যই না করতে পারে! ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, শান্তি, কোনো কিছুরই অভাব বোধ হয় না। কোথা থেকে শক্তি উৎসারিত হয়ে সকল ক্ষতির পূরণ করে। করিম একদিন বলছিল, লোহা-লক্কড়েরও জান্ আছে, তারাও এলিয়ে পড়ে, খুব খানিকটা ব্যবহারের পর ভয় হয় এই ভাঙ্গল, একটু জিরোন দাও, আবার তাজা হয়ে যায়!

শক্তি কি গোপনে সঞ্চিত থাকে ? করিম অত খেটেছে সারা জীবন ধরে, তার ওপর বাড়ীতে বৌ ও কারখানায় মালিকের আক্রোশ বহন করেছে, তবু সে ভাঙেনি, মচকায়নি, মিল্-কমিটির কাজ সে পুরোদমে চালিয়েছে। তার জোর এল সংঘাত থেকে, নিজেদের তৈরী অনুষ্ঠান থেকে, সক্রিয় জনগণের বিপ্লবেচ্ছা থেকে। তার মতন কর্ম্মীই ভবিষ্যতের ভরসা। আরো কিছুদিন ধর্ম্মঘট চালান যদি সম্ভব হয় তবে মজদুর-সভার বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে সমগ্র মজদুর-শ্রেণীর বুকচেরা অধিনায়কত্ব প্রকাশ পাবে। করিম বুঝবে, অন্যেরা বুঝবে না। তাদের সহানুভূতি ভাববিলাস মাত্র। আজ যদি করিম সমঝোতা না চায়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ খুচরো সুবিধা, সংস্কার আর বোঝাপড়ার আবর্ত্তে নৌকা হাবুডুবু খাবে, ঘাটের কাছে ভরা-ডুবি হবে।

বিজন ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, ব্যাপারটা চুকে গেল মনে হচ্ছে।' একটু যেন বেশী ব্যগ্র, কি যেন ঢাকতে চায়।

সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'নতুন খবর কিছু আছে ?'

বিজন—'গুজোব ত অনেক রকম। তোমার কি ধারণা ?'

সফীক—'তোমার ?'

বিজন—'আমার ধারণা এই অবস্থায়, এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—'

সফীক—'বিপ্লব সাধিত হয় না, বরাবরই এই বলেছি'...কেমন ? তবে তুমি অত ছোটাছুটি কর কেন ? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই পার। খগেন বাবু ও তাঁর সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

বিজন—'ওঁরা প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন। নতুন বাড়ি ঠিক হয়েছে।'

সফীক—'ভাল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যাই হোক, করিমরা যা ভাবে তাই হবে শেষে।'

বিজন—'তবু, তুমি যা বলবে তাই ত' হবে !'

সফীক—'আমাদের কোনো অধিকার নেই ওদের বিপক্ষে যেতে।'

বিজন—'বিনা নেতৃত্বে ওরা সামলাতে পারবে না ভয় হয়। আমরা না হয় বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করলাম, তারপর? আমাদের লড়বার ক্ষমতা অসীম নয়।'

সফীক—'মাত্র বন্ধটুকুই না হয় কর, তারপর দেখা যাবে। কাল রাত্রে কোথায় ছিলে তুমি? ঘষতে ঘষতে বিদ্যুৎ জন্মায়, শক্তিটা বালতীর জল নয়, স্রোতের বহতা...বুঝেছ? শক্তি বাপের সম্পত্তি নয়, অর্জ্জিত ধন। সে যাই হোক, মজুররা ফিরতে চায় বলছ...'

বিজন—'ফিরতে চায় বলছি না···খগেন বাবুর কাছে ঐ ধরণের অনেক কথা শুনেছি, যদিও তিনি বাপ তোলেন না।'

সফীক—'ফিরতে বাধ্য, ফেরা উচিত, একই কথা, মাত্র একটু বেশী খারাপ কথা। তারা কি চায় তুমি বেশী জান, না করিম জানে?'

বিজন—'এক হিসেবে করিম অবশ্য, কিন্তু...'

সফীক—'এর মধ্যে কিন্তু নেই। যা কিছু কিন্তু ঐ মাতব্বরীটুকু ছাড়বার বেলা।'

বিজন সিটিয়ে গেল। সফীক মেজের ওপর থেকে একটা পোড়া বিড়ি তুলে বিজনের গায়ে ছুঁড়ে দিলে...'বিজন, বিড়ি খেতে শেখ হে! পার্থক্য দূর হয়।' করিম ঘরে আসতে সফীক লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলে, 'খবর কি?'

'কাল রাতেই ওরা লোক আনবার মতলবে ছিল, কিন্তু পারে নি। আজ আনবেই ওরা, কারণ, ওরা কাল-পরশু সরকারের কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

বিজন—'সর্ত্তগুলো যদি ভাল হয়, তবু খানিকটা লাভ নয় কি, করিম ভাই?'

করিম—'আরে ভাই, তাই কখনও হয়! এখন গুঁতোর চোটে যাই বলুক না কেন, ছুতো নাতার অভাব হবে না, তখন আবার ধর্ম্মঘট চালাতে হবে। কে-

একজন অফিসার থাকবে শুনছি, প্রথমে তার দরবারে নালিশ করা চাই, তিনি ওদের ডাকবেন, ওদের কথা শুনবেন, তার পর, কতদিন পরে কে জানে, রায় বেরুবে। সে রায় ওরা শুনবে কেন, যদি আমাদের স্বপক্ষে সেটা যায়! অফিসার হবে সায়েব মানুষ, সে ওদের সঙ্গে খানা খাবে, ওদের মেয়েদের সঙ্গে নাচবে··· অর্থাৎ ধর্ম্মঘট বন্ধ হল চিরকালের জন্য।'

সফীক—'কার কাছে শুনলে?'

করিম—'উধামজীর বাড়ীতে ভিড় জমেছে, সেইখানে শুনেছিলাম।

সফীক—'আর কি শুনলে?'

করিম—'উধামজী নাকি বলেছেন যে সরকার চান না যে এখানকার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয় অনবরত সত্যাগ্রহের চোটে। সরকারের মত, দেশের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা, তাকে বাড়ান, এ সবই দেশের কাজ।'

সফীক—'তোমরা কি করবে?'

করিম—'ওস্তাদ, ষ্ট্রাইক করতে পারবো না, এ কেমন কথা! ওরা যাকে ইচ্ছে তাড়াবে আর আমরা বাকি সব ভাল মানুষের মতন কাজ করে যাব—আমরা যেন মেশিন! এ হয় না।'

সফীক—'তোমরা মেশিন কে বল্লে! তোমাদের ভোট আছে যখন, তখন তোমরা মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ! চাকরী গেলেও ভোট থাকবে! তা ছাড়া নতুন জজের কাছে দরখাস্ত দিলেই গোল চুকে গেল!'

করিম—'ও সব আদালতী ব্যাপার আমাদের জানতে বাকী নেই। মোকদ্দমা চালাতে কতদিন লাগে? তাতে খরচ নেই? এই ত' কানুন রয়েছে, দরখাস্ত দেবার পর হাত-পা ভাঙ্গলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকা দেবে। ক'জন দরখাস্ত দেয়, ক'জন পায়, কেন দেয় না, কেন পায় না? অত হাঙ্গামা যদি গরীবরা পোয়াতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না! 'এখন ত' ফাঁসি হোক, পরে আপীলে খালাস পাওয়া যাবে'ভেবে ক'জন ফাঁসিকাঠে গলা দিতে পারে? ও সব আইন আদালত

বুঝি না—অফিসার লোক ওদের এক গেলাসের ইয়ার, ওদের বিবিদের দোস্ত—ওদের হাতে সেই ঘুরে ফিরে পড়তেই হবে। ষ্ট্রাইক করব—সরকার যা ভাবেন ভাবুনগে!' বলতে বলতে করিমের মুখ বেঁকে যায়, দু-হাতের আঙুল ঘোরে যেন কল চালাচ্ছে, চোখ জ্বলে ওঠে, যেন মোটরের হেড-লাইট পড়েছে বন্য জন্তুর চোখে।

সফীক—'এখন কি করবে তোমরা?'

করিম—'তাই-ত' ভাবছি। মজদুর-সভা কি করে দেখা যাক।'

সফীক—'সেখানে আরো অনেকে আছেন ভুলো না।'

করিম—'জানি ওস্তাদ! কিন্তু আমাদের নিজেদের সভার বিপক্ষে ত যেতে পারি না।' বিজন সোল্লাসে সফীকের দিকে চাইল।

সফীক—'কে যেতে বলেছে বিপক্ষে! তবে মজদুর-সভাকে সঙ্গে নিতে হবে, যদি অচল হয় তবে টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।'

করিম—'ওস্তাদ, তুমি নিজে সেই সময় মিটিং-এ থেকো।'

সফীক—'দেখি। তার আগে তোমাদের কোনো কাজ নেই? তোমরা আর লড়তে পারছ না স্বীকার কর।'

করিম—'আমরা খুব পারব। ও কথা মুখে এন না ওস্তাদ, পাপ হবে।'

সফীক—'বিজনের তাই বিশ্বাস।'

বিজন—'আমি কখ্খনও তা বলিনি।'

সফীক—'ঠিক ঐ ভাষা না হোক, অর্থ তাই।'

বিজন—'আমার ধারণা…'

সফীক—'তোমার ধারণা পকেটে তুলে রাখ, সুগন্ধী হবে, তারপর তোমার ভাবী-স্ত্রীকে উপহার দিও।'

বিজন—'ভদ্রমহিলার নাম না হয় নাই আনলে টেনে এখানে!' বিজন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেখে করিম তাকে উদ্দেশ্য করে বল্লে, 'ঘাবড়াচ্ছেন বাবুজী? আমরা পারব।'

বিজন—'পারলেই ভালো'। 'আমরা' কারা ?'

করিম—'আমরা সকলে। কেবল আমাকে নয়, আমার সঙ্গে প্রত্যেককে, শুধু আমি কেন, আমি ত' বুড়ো হয়েছি, প্রত্যেকটি মজুর, যাকে যাকে তাড়ান হয়েছে বিনা কারণে, মজদুর-সভার সঙ্গে যোগ আছে বলে, তাকে তাকে যদি ওর' ফেরৎ না নেয়, তখন দেখবেন বাবুজী আমরা ক'জন !' সফীক করিমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এক কাজ করতে পার ? আচ্ছা, চল আমিই যাচ্ছি। বিজন, তুমি আর খগেন বাবুকে কষ্ট দিও না।' করিম বল্লে, 'বাবুজীও আসুন না।' বিজন জবাব না দিয়ে চলে যাবার পর সফীক আর করিম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সফীক—'আমি একবার তোমাদের মিল-কমিটির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

করিম—'তারা এখন ঠিক জানি না কোথায়, উধামজীর বাড়িতেই পাওয়া যাবে।'

সফীক—'তাই চল। আমি না হয় বাইরে থাকব।' করিম হেসে বল্লে, 'তা বটে, বাইরে থাকাই ভাল, উধামজী আবার উল্টো ভাবতে পারেন।'

উধামজীর বাড়ি গস্ গস্ করছে, বিস্তর মোটর, বনেট্-এ ত্রিবর্ণ জাতীয়পতাকা, একটিতে লাল সালুকের উপর অর্দ্ধচন্দ্র, অন্যটিতে গৈরিক পতাকা, ফাটকের বাইরে সারি সারি টঙ্গা, প্রাঙ্গনে মজুর জনকয়েক। ওপরের বারাণ্ডায় চাঞ্চল্য, চাকরে চা-জলপান সরবরাহ করছে। সিঁড়ি দিয়ে করিম ওপরে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় একজন খাকি-খদ্দরের হাফ্-প্যাণ্ট পরা স্বেচ্ছাসেবক ছুটে লাঠি তেরছা করে পথ আটকাল। এখন দেখা হবে না, আধ ঘণ্টা পরে আসতে বল্লে। ওপরতলার ঘরের পর্দ্দা বাতাসে উড়ছিল, ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'আইয়ে।' স্বেচ্ছাসেবক পথ ছেড়ে দিলে। করিম ভেতরে যেতে উধামজী তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, 'কি খবর ভেইয়া ?'

করিম—'খবর ত' আপনিই দেবেন। খবরের মালিক ত আপনিই।' উধামজী করিমকে নিয়ে বারাণ্ডায় এলেন, চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, চুপি চুপি বল্লেন, অনেক কোশীসের পর জেতা গেছে। এখন তোমার মত কর্ম্মীরা, যারা সত্যকারের কাজের লোক, কেবল বাক্যবাগীশ নয়, বিলেতী বুলি কপচায় না, তোমরা একটু মদৎ দিলেই ফতে। রফী সাহেবের উপস্থিতিটা বড়ই সমীচীন হয়েছে। ওঁরা একটু চা-পান করছেন। কিছু বলবার থাকে আমাকেই বল।'

করিম—'উধামজী, আপনাকে ছাড়া কি ওঁদেরকে বলব! সর্ত্তগুলো কি?'

উধামজী—'সবই একটু বাদে টের পাবে। তবে জেনে রেখো, আমাদেরই জিৎ।'

করিম—'জিৎ কি হিসেবে?'

উধামজী—'যাদের বিনা অজুহাতে তাড়িয়েছিল তাদের ফিরিয়ে নেবে ওরা। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে তোমাকেও আর বাইরে থাকতে হবে না। তবে কাগজপত্র নিয়ে একটু গোল আছে, তোমার। আরে ভাই, রাজি কি হয়! শেষে ভয় দেখান হল, ফ্যাক্টরী জোর করে খুলতে গেলেই ১৪৪ ধারা জারি হবে সহরে। এখন ওপক্ষ মিটিং করেছন সর্ত্তস্বীকারের জন্য। আশা করছি আজকালের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওধারে দেখছ ত' ভেইয়া, টাকা ঠিকমত উঠছে না, তার ওপর একবার দাঙ্গা বাধালেই হল, তখন ঠ্যালা সামলাতে সেই উধামজী!'

করিম—'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, উধামজী?'

উধামজী—'তুমিত ব'লে খালাস। ভাগ্যিস এখনও বাধে নি! তোমরা ফিরে আসছ এই যথেষ্ট. এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।'

করিম—'উধামজী, শুনছি কে একজন অফিসার আসবে যার কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে?'

উধামজী—'সেই কথা চলছে। ওটা একটা বাহানা মাত্র। আদৎ কথা তোমরা।'

করিম—'মাপ করবেন উধামজী, আমি অত-শত বুঝিনা। ওরা গুঁতোর চোটে না হয় আমাদের নেবে, কিন্তু দু'দিন পরে আবার তাড়াবে। তাই মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক আমরা নই, অন্য একটা!'

উধামজী করিমকে বারাণ্ডা থেকে ভেতরে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। 'করিম ভাই, একটু চা দিই, না সে কিছুতেই হয় না।' হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে করিম বল্লে, 'দেখুন বাবু সায়েব, ব্যাপারটা সুবিধে নয় মনে হচ্ছে।'

উধামজী—'কেন, কেন, কেন? তুমি ভাবছ অধিকারের কথা, কিন্তু আমাদের লড়াইএর কারণটা কি? জনকয়েককে তাড়িয়েছিল ওরা, আমরা বল্লাম, তা হবে না, নিতেই হবে ফিরিয়ে। রাজি কি হয়! কত ধ্বস্তাধ্বস্তিই না চলল, সে কি বলব! আর যাতে কথায় কথায় বরখাস্ত না হয় তার বন্দোবস্ত পাকা না করে আমরা ছাড়ছি না।'

করিম—'ওরা যা করত তাই করবে।' উধামজী হো-হো করে হাসতে লাগলেন, হাসি আর থামে না, সর্ব্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতি অঙ্গ নাচতে থাকে, মাথা পিছন দিকে ঝোঁকে, দুটো হাত ওপরে ওঠে, মুখের মধ্যে সোনাবাঁধান দাঁত চোখে পড়ে, তাতেও পানের কালো ছোপ, হঠাৎ হাত দুটো হাঁটুর উপর এল, দেহ কুঁজো হল, হাসির গর্‌রায় করিম অপ্রস্তুত! উধামজী সোজা হয়ে উঠে বল্লেন, 'ভেইয়া, ও-টুকু বিশ্বাস হল না আমাকে? আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, হাওয়া বদ্‌লেছে এ-টুকু বুঝি। আর, বাছাধনেরাও বোঝে। কিন্তু, করিম ভাই, একটা প্রশ্ন করি তোমাকে…এত অধিকার শিখলে কোত্থেকে? ও-সব এখন রেখে দাও। অধিকার কি ভাই হাওয়ায় ঝোলে? ও-সব পণ্ডিতী বিলেতী বোলচাল তোমার আমার মুখে শোভা পায় না।'

করিম—'অধিকারটা ওদেরই রইল তবে?'

উধামজী—'মোটেই না। অবশ্য কথাটা উঠেছিল বটে, কিন্তু প্যাঁচ কাটান গেছে। আমি বল্লাম, সরকার যে নতুন অফিসার নিযুক্ত করবেন তাঁরই হাতে ভার দেওয়া হোক!'

করিম—'কিসের ভার? তিনি ত' দাঁড়াবার আগে নয়, পরে শোচ-বিচার করে রায় দেবেন? তার পর, তাঁর রায় গ্রহণ করা ওদের মর্জ্জি। এ যেন কি রকম লাগছে।'

উধামজী—'ভাই, আমারও কি ভাল লাগে! কিন্তু এধারে দেখছ ত! আমরা কতদিন চালাতে পারব তার ঠিকানা নেই। ওরা খুব জব্দ হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের অবস্থাও ত' সঙ্গীন, সেটা আমি জানি, টাকা তুলতে হয় সেই আমাকেই। অন্য অন্যবার একজন না একজন মালিকের কাছে মোটা টাকা পাওয়া গেছে, এবার একজনও উপুড়হস্ত করলে না। জব্দ যখন ওরা হয়েছে, আমরা যখন জিতেছি, ব্যস্...করিমভাই, ভেতরে চল, তোমার মতন লোককে মন্ত্রীরা দেখলে খুশীই হবেনা। তোমরাই ভারতমাতার কৃতী সন্তান...তোমরাই···সত্যি বলছি ভাই, তোমরাই···মা এখনও উর্ব্বরা···একধারে মহাত্মাজী অন্যধারে তোমরা...দুপাশ থেকে দু'হাত ধ'রে তোমরা মা-কে এগিয়ে নিয়ে চলেছ অন্ধকার পথে···তোমাদের আঁখির রোশনীতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হল···সেই আলোয় আঁধেরা পালাল···না, না, সে হয় না, করিমভাই···অবশ্য কাজ যদি থাকে তবে অন্য কথা...তোমার সঙ্গে আমার কোনো তকল্লুফ্ নেই...তবে ভাই একটি অনুরোধ রাখতেই হবে···আজকের সভায় হাজির থেকো। হয়ত' তোমাকেও কিছু বলতে হবে।'

করিম—'বাইরের মিটিংএ কিছুই হবে না, যতক্ষণ না মজদুর-সভায় ঠিক হয়।'

উধামজী—'নিশ্চয়ই, মজদুর-সভার সকলেই সেই সভায় থাকবে। তোমরা কি ভাবছ যে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঝাপড়া করছি? না, তা কখনও হয়! আমি থাকতে সেটা অসম্ভব জেনে রেখো। তবে, কেবল মজদুর-সভা কেন? তোমাদের মদৎ কি সহরশুদ্ধ লোকে দেয় নি? তাদের বাদ দিলে তারা কি ভাববে? সেটা কি আমাদেরই ভাল হবে?'

করিম—'আগে মজদুর-সভা মেনে নিক্, তারপর সাধারণ মিটিং হোক্।'

উধামজী—'চমৎকার কথা! কিন্তু স্বীকার করছি ভাই, এর মধ্যে আমাদের

একটু চাল আছে। মন্ত্রীপক্ষ থাকতে থাকতে ওদের আটকে ফেলতে চাই। ও-পক্ষকেও সেখানে আনব, ওদের মুখ দিয়ে কথা বা'র করিয়ে নেবো।'

করিম এবার হেসে ফেলে মাথা নাড়তে লাগল। উধামজী বল্লে, 'দেখই না, করিম ভাই, যাতে হাত দিয়েছি সেটা কখনও ফস্‌কেছে ? তুমিই বল, গুমোর করছি না। আমরা ত' পিছনে আছিই। যদি ওরা অমান্য করে তবে এবার শেষ-দেখা দেখে নেবো। তুমি কি ভাব ওরা এতই বোকা যে এই সোজা কথাটা ওদের মাথায় ঢোকে নি ? কথাবার্ত্তার সময় যদি একবার ওদের মুখভঙ্গি দেখতে ! ভাঙ্গবে ত' মচকাবে না !' উধামজী ওদের মুখভঙ্গী অনুকরণ করিলেন। করিম গম্ভীর হয়ে বল্লে, 'যদি পিছনেই আছেন সর্ব্বদা, তবে মজদুর-সভাকে আগেই থাকতে দিন।' উধামজী ব্যস্ত হয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'এখনই হাজির হচ্ছি, আভি...করিম-ভাই, একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—সরকারের সহানুভূতিটা ফেলে দেবার জিনিষ নয়, কংগ্রেস একসঙ্গে কজনের সঙ্গে লড়বে !' উধামজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিমকে উঠানে পৌঁছে দিলেন ; উঠানে জনকয়েক মজুর দাঁড়িয়ে রয়েছে, উধামজী তাদের কাঁধে হাত দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। করিম বেরিয়ে এল। উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও হাসির রেশ অনেকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলল।

ফাটকের বাইরেই মহবুবের সঙ্গে দেখা। মহবুব বল্লে, 'ব্যাপার সুবিধের নয়। যদিও গুণ্ডারা এখন ফাটকের ভেতর, তবু নরিভর্ত্তি লোক আসবে আজই, চুক্তির আগেই।' দুজনে ছুটল সফীকের কাছে। পথে করিম অন্য দুজন মজুরকে সঙ্গে নিলে। তারাও মিল্-কমিটির মেম্বর—বিতাড়িত। সফীক একটা ল্যাম্প পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। সফীক খবর জানবার ইঙ্গিত করাতে করিম বল্লে, 'ওস্তাদ, যা শুনেছ তাই ঠিক, তবে ও-পক্ষ এখনও মত দেয়নি। উধামজী আশায় আছেন যে ওরা মেনে নেবে, আমরাও।' সফীক খানিক নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'এরা ত' মিল্-কমিটির লোক, এদের বক্তব্য শোনা যাক।' একজন বল্লে, 'করিম-ভাই ভাল করেই জানে যে এ-বন্দোবস্ত চলবে না।' কণ্ঠে উষ্মা এনে সফীক মন্তব্য

করলে, 'করিমভাইকে ছাড়, তোমাদের কি বিশ্বাস?' উত্তর এল—'এ কখনও হয়!'

সফীক—'যদি না কখনও সম্ভব হয় তবে সমঝোতা মেনে নিতে অত ব্যগ্র কেন?' করিম তাদের হয়ে জবাব দিলে—'ব্যগ্র নই, ওস্তাদ। তবে একটা দিক আছে—আমরা যদি ঝাগড়া দিই তবে উধামজী ও তাঁর দলের লোককে পাওয়া শক্ত হবে।'

সফীক—'কথাবার্ত্তায় তাই বুঝলে?'

করিম—'অনেকটা তাই। উধামজী বলছিলেন যে একটা বড় মিটিং হবে, সেখানে আমাদের মত নেবেন।'

সফীক—'মত! সাধারণ সভায় মত! অর্থাৎ. তিনি যা বলবেন তাই ঠিক!'

করিম—'বড় মিটিং বুঝি না। মজদুর-সভা যদি সায় দেয় তবেই আমরা ধর্ম্মঘট তুলে নেবো—আমি সাফ্ বলে দিয়েছি।'

সফীক—'তিনি কি বল্লেন?'

করিম—'কংগ্রেস ক'জনের সঙ্গে লড়বে!'

সফীক—'তাই বুঝি এক হাত খালি রাখতে চান, ভোট কুড়োবার জন্যে? ভুল, ভুল, ভুল...'

করিম—'কার ভুল?'

সফীক—'তোমাদের, আমাদের...তাঁরা বাধ্য আমাদের তরফে আসতে। যদি ধর তোমরা বোঝাপড়া না মেনে ষ্ট্রাইক জোরসে চালাও তবে কি ভাব যে ওঁরা জবরদস্তী করে ভেঙ্গে দেবেন?'

মহবুব—'বোম্বাইএ কি ঘটেছে, ওস্তাদ?'

সফীক—'বোম্বাই আর এদেশ এক নয়। ওখানকার মিলওয়ালাদের শক্তি বেশী, তারা পুরানো, খানদানী, ওখানকার সাধারণ লোক ব্যবসায়ী, এরা নাবালক, এদের সমর্থন কম দেশের জনমতে। মারতে হয় ত' ছোট বেলাতেই...ওরা যেমন তোমাদের পাকড়ায় ছোট বেলাতেই...শত্রুর বয়োবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়!' গলার

আওয়াজ ঢিলে করে সফীক বল্লে, ‘আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার আমাদের ত্যাগ করতে পারবে না, এখানকার কংগ্রেস অন্য জাতের নয় কি? হয়ত, আমারই ভুল...কিন্তু ষ্ট্রাইক করতে পারব না, এ-কেমন কথা!’

মহবুব—‘নোটিশ দিতে হবে একমাসের—এই গুজোব।’

সফীক—‘নোটিশ! ওরা নোটিশ দিয়ে লোক তাড়ায়? নোটিশ দিয়ে কাজ কমায়? নোটিশ দিয়ে মাইনে কাটে? নোটিশ দিয়ে নতুন কল আনে? নোটিশ!’

মহবুব—‘নোটিশ দেওয়া হবে না।’

সফীক—‘হবে না ত’ বলছ! কাজে কি দেখাচ্ছ?’

করিম—‘মজদুর-সভা যা বলবে তাই হবে।’

সফীক—‘শুনেছি। আমিও আবার বলি, তুমি কি জান না মজদুর-সভা কাদের হাতে এখনও?’

করিম—‘জানি। কিন্তু আজ যদি মজদুর-সভাকেও উড়িয়ে দিই, তবে ওরা পেয়ে বসবে ’

সফীক—‘কে অস্বীকার করছে! কিন্তু ষ্ট্রাইক করতে পারব না, এ-কেমন ব্যবস্থা! এ-যে মজদুর-সভার গোড়ায় কোপ্। ষ্ট্রাইক চলুক। ওরা আজ হেস্ত-নেস্ত করবেই।’

’মহবুর—‘আমিও সে খবর পেয়েছি। আজ লরিবোঝাই লোক আসছে!’

সফীক—‘চল, ঐ ধারে যাই। লোক আনা বন্ধ হোক ত’ আগে, দেখি কি হয় তারপর!’ কলে জুহীর দিকে চলল।

কলের ফাটকের সামনে লোক জটলা করছে, দারোয়ানরা বাইরে আসতে পায় নি। খাঁ-সাহেব সফীককে দেখে এগিয়ে এল। খাঁ-সাহেব ফাটকের সামনে থেকে এক পাও নড়েনি, সেইখানেই বসে খাওয়া দাওয়া করছে, পাশে বদনা, হুঁকো হাঁড়া, সানকী। সফীক হেসে জিজ্ঞাসা করলে, ‘এ-যে দাওয়াৎ দিয়েছেন, খাঁ-সাহেব! আহা, আগে যদি টের পেতাম!’

খাঁ-সাহেব উত্তর দিলে, 'পেট না ভরালে কি কাজ পাওয়া যায়? ফাটক ছেড়ে যেতেও পারি না, একলা বসে খেতেও পারি না। বেচারা চৌধুরীর বাড়ীতে বিপদ, তাই আমাকে তদারক করতে হচ্ছে। চৌধুরীর বাচ্চার খুব অসুখ, কি-সব বিলিতি দাওয়াই খাইয়েছে! এত করে বল্লাম হকিম ডাক, তা শুনলে না কিছুতে!'

সফীক চৌধুরীর পাড়ায় ঢুকল। একজন বুড়ি কাঁদছে চৌধুরীর দরজার বাইরে, চার-পাশে মেয়েরা ঘোমটার ভেতর থেকে ফোঁপাচ্ছে, বুড়ি নিজের কপালে হাতের ভারী বালা ঠুকল, রক্ত বেরুল, পাশের মেয়েরা হায় হায় করে হাত চেপে ধরলে, যত চেপে ধরে বুড়ি তত হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, পাশের চালা থেকে অন্য মেয়েরা উঁকি দিতে লাগল, একজন বয়স্থা এগিয়ে আসতে বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'এখান থেকে ভাগ, আমার সামনে আসিস নি, তুই ত' বল্লি তাই বিলিতি দাওয়াই, অভদ্র ভাষার আওয়াজে চৌধুরী বেরিয়ে এসে বুড়িকে ধমকালে। সফীককে চৌধুরী বল্লে, 'রোগীর শ্বাস উঠছে, তিন সপ্তা ভুগছে যখন, তখন পাড়ার লোকে পরামর্শ দিলে কলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে, বিলেতী দাওয়াই খেয়ে কিছুই ফল হল না, উলটে খারাপ হয়ে গেল।'

সফীক—'কলের ডাক্তার যেন আপনার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিচ্ছে! সে ত' লাল দাওয়াই দিয়েই মাইনে পাবে!' একজন মেয়ে কেঁদে উঠল…'হায় হায় …এক এক করে চারটি গেল।' চৌধুরীর চোখে জল,…বুড়ি চেঁচাতে লাগল, বিষ… লাল বিষ…' চৌধুরী বল্লে, 'কেনই বা নিজে বিলিতী দাওয়াই খাওয়ালাম।' সফীক চৌধুরীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা জানালে, 'বিলিতী দাওয়াইএর দোষ কি! তাই খেয়ে হাজার লোক সারছে…যারা দিয়েছে পাপ তাদের…তাদের কি মাথা ব্যথা যে একটী মজুরের ছেলে বাঁচে কি মরে! সাহেব ডাক্তার? সে ত' আরো মজা! এই সময় সত্যাগ্রহের ফলে ওদের ক্ষতি চলছে, এখন কি চৌধুরী সাহেব ওদের হাতের কোনো জিনিষ নিতে আছে।' 'বিষ দিয়েছে'…'খোকার মুখ নীল হয়ে গেল'…

ছেঁচ্‌তলা দিয়ে পাড়ার মেয়েরা একে একে এসে বাড়ীর ভেতর গেল...ফোঁস ফোঁস কান্নার মধ্যে ফিস্ ফিস্ কথা 'বিষ···বিলিতী বিষ···'চৌধুরী ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়াতে সফীক তাকে তুলে বাড়ীর ভেতর ঠেলে দিলে।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই বিজনের সঙ্গে দেখা ..'তুমি?'

বিজন—'খবর এসেছে, লরি বোঝাই লোক আসবে।'

সফীক—'তাই নাকি!'

বিজন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বল্লে, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?' সফীক উত্তর দিল না, খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, 'আজ দেখাতে হবে সন্ সাতাওনের জোয়ান কোন চীজে তৈরী।' খাঁ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিলে, 'আরে ভাই, সেদিন আর নেই, তবে, আমি থাকতে মারপিট হবে না।'

সফীক—'এবার হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা নয়। মিলওয়ালারা লরি করে লোক আনছে, তারা এসে পড়লে যারা ধর্ম্মঘট করেছে তাদের অন্ন যাবে।'

খাঁ—'তবে যে শুনলাম মিটমাট হয়ে গেল!'

সফীক—'এখনও হয় নি। তার আগে ওরা নিজেদের লোক এনে ফেলতে চায়, যাতে পরে আর আমরা আসতে পারব না কিছুতে। সব ভুখায় মরবে।'

খাঁ—'যারা লড়তে না পারে তাদের বেঁচে লাভ কি!' করিম এসে পাশে দাঁড়াতে খাঁ সাহেব থতমত খেয়ে গেল। সফীক বল্লে, 'সত্যিই তাই, খাঁ সাহেব, লড়তে হবে। কিন্তু লড়বার জন্যও ত' খানা চাই, তাই যদি যায় তবে হাওয়া খেয়ে কতদিন বাঁচবে মানুষে, বাল-বাচ্ছা নিয়ে। কি বল, করিম?'

করিম—'আমি আর কি বলব! ভাবছি কেবল ওদের বেইমানির দৌড় কতটা। এধারে বোঝা-পড়া চলেছে, অন্যধারে রাতারাতি লোক আনা!' খাঁ-সাহেব তীব্র-স্বরে বলে উঠল, 'আমিও তাই ভাবছি। এমন বেইমানি বরদাস্ত হয় না।'

সফীক—'বেইমানি কেন, খাঁ সায়েব? আমার মিল্ থাক্‌লে আমিও তাই

করতাম্। ইমান্ কোথায়, কার সঙ্গে? যাদের ইজ্জত নেই তাদের সঙ্গে ইমান!'

খাঁ সায়েবের চোখে আগুণ। 'কভি নেই হোগা!' ব'লে খাঁ সায়েব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বার্দ্ধক্যের কোনো লক্ষণ নেই, কোমর সোজা, হাতের পেশী শক্ত, মুখের চামড়া নিটোল, দীর্ঘ পুরুষ, পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেহের ভারে মাটিকে যেন চেপে মারছে। 'বেইমান, বেইমান, খানা চায় কোন্ এই বেইমানদের হাত থেকে!' বিজন তার মূর্ত্তি দেখে সন্ত্রস্ত হল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মহল্লাময় প্রচার হয়ে গেল যে এখনই লরিভর্ত্তি বাইরের গুণ্ডা জোর করে মিলের মধ্যে ঢুকবে। চৌধুরীর পাড়ার লোক বেশী এল না, তারা মড়া নিয়ে ব্যস্ত। খাঁ সাহেব উপস্থিত লোক থেকে জনকয়েক জোয়ান বেছে নিয়ে বাকী লোকদের প্রতি হুকুম দিলে যেন তারা বাড়ি থেকে খেয়ে তখনই চলে আসে। খাঁ সাহেবের আদেশে রাস্তার ওপর লোকেরা শুয়ে :পড়ল। সফীক একবার বল্লে, 'খাঁ সায়েব, ঐ ধার থেকে লরি আসবে বলে মনে হচ্ছে, প্রথমেই মেয়েদের রাখলে হয় না?' খাঁ সায়েবের তাতে আপত্তি, তাঁর মতে আওরাত কোথাও না থাকাই ভাল এক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে জনকয়েক ছোকরা মেয়েদের পাশে বসে পড়তে খাঁ সায়েব তাদের তাড়া ক'রে গেল—'ভাগ্ হিঁয়াসে ভাগ্।' সফীক মিনতি জানালে 'খাঁ সায়েব, আপনার মতন বীরের কি জাত থাকবে না?' 'জাত! সব বদ্‌জাত ব্যাটারা···হাতে তলোয়ার ধরবে ওরা! যে হাতে বিঁড়ি ফোঁকে!' খাঁ সায়েব একটু কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করাতে সফীক হেসে উঠল, ছেলেরাও হাসল, মেয়েরাও ...খাঁ সায়েব তখন বল্লে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে লেট্ যা...যা অর্ডার দেব শুনতে হবে, একদম উঠতে পাবি না, জমির সঙ্গে মিলিয়ে থাকবি, ঘাবড়েছিস ত' মরেছিস আমার হাতে, জানিস ত! আওরাতদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে পারবি না বলে দিলাম, আমার চোখ এড়াতে পারবি না···লেট্ যা।' লেট্ যা, লেট্ যা কলরব করতে করতে ছোকরারা শুয়ে পড়ল। 'মেয়েরা ফাটকের সামনে যেন যাস নি, ভেতরের দারোয়ান

হঠাৎ ফাটকখুলে ধরে নিয়ে যাবে। দু'চারটে বদমাস মাগীকে এখানে রাখলে হত। হুঁ, তারা কি এসেছে! আদমীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার ফন্দী আঁটছে রসুইখানার ভেতরে।' খাঁ সায়েব ঘৃণাভরে থুতু ফেলে ফরসীর নল মুখে নিলে।

সফীক একটা চায়ের দোকানে ঢুকল, সঙ্গে বিজন...চায়ের দোকানে বিজলী বাতি জলছে, ধূলোর অবডালে হলুদে দেখায়...বিজ্ঞাপন ঝুলছে, 'চা খাও, উপ্‌রি রোজগার কর।' মহবুব এল চায়ের দোকানে। বিজনকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কদিন দেখি নি বড়!' সফীক বল্লে, 'মেহ্‌মান এসেছে জানই ত! তাদের জন্য বাড়ী খুঁজছিল। আচ্ছা, বিজন, মহবুবকে চা-এর প্রসার হল কি করে বলেছ? সে ভারি মজা...প্রথমে বিনা পয়সায় বিতরণ, তার পর দো-দো পয়সা, এখন শুনেছি এক টাকার উপর পাউণ্ড...না আরো বেশী, বিজন?'

বিজন উত্তর দিল না।

মহবুব—'আরেকজন ছিল না খাঁ সাহেবের সঙ্গে?'

সফীক—'চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ। তার বাচ্ছা মরেছে...বেচারা...বিজন, শিশুমৃত্যুর হার কত কাণপুরে?'

বিজন—'ভারতবর্ষে যত সহর আছে তার মধ্যে প্রায় সব চেয়ে বেশী, কিন্তু বাঁচবার আশাটাও ধরতে হয়! সেটা জন্মালেই সাড়ে চব্বিশ।'

সফীক—'বাঁচা গেল! অতদিন আর ভুগতে হল না। সংখ্যায় সান্ত্বনা পাওয়া যায়। বিজন, চা-বাগানের কুলীরা কত পায়?'

বিজন—'টাকার দিক থেকে এখানকার চেয়ে কম, কিন্তু অন্য সুবিধা বেশী।'

সফীক—'নিশ্চয়ই, সস্তায় চা, তাতে ক্ষিদে কমে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে, যেমন ধর কোলকাতার বাবুদের। মহবুব, ওরা কখন লাস নিয়ে বেরুবে? এই যে কিষণচাঁদ! ভাবছিলাম, তোমারও কি মেহ্‌মান এল? কিষণ, তুমি ত হিন্দু, তোমাদের মশান ঘাটের রাস্তা কোথা?'

কিষণ—'ফ্যাক্টরীর দরজার ভেতর দিয়ে।'

সকলে হেসে উঠল। সফীক বর্মা চুরুট ধরালে, ঠিক মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, ছিদ আছে নিশ্চয়, থুতু দিলে সেখানে, তবু ধোঁয়া আসছে না, টানলেও ধোঁয়া বেরোয় না, একটা দিকমাত্র ধরেছে, আঙুল দিয়ে ছিদ চাপতে নীল ধোঁয়া সরল রেখায় ওপরে উঠল, ধোঁয়ার মাথা সাপের মতন বেঁকে যায়, একটা চোখ বুজে সফীক টানতে থাকে, ঘোরাতে ঘোরাতে সিগারের মাথা গোল হয়ে ধরে ওঠে। বিজনের দিকে এক চোখে চেয়ে সফীক বল্লে, 'একবার দেখে এস দিকিন ফাটকের সামনেটা, সকলে শুয়ে আছে কি না। এখানে হুজ্জোত হবে, তুমি··· তোমার কি থাকবার প্রয়োজন আছে ?'

বিজন—'আমার বিশ্বাস, আছে। এখনই আসছি।' বিজন চলে যাবার পর সফীক উঠে এসে মহবুবের পাশে বসল, কিষণকে কাছে ডাকলে। সিগার টানতে টানতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'মশানের রাস্তা কোন্ দিকে ?'

কিষণ—'এই ধার দিয়েই যেতে হয়।'

সফীক—'অন্য পথ আছে ?'

কিষণ—'বস্তী থেকে গলি বেরিয়েছে অনেক, কিন্তু বড় রাস্তায় না এসে উপায় নেই।'

সফীক—'মধ্যে মধ্যে ভগবান মানতে ইচ্ছে হয়। ভাল, ভাল, মড়ার রাস্তা আর কুলী মজুরের সড়ক এক হওয়াই উচিত।'

মহবুব—'সেই সড়ক দিয়ে আবার বড় সাহেবের মোটর যায়।'

সফীক—'তোমাদের ষ্ট্রাইক ভাঙ্গারও লরি আসে। কিষণ, কিষণ, তুমি চৌধুরীর পাড়ায় যাও। একটু মদৎ দাও...ছাখ, শোন যা বলছি...লাস নিয়ে তুমি বেরুবে, তুমি হিন্দু, আপত্তি হবে না, একটু ছোটখাট শোভাযাত্রা করলে হয় না ? খাট বইবে তুমি। যখন খবর দেবো তখন এই বড় রাস্তায় আসবে, বুঝেছ ?' সফীক সিগার টানতে লাগল নীরবে।

বিজন এল। কিষণ বল্লে, 'বিজনও চলুক না ?'

বিজন—'কোথায় ?'

কিষণ—'পাড়ায় চৌধুরী সাহেবের বাচ্চার স্বর্গলাভ হয়েছে, ওস্তাদ চাইছেন একটা ছোটখাট শোকযাত্রা।'

বিজন—'এ-সময়! এখানে আমার যদি কোন কাজ না থাকে, ওস্তাদের মতে, তবে যাব।'

সফীক—'তুমি যাবে? যাও!'

বিজন—'ওধারে লরি কখন এসে পড়বে হুড়মুড় করে তার ঠিকানা নেই, আর এখন শোকযাত্রা!'

সফীক—'ওটা সীম্বলিক্, যাওই না...জিনিষটাকে একটা উঁচু স্তরে তোলা দরকার, ফুল-টুল পাওয়া অসম্ভব? একটু আর্টের পরশ না হয় এল! ক্ষতি কি? যা বলছি, তাই শোনো, যাও।'

কিষণ ও বিজন চলে গেল।

কানপুর সহর থেকে পিচ্ ঢালা রাস্তা বরাবর এসেছে রেল-লাইনের ব্রীজের তলা দিয়ে। বেশ খানিকটা ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়। রাস্তার দু-পাশে লম্বা খাম্বা, সাদা-কালো দাগ নীচের দিকে, বাঁকের মুখে ও চড়াইএ মোটর যেন ধাক্কা না খায় তাই। তীব্র আলো রাস্তার উপর, দু-পাশে বস্তী, মাটির তেলের ডিবে জ্বল্-জ্বল্ করে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামল ধোঁয়ার ওপর, বিজলী বাতির জোর কমল, বস্তীর আলো খুলল। রাস্তার আলো আজ যেন নিষ্প্রভ, কমতে কমতে নিভে যাবার সামিল। বিজলী ঘরেও কি হরতাল সুরু হয়েছে? ওখানকার মজুরদের বাগানো যায় না সহজে, বলে, অবস্থা ভিন্ন। ভিন্ন কোথায়? একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ, একই চাপের পেষাই, একই দারিদ্র্যের সাম্য, না খেতে পেলে একই রকমেই যন্ত্রণা, রোগে একই ব্যবস্থা, ম'লে সেই একই মাটি আর আগুন। 'সমস্যা-গুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে জীবনটাই টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেল। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণ এক—এই মোটা কথাটা ধরা শক্ত বটে, কিন্তু বাঁচতে যাবার, তার উপায়

আবিষ্কারের পন্থার ঐক্যটা ধরাও কি কঠিন? চৌধুরী আর খাঁ সাহেবের ধাত আলাদা, কিন্তু দু'জনেই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে চায়। চৌধুরীটা অকর্ম্মণ্য...ছেলে মরেছে বলে একেবারে ঘাবড়ে গেছে। ছেলে মরেছে এই জন্য কি চন্দ্র উঠবে না, সহরে ধূলো উড়বে না, মাঠে ফসল ফলবে না, গাছে নতুন পাতা গজাবে না, কল চলবে না, কর্ত্তাদের মুনাফায় ঘাঁটতি পড়বে, সত্যাগ্রহ ধর্ম্মঘট থেমে যাবে! সফীকের হাঁপ লাগে···বুকটা দুর্ব্বল রয়েই গেল...থামতে পারে না লড়াই···যারা জীবন দিয়ে লড়বে না তারা অন্য কিছু দিয়ে লড়ুক···অত সহজে ছাড়ন নেই···বিজন দুর্ব্বল, অপদার্থ, মানুষ হবে কি ক'রে; খিদের কামড় নেই, উল্টে আদর আছে, ভাবিজীর কাছে···সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায় ভাবতে স্ত্রীলোকের অ-মানুষ করবার অসীম ক্ষমতা। নিজের কখনও প্রয়োজন হয় নি নরম হাতের সেবার···হাঁসপাতালে নার্সকে দেহ ছুঁতে দেয় নি। রিলীফ-ম্যাপের মতন একই স্তরে সমগ্র অতীত প্রলম্বিত হয়, সমতলভূমি···উঁচু নীচু খাঁজ খন্দর বাঁকা চোরা নেই... স্ত্রীলোকের কোনো উল্লেখ নেই, নেহাৎ সাদামাটা তামার পাত, কেবল গরম, কুঁচকে গেল হঠাৎ, একটা যেন চোঁয়া...তার ভেতর দিয়ে কেবল দূরের জিনিষ দেখা যায়। গড়ান রাস্তার নীচ চেকে দুটো চোখ ধীরে ধীরে উঠছে।

'লরি আরহি···লরি আরহি'। সফীক বল্লে, 'মহবুব, কিষণকে শীগ্‌গির লাস নিয়ে এখানে আসতে বল। যেন পাঁচ মিনিটের বেশী না লাগে। খাটিয়ার ওপর চাপিয়ে নিয়ে এস···আর কিছুই চাই না···দু'চার জন লোক থাকলে সুবিধে হয়, বুঝেছ?' মহবুব ছুটল। 'লরি আরহি, আরহি...' রাস্তায় যারা শুয়েছিল তারা উঠে পড়ছে দেখে সফীক খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 'উঠলেই সর্ব্বনাশ···' খাঁ সাহেব ঘাড় ধরে দু-এক জনকে শুইয়ে দিলে। অন্যেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে লাগল। সফীক মাথার দিক থেকে গিয়ে পায়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এল। প্রায় শত খানেক লোক রাস্তায় শুয়েছে। 'খাঁ সাহেব, এদের একটু ওপাশে সরালে হয় না? যাতে ফটকের সামনেও লোক থাকে? যদি ফাটক খুলে ভেতরের দারোয়ানরা বেরিয়ে পড়ে?'

'ওখানে কোনো দরকার নেই। ঘাবড়াচ্ছ কেন? একবার দেখে আসছি।' খাঁ সাহেব ফাটকের সামনে গিয়ে হাঁক দিলে, 'যদি দরজা খোলা হয় তবে একটা লোক আর আস্ত থাকবে না।' খাঁ সাহেব ফিরে এসে শোয়া লোকদের পায়ের দিকে দাঁড়াল। হাতে লাঠি রয়েছে। সফীক বল্লে, 'ওর দরকার হবে না, খাঁ সাহেব, ওটা আমাকে দিন।'

'কেঁও জী? লাঠিতে আমার হাত দিও না। ম্যয় কভি নেহি ছোড়ুঙ্গা।'

জোড়া কয়েক চোখ গড়ান রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠছে। আলো কম, প্রাইভেট কার্? তদারক করতে এসেছে? গলির ভেতর থেকে ছোট খাট বেরুল ..'রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সত্য হায় সত্য হায়, রাম নাম সত্য হায়।'...গিয়ার্ বদলানর কর্কশ আওয়াজ রাম নাম ছাপিয়ে সকলের কানে আসে। সত্যের আহ্বানে যারা শুয়ে ছিল তারা উঠে পড়ল। এক জোড়া চোখ চলে আসছে ওপরে। 'খাঁ সায়েব, শুইয়ে দিন।' হঠাৎ চোখ দুটো আরো জ্বলে উঠল...হেড লাইট...'লরি আ-গেই, লরি আ-গেই...লেট্ যা, লেট্ যা, ডরো মাৎ, রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়'...রাস্তার মাঝখানটা ফাঁক হয়ে গেল, মধ্যে খাঁ সায়েব দাঁড়িয়ে, হাতে লাঠি...শবযাত্রা সেই ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে...বিজন রয়েছে...কেন এল? চলে যাক এখান থেকে...ওর কর্ম্ম নয়, সহ্য হবে না...দুর্ব্বল... লরি এসে পড়েছে, খোলা রাস্তা দেখে জোর আসছে...কিষণের গলা শোনা যায়... রাম নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো সত্য হায়...'সফীক শবযাত্রার সামনে এসে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল'...রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সাথ সাথ চলে আয়, সত্য হায় সত্য হায়, সাথ সাথ চলে আয় চলে আয়, চলে আয়...'লোক উঠে পড়ল, ফাঁক ভরে গেল...'বিজন, চলে যাও...অমান্য কোরো না আমার কথা...যাও...' বিজন গেল না...'বিজন,' পিছনে যাও, শোন আমার কথা।' বিজন গেল না...শবযাত্রা দীর্ঘ হল। লরি এসে পড়েছে...'আবে, রোখ্লে, রোখ্লে'...লরি থামল না, ড্রাইভারের পাশে দু'জন

গুর্খা, হাতে যেন বন্দুক, ঐ চৌয়া দেখা যাচ্ছে না? তার দিয়ে ঘেরা লরি, কালো রঙ, মাথায় কারা যেন শুয়ে আছে...হাতে তাদেরও বন্দুকের মতন কি রয়েছে... বন্দুক···গাড়ির ভেতর লোক নেই বোধ হয়···চুপ চাপ, কেবল এঞ্জিনের আওয়াজ··· ধক্ ধক্...'রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো···'হেড-লাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, 'রোখ্‌লে শালে, রোখ্‌লে'···শববাহকরা থেমে পড়ল লরির সামনে···বিজন কেন সামনে? 'বিজন, ইধার আও'···ঘ্যাঁস করে গিয়ার্ বদলাল...বিজন শুনতে পায় নি, সফীক ছুটে এসে বিজনকে ঠেলে খাট কাঁধে করলে, 'রাম নাম বোলো, বোলো জোর্‌সে...ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ ইন্-কিলাব জিন্-দাবাদ···'ধক্ ধকানি বন্ধ, এঞ্জিন চলতে শুরু হয়েছে···'রোখো, রোখো'···সফীক চাকার সামনে খাট ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে সরে দাঁড়াল, মড়্ মড়্ করে ভেঙ্গে গেল ষাট পয়সার খাট। সফীক হাঁক দিলে, 'ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ', শতকণ্ঠে সেই রব ধ্বনিত হল। বিজন সফীকের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে···'এখান থেকে যাও'... 'খুন কিয়া, খুন কিয়া', 'বাচ্ছাকো মার ডালা'···লরি থামল, চার ধারে লোক ঘিরল, খাঁ সাহেব এগিয়ে এল···'ভাগো হিঁয়াসে...নয়ত এইখানে গোর দেব, এই পাকা সড়কের ওপর'···মহবুব টায়ারের ওপর খোঁচা মারছিল···'পেট্রল ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দেব, ওস্তাদ?' চার ধারে লোক চেঁচাচ্ছে...লরির ভেতরে বিশেষ কোনো শব্দ নেই...সফীক খাট থেকে মড়া খোকাকে তুলে নিলে···'মহবুব, মহবুব, যদি এখ্‌খনই না ফেরে ওরা গাড়িতে পেট্রল জ্বালিয়ে দাও।' পিছন দিয়ে কিষণ লরির ছাতে উঠেছে...'ওস্তাদ, বন্দুক নয়, লাঠি, লাঠি···হো, হো হো ..' 'নেহিজী, বন্দুক...' অসভ্য গালি এল ভিড়ের মধ্যে থেকে...খাঁ সাহেবের আওয়াজ। এক, দুই, তিনটে লাঠি পড়ল ওপর থেকে...কিষণ হাসছে···'ওস্তাদ, ওস্তাদ, লাঠি কেড়ে নাও ..' সফীক মড়াটা বিজনের হাতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারের সামনে এল...লরির ভেতর থেকে সামান্য কোলাহল হচ্ছে...পিছনের দরজায় খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে...মহবুব একটা মশাল এনেছে আগ্ লাগায়ে দেও...ভেতরে কারা চেঁচিয়ে উঠল, গিয়ার বদলাল,

লরি ব্যাক করছে, কিষণ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল...হঠাৎ লরিটা চলতে আরম্ভ করল, পাশের লোক সরে দাঁড়াল...লরি খোলা রাস্তা পেয়ে ছুটল জোরে। অন্ত লরিগুলো মাঝ রাস্তায় ব্যাক্ করে আগে থেকেই সরে পড়েছে।

সফীক বল্লে, 'কিষণ, পাড়ায় পাড়ায় খবর দাও...লরি ভর্ত্তি গুণ্ডা আর নতুন মজুর আসছিল...এরা বাধা দেয়...একটা ছেলে চাপা দিয়েছে...মজদুর-সভায় যেন সকলে এখনই ধাওয়া করে...আর বোলো, অতিশয় শান্তি ও অহিংস পদ্ধতিতে লরি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, আগুণ লাগান হয় নি...মারপিট হয় নি, এমন কি লরীর মধ্যে যারা ছিল তারা নির্ব্বিঘ্নে ফিরেছে। সাইকেল নিয়ে যাও...জরুরী কাজ···বিজন, লাসটা দাও।' ধরাধরি করে রাস্তার পাশে মড়া শোয়ান হল···চৌধুরী চেঁচিয়ে কাঁদছিল, সফীক ধমকে উঠল···'মড়াও উপকারে আসে।' কিষণ আওয়াজ দিলে··· 'ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ'...সফীক বল্লে...মুর্দ্দাবাদ...বিজন সামনে থেকে চলে গেল।

(৯)

খবরটা অতি শীঘ্র রাষ্ট্র হল যে মালিকরা নতুন মজুর দিয়ে হরতাল ভাঙতে চেষ্টা করে, হরতালীরা যখন বাধা দেয়, তখন লরি তাদের বুকের ওপর দিয়ে চালাবার চেষ্টা হয়, এবং গোলমালে একটা ছেলে চাপা পড়েছে। যখন অন্য পাড়া থেকে মজুররা ছুটে এল তখন গোলমালে চাপা পড়া-টা খুনে পরিণত হয়েছে। সফীক কিষণকে বল্লে চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলতে। মহবুব সফীককে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ, এখন ?'

স—'এখন ? এখনও গুর্খারা ভেতরে আছে, অতএব অহিংসাই ধর্ম্ম। তবে ওদের ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সেই সঙ্গে মোড় ফেরান চাই। একটা বাচ্চা খুন হয়েছে এই দেশে, এই সহরে, যেখানে জন্মাবার পূর্ব্বেও মরে, পরেও মরে, যেখানে কেউ বাঁচে না—একি ঠাট্টার ব্যাপার! দাও ঘুরিয়ে ভগবানের আশীর্ব্বাদকে মানুষের কাজে।'

ম—'ও-সব বুঝি না। দু'চারটে কথা কও, নয়ত' মারপিট বাধবে।'

স—'পরে, প্রয়োজন এলে দেখা যাবে। এই যে খাঁ সাহেব, দেখলেন কাণ্ডটা, চৌধুরীর বাড়ির মেয়েরা কাঁদছে, একবার নিজে না হয়…'

খাঁ—'ও কাজ আমার নয়, বিবিদের, তারা শকুনের মতন এতক্ষণ হাজির হয়েছে। কিন্তু লাস কোথায় ?'

স—'পবিত্র হিন্দুর আশ্রয়ে।'

মহবুব সফীকের কাণের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'ওস্তাদ, মেয়েদের কি বলা হবে ?'

স—'কেন ? কেন ? খাঁ সায়েব, এখনই আসছি, একটু জরুরী বাৎ আছে, কেন, কেন ? বলা হবে খাঁটি মিথ্যে কথা, যা তারা চায়, যা তাদের প্রাপ্য, লরি চাপা দিয়েছে খোকাকে। কেমন ?'

ম—'ওস্তাদ, এমন কিছু লাভ হবে না তাতে। তাছাড়া, আমার সাধ্য নয়।'

স—'বল কি! মেয়েদের শক্তি ভিন্ন কি কখনও কোনো বড় কাজ হয়!

তুমি হলে কমরেড, ঘাঘরার ভয় তোমার শোভা পায় না। ওটা বিজনের উপযুক্ত।'

ম—'যদি পুলিশে লাস নিয়ে যায়, আর পরীক্ষার পর প্রমাণ হয় যে...'

স—'খোকার মুখ দেখেছিলে? ডাক্তারের বাপের ক্ষমতা নেই···যদি কেড়েই নিয়ে যায়, তবে চমৎকার হবে, সব মজুর কোতওয়ালীর সামনে ভিড় জমাবে।'

ম—'সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪...'

সফীক একটু ভেবে বল্লে, 'ধন্যবাদ, মহবুব, তোমার বুদ্ধি পেকেছে এতদিনে। পুলিশের হাতে লাস না পড়াটাই ভাল, তাই ঠিক। কিন্তু এই সুযোগে ওরা বাইরের লোক না ঢোকায় তার বন্দোবস্ত কর। খাঁ সায়েবকে দিয়ে এইটি করিয়ে নাও।' মহবুব চলে গেল।

সফীক সহরের দিকে চলল। রাত হয়েছে গভীর...কত রাত বোঝা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতে এমন একটি সময় আসে যখন কালের পরিমাণ পুঁছে যায়, মানুষের তৈরী বিভাগ অবলুপ্ত হয়, কালস্রোত নিরুদ্ধ হয়ে দেশ ও পাত্রের ব্যবধান দূর করে, তখন ঘড়ি ঘুমোয়, ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিমোয়, কিশোরীর গায়ের কাপড় খুলে খড়-পাকাটির কাঁচা পুতুল দেখায়, শ্বাসটানা বুড়ীরও ঘড়-ঘড়ানি বন্ধ হয়। তখন জাগে কেবল কবির বিকৃত মস্তিষ্কের নারকীয় পরিকল্পনার অসংলগ্ন প্রতিচ্ছবি, জাগে ফাইলেরীয়ার বীজাণু, আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ। মঙ্গল-অমঙ্গলের বাইরে এই সময়, তাই যোগীজনসুলভ। প্রকৃতি যেখানে আদিম সেখানে সে অনন্ত, যেই মানুষের ছোঁয়াচ পড়ল তখনই সুরু হল সময়ের ছেঁড়াছেঁড়ি। সেই অবধি সভ্যতা, ইতিহাস, পারম্পর্য্য, নীতি, নিয়তি। এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেই। যারা মানুষকে বরণ করেছে তারা প্রকৃতির একটানা বিরতিতে বিশ্রাম পেল না। অথচ, তার প্রয়োজন আছে। ত্রিযামার আশ্রয় যেন ত্রিবেণীর স্নান।

নিশাচরের জীবন সুরু হয়েছে সফীকের কলেজে থেকে। দিনের আলোয়

ঘটনাগুলো চিক্‌চিক্ করে, সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ হ্রাস হয়, তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হয় না। দুঃখের রূপ যদি ফার্সী বয়েদের মতন হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। সুখের ঢঙ যদি ঠুংরীর তানের মতন হত, তবে ভাবের বদলে ভাও-বাতানুতেই কাজ চলত। বুদ্‌বুদ না হয় রঙ্গীন, কিন্তু তারা ভাসে বর্ণহীন জলরাশির ওপর, জল বাইরে নিথর, যে-স্তরে আলো প্রবেশ করল না সেখানে সে একটানা, তাই বুঝি বা স্রোতের রঙ কালো। গতি রুদ্ধ হলে রঙীন, নচেৎ আদিম অবিচ্ছিন্ন একরোখা বেগ মসীমাখা। বিজন একবার তাকে কালীবাড়িতে কালীপূজা দেখাতে নিয়ে যায়···অমাবস্যার ঘনতায় মূর্ত্তি প্রাণ পেয়েছিল, সংহারের। যে রাতকে চেনে না সে প্রকৃতির আভ্যন্তরীন ধ্বংস ও মৃত্যুর ক্ষুধাকে জানে নি। অ-হিংস•নীতি দৈনিক জীবনের, রাতের নয়। মহাত্মাজী সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের কাজ ধ্বংসের, এবং সৃষ্টির, অর্থাৎ কামনার, তার দুই অংশেরই। দিনে সংস্কারই সম্ভব, তার বেশী নয়। আমূল পরিবর্ত্তনের চাহিদা রাত।

রাস্তার দু পাশের দোকান, হোটেল, হালুইখানা বন্ধ, এক্কা নেই, টঙ্গা নেই, অত রাতে কে সোয়ারী হবে! কিছু খেলে হত, ডাক্তারে বলেছিল নিয়মিত পথ্য চাই...দামী উপদেশ...খগেন বাবুকে অসুখের কথা কেনই বা বিজন বলতে গেল! কেনই বা বিজন মড়া ফেলতে গেল! সে কি ও কতটা দেখলে! মুখ সিঁটিয়ে গেল বেচারীর! পোড় খায়নি, ধাতু নরম, কুঁচকে যায় সহজে। মজদুর-সভার বৈঠক কখন বসবে খবর নিলে হত। সফীকের পেটের নাড়ি টেনে ধরে, যন্ত্রণায় রাস্তার পাশে বসে পড়ে। গা বমি বমি করে, পিত্তি ওঠে।

• সফীক খগেনবাবুর বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা। সফীক রাস্তা থেকে ডাকতে খগেনবাবু নীচে এসে তাকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

'আপনার নোটটা তৈরী হল ?'

'বিজন বলছিল আর দরকার নেই।'

'তাই নাকি! ঠিক বলা যায় না।'

'কেন ?'

'দিনে দিনে ঘটনা বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনও।' বিজন কতটা বলেছে খগেনবাবুকে, কি বলেছে, জানতে ইচ্ছা হয় সফীকের। প্রশ্ন করে,

'বিজন বোধ হয় ঘুমুচ্ছে ?'

'বিজন এখনও এল না, খেল না।'

'খায় নি ? খায় নি কেন ?'

'এখনও ফেরে নি।'

'তাও বটে। আজ আবার একটা হাঙ্গামা বাদল। একটা ছেলে চাপা পড়ল, লরির ধাক্কায়, ওরা নতুন লোক আনছিল। এত রাত্রে বিরক্ত করলাম...' খগেন বাবুর সামনে ভাষা অস্থ হয় কেন ? লজ্জা আসে অজানিতে, লজ্জা জয় করতে সফীক চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। খগেনবাবু সফীকের বসবার ভঙ্গী দেখে আশ্চর্য্য হন, সহানুভূতি জেগে ওঠে...

'বিজনকে আর আপনারা ছাড়বেন না, খগেনবাবু...ওকে ভাবিজী কত যত্ন করেন...সেই ভাল। ভাবিজী নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছেন ?'

রমা ঘরে এল, সফীক চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। 'এত রাত্রে বিরক্ত করলাম, কিন্তু...কেবল বিজন এসেছে কিনা জানতে এসেছি। ও এখনও খায় নি ?'

রমা সফীকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভেতরে গেল। একটা প্লেটে বিস্কুট আর মাখন এনে সফীকের সামনে রাখলে। 'এক গ্লাস জল।' রমা ঠাণ্ডা জল এনে দিলে।

(স—'বিজনের ধারণা, বোঝাপড়া হওয়াই ভাল। আপনার ?'

খ—'নতুন ব্যাপার কি ঘটেছে জানি না। তবে মনে হয় যেন ওরা কোনো সর্ত্তই রাখবে না।'

স—'সর্ত্ত, সর্ত্ত, রাখলেই বা কি, ভাঙলেই বা কি! আদৎ ব্যাপারে যে-কে সেই! ন' আনার জায়গায় দশ আনা, আজের বদলে কাল...আপনার কি মত? ভাবিজীর?'

র—'কিসের?'

স—'সর্ত্ত রক্ষাটাই কি সব?'

র—'আমি কি জানি!'

স—'এই ধরুন, মিলের সাড়ির বদলে বেনারসী, রূপোর বদলে সোণা, সোণার বদলে প্ল্যাটিনামের ব্রূচ, একটা না হয় দশটা ..কিন্তু মানুষটা, সম্বন্ধটা যা ছিল তাই রইল!' খগেনবাবু আচম্বিতে বলে উঠলেন, 'তা ঠিক...ওগুলো বাইরের মিল, ভেতরকার যা বিরোধ তাই রইল, তার আর নিষ্পত্তি নেই।' রমলার দৃষ্টি খগেনবাবুর অমনোযোগিতায় ব্যাহত হল...খগেনবাবু বলতে লাগলেন, 'সেই জন্যই স্বীকার করাই ভাল তার অস্তিত্বকে। তুমি ভাববে, লোকে বলবে, হার।'

স—'হার নয়, এইটাই জয়ের সূচনা। প্রলেপ দিয়ে যে ঘা শুখোয় তার প্রলেপের প্রয়োজনই ছিল না। মজা নদীর খাতে ভরা নদীর স্রোত এলে কি সর্ব্বনাশ হয় জানেন ত!) ভাবিজীর সঙ্গে আমিও সাহিত্যিক হয়ে গেলাম!' রমলা গেলাস ও পিরিচ নিয়ে উঠে গেল।

বিজন এত রাত্তেও এল না, রমলা নিজের কোট ছাড়তে পারল না, সফীকের চেষ্টা সফল হল না—অথচ প্রত্যেকটি হওয়া উচিত ছিল। উচিত আর সার্থক, এই দু'য়ের ব্যবধানই যদি দুঃখের উৎপত্তি, তবে শান্তির জন্য অন্ততঃ একটাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। সার্থকতাকে পরিহার করলে থাকে কি? তার চেয়ে বিদ্যাসাগরী ধর্ম্ম-জ্ঞান চলে যাক। কিন্তু সহজে যায় না। অন্য কিছুর সাহায্য নিতে হয়।

সেটা নতুন জ্ঞান হোক। কেবল দেখতে হবে, জ্ঞান নতুন ধর্ম্মজ্ঞানে পরিণত না হয়। তার প্রতিষেধক, কর্ম্ম, বুদ্ধি-প্রণোদিত কর্ম্ম, ভাববর্জ্জিত কর্ম্ম। মানুষ নীরস হবে তাতে, কিন্তু দোটানায় থাকা অসম্ভব। আরেকটা উপায় আছে—সেটা বিরোধকেই স্বীকার করা। স্বীকার মানে কি? তার অস্তিত্বে কোনো ভাবোদ্রেক যেন না হয়, না ওঠে রাগ, না ওঠে ক্ষোভ। এটা সমাধান নয়। যুক্তিটা এই: বিরোধের জন্য কষ্ট হয়, কষ্টের অবসান কিসে হবে? না, কষ্ট না আসতে দিলে! স্বীকারের নিশ্চয় অন্য অর্থ আছে। আইন যখন মজদুর-সভাকে স্বীকার করে তখন সে মজদুর-সভাকে গোটাকয়েক অধিকার ও দায়িত্বের আধার হিসেবে সৃষ্টি করে, যার ফলে সেই অনুষ্ঠান নিজের রচিত কর্ত্তব্য পালন করতে পারে, অর্থাৎ অর্জ্জিত অধিকার-সমষ্টিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। স্বীকার মানে পৃথক সত্তার স্বীকার, সেই সত্তার বিকাশে বাধা না দেওয়া, অর্থাৎ পৃথককে পার্থক্যটুকু কাজে লাগাতে দেবার অবকাশ দেওয়া। শেষে সেই কাজে আসা। কিন্তু বিজনকে রমলা গ্রাস করেছে, খগেনবাবুকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, পারল না, সফীকের মতামত তার মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। অন্য ধারে বিজনও রাজি, তাই রমলা-বিজনে বিরোধ নেই, খগেনবাবু গররাজি, তাই মান-অভিমান; অন্য ধারে ঘটনাগুলো সফীকের মতামতের অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সফীকের মানসিক চাঞ্চল্য; আরেক দিকে রমলা-বিজন-সফীকের সম্বন্ধ ঝড়ের আগে আকাশ-বাতাসের মতন থমথমে। বিদ্যুৎ চমকাল রমলার অঙ্গ আশ্রয় করে।

রমলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনও বিজন এল না। আপনি পাঠিয়েছেন?'

স—'এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।'

র—'কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে নি ত?'

স—'মোটর চাপা নিজে পড়েনি জানি।' সফীকের চাপা হাসি লক্ষ্য করে রমলা বল্লে, 'যেন সেজন্য দুঃখই পেয়েছেন সন্দেহ হয়।'

স—'চাপা পড়লে তার আনন্দ হত, আপনার আদর-যত্ন পেত, এবং তার অত্যন্ত প্রিয় আন্দোলনটি আরো ফুলে উঠত।'

র—'আপনারও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না।'

স—'আপনার স্নেহের? সে-কথা খাটে খগেনবাবুর বেলা। আমার ক্ষেত্রে...বলছেন কি! জানতামই না আমি এতটা স্থান পেয়েছি ভাবীজির হৃদয়ে!'

রমলার মুখ কাঠ হয়ে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'এত রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি। আপনিই বা ফিরবেন কি করে?'

স—'আমার রাতে ঘোরা অভ্যাস আছে। আমার এখনই যেতে হবে।'

খ—'চলুন, এগিয়ে দিই।'

রমলা শান্ত কণ্ঠে বল্লে, 'না, এগুতে হবে না।' সফীক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, ভাবীজির সঙ্গে অন্ততঃ একবারও মতের মিল হল দেখে আনন্দ হচ্ছে। খগেনবাবু আপনার যাবার কোন প্রয়োজন নেই।' সফীক তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

মজদুর সভার অফিসের চারদিকের জীবন চঞ্চল। রাস্তার দুপাশের দোকানে আলো জ্বলছে, অফিসের বারান্দায় পেট্রোম্যাক্সের আলো শোঁ শোঁ শব্দ করছে, চারধারে পোকা ঘুরছে, দোকানের সামনে ছোট ছোট জটলা। একটার পাশে আসতে একজন জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি এখানে? আপনার দেখা পাওয়াই ভার!' সফীক হাসল—জটলার কথাবার্ত্তা থেমে গেল, ক্রমে একজন মাত্র রইল। সফীক দোকানীকে প্রশ্ন করলে, 'এরা বুঝি কোম্পানীর লোক!' 'আমার সন্দেহ তাই, মালিকরা নতুন মজদুর সভা খুলেছে। সফীক পান ও সিগারেট কিনলে। অন্য জটলায় আর একজন পরিচিত মজুরের সঙ্গে দেখা হল, 'এই যে কমরেড! ব্যাপারটা কি বলুন ত? শুনলাম লরি একটা ছেলে চাপা দিয়েছে, সি. এস. পি.র লোকেরা বলছে আগেই মরেছিল!'

ম—'দক্ষিণ-পন্থীদের ভাষ্যটা ?'

মজুর বুঝতে পারলে না দেখে সফীক প্রশ্ন করলে—'উধামজীর লোকেরা কি বলছেন ?'

'তারাও বলছেন, আগেই মরেছিল।'

স—'গরীবরা, মজুররা আবার কবে বেঁচেছিল! এই হিসেবে তাঁরা সত্যবাদী।'

মজুর ঠাট্টা ধরতে পারলে না, 'উধামজী বলেছেন না কি যে মোটরের সামনে দিয়ে মড়া নিয়ে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল।'

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভীষণ অন্যায় হয়েছে তোমাদের, ওঁদের মোটর কি খানার ওপর দিয়ে যাবে! মড়ার জন্য খানা আর গঙ্গার ঘাট রয়েইছে! মোটরগুলো যখন সিনেমা ও নাচ থেকে ফিরে বিজলী শোভিত গ্যারাজে ঢুকে বনাতের ঘেরা-টোপের ভেতর আরামসে ঘুমুবে, তখনই লাস বার করবার সময়! তারপর ঘাটে নিয়ে গেলেই হত! অন্যায় হয়েছে, খুব, বুঝতে পারছি···লরিভর্ত্তি মজুর ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করবার পর নিঃশব্দে খুঁদে মড়াটাকে গঙ্গাযাত্রা করালেই সুবিধে হত, সব দিক থেকে...কি বল? হাঃ হাঃ হাঃ···' শ্রোতারা হেসে উঠল। মজুরটির হাসিতে একটা কৃত্রিমতা রয়েছে, যেন বুঝতে পারছে না অন্যায়টি কোথায়। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'বোঝাপড়া হয়ে গেল শুনলাম···সর্ত্তগুলো কি? আইনে বেঁধে দেওয়া যদি হয় তবে মন্দ কি!'

স—'জরিমানা মাইনে থেকে উশুল করার বারণ নেই আইনে? তবে!'

মজুর চলে গেল অন্য জনতায়।

অফিসের সামনেকার জনতা একটু বড়। দরজা বন্ধ করে সভা চলছে। বারান্দায় একজন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য আসতে সফীক অনুরোধ জানালে করিম যদি ভেতরে থাকে যেন একটিবার বাইরে আসে। 'করিম! কোন্ করিম? এটা আমাদের সমিতির বৈঠক, সফীক।' সফীক ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে পানের

দোকানের সামনেকার বেঞ্চে বসল। উধামজী অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাঁর গম্ভীর আওয়াজের আকর্ষণ মানতে হয়, তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। সফীকও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। মজদুর-সভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে শুনে সফীক বল্লে, 'সভা এখনও গ্রহণ করেনি, মাত্র সমিতি হয়ত গ্রহণ করেছে। আপনাদের সর্ত্ত সমস্ত মজুরদের সামনে পেশ করবার পূর্ব্বেই কেমন করে গৃহীত হল?' উধামজী হেসে বল্লেন, 'কমরেডের আইন জ্ঞান বড় উকীলের মতনই···তবে এটা ঠিক আমরাও বে-আইনী কাজ করব না। তা ছাড়া, কমরেড, সব মজুরদের সামনে ধরতে হবে কেন? মজদুর-সভার লোকদের সামনে পেশ করলেই কি যথেষ্ট হবে না?'

স—'না, হবে না, কারণ, মজদুর-সভা বলেছে যে তারাই সমগ্র মজুরদের প্রতিনিধি।'

উ—'প্রতিনিধি, তার বেশী ত' নয়! যাক্, ও-সব পণ্ডিতী তর্ক আবার আমি চালাতে পারি না। তবে, বে-আইনী কাজ আমি থাকতে হবে না।

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ওটা আপনার ধাতে নেই, ওতে আপনার বাধে। উধামজী উত্তর না দিয়ে অফিসের ভেতরে গেলেন। সমিতির অন্যান্য সভ্যবৃন্দ ক্রমে বাইরে এলেন, চলাফেরায় উল্লাসের, আত্মতৃপ্তির চিহ্ন বর্ত্তমান, প্রত্যেকেই প্রায় সিগারেট কিংবা চুরুট ধরালেন, পান, শুপুরি, চূণ বিনিময় চলল। প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তবে তিন জন আপত্তি জানিয়েছিল, টেকেনি এই কারণে যে মজুরদের অবস্থা কাহিল, আরো দু-একদিন জোর ধর্ম্মঘট চালান যেত, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় বেড়েই চলেছে। একজন চেঁচিয়ে বল্লে, ভয়টা ঝুটো, সরকার রয়েছেন কি করতে!' কোনো মন্তব্য হল না কথাটার ওপর। জনতা ক্ষীণ হল।

করিম অন্য একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

ক—'নিজের পাড়ায়। শুনেছ ?'

স—'শুনেছি। কাল বড় মিটিং-এ কিছু করতে পারবে ?'

ক—'গোলমাল পাকান শক্ত নয়, কিন্তু ফল কি ভাল হবে ? মজদুর-সভাটাই ভাঙ্গবে।' সফীক অস্থির হয়ে বল্লে, 'চল, একটু খোলা জায়গায় বসি গে।' দুজনে একটা ঢিবির ওপর বসল।

স—'তুমি সমঝোতা চাও না, কেমন ?

ক—'না।'

স—'তুমি মজদুর-সভা ভাঙ্গতেও চাও না !'

ক—'না।'

স—'মজদুর-সভা না ভেঙ্গে যদি বোঝাপড়া ভাঙ্গে তবে খুশী হবে ?'

ক—'নিশ্চয়ই। তবে উপায় দেখি না।'

স—'উপায় আছে। একটা ছেলে আজ মরেছে জান ?'

ক—'চাপা দিয়েছে শুনছিলাম। ব্যাপারটা কি ?'

স—'ব্যাপারটা যাই হোক না, খৃষ্টানেরা বলে যারা অল্প বয়সে মরে তাদের ওপর ওদের ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। শিশুটি একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য রবে কেন, করিম ? আমি ভাবছিনাম, ভোর বেলা যদি ঐ লাসটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে, একটু লোকজন জড় করতে করতে, এই ধর বেলা দুটো তিনটের সময় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া যায়...তবে, মজদুর-সভাও টিঁকে থাকে...কি বল ?'

ক—'বুঝলাম, কিন্তু লাস পাবে কোথায় ? লাস এখন থানায়।'

সফীক লাফিয়ে উঠল। 'সে কি ! অসম্ভব ! লাস কিষণের চার্জ্জে। হতেই পারে না।'

ক—'আমি সঠিক জানি, লাস এখন থানায়। কেবল তাই নই, দেখো ওস্তাদ, সমঝোতার আগে লাস খালাস পাওয়াই যাবে না। পুলিশ কি অত বোকা?'

সফীক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বল্লে, 'অসম্ভব লাস বার করতেই হবে।'

করিম—'পুলিশে খবর পেলে কি করে? তোমার উপায়টি খাটল না ওস্তাদ।'

স—'তবে মজদুর-সভা ভাঙ্গুক, করিম। বুঝে ছাখ, করিম, তুমিই ভাব, ওরাই বলছে মজদুর-সভার প্রভাব কমেছে, এক একটি কোম্পানি এক একটি নিজের নিজের ইয়ুনিয়ন খুলছে, লোক সেই সব ইয়ুনিয়নে ভর্ত্তি হচ্ছে ত'! তবেই, ছাখ করিম……'

ক—'নতুন লোকেরাই যাচ্ছে। কিন্তু ঐ ইয়ুনিয়নগুলির একটিও বাঁচবে না বলে দিলাম। ওরাই বলছে আমাদের প্রভাব নেই, আমরা ত' বলছি না। ওদের কথা মেনে নিলে যে আমাদেরই হার হল, ওস্তাদ। না, সে হয় না…বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তুমি কি ভাব, ওরাই মজদুর-সভা চালাবে বরাবর? আজ না হয়, দুদিন পরে আমাদেরই হবে, তখন ভয়ে কাঁপবে সকলে।'

স—'মিল-কমিটি কি চায়?'

ক—'আমি কতবার তোমাকে বলেছি। তারা জানে সর্ত্তগুলো দুদিন পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে, তবু তারা চায় না মজদুর-সভা ভাঙ্গুক। জানি ওস্তাদ, ছুতোয় নাতায় আবার আমাদের বরখাস্ত করবে। তা করুক! এই ভাবেই ত' জোর বাড়ে? নয় কি? তোমার মতন লেখাপড়া শিখিনি, আট বছর থেকে হাতুড়ি চালিয়েছি বাপদাদার সঙ্গে, তার পরের ঘটনা তোমার অজানা নেই…আমারও নালিশ আছে···তবু কি জান? এই মজদুর-সভা আমাদের হাতে গড়া···তুমি হয়ত এটা ঠিক বুঝছ না, মাপ করো, লেখাপড়া শিখলে অনেক বাধা আসে… তোমার বাধা সব চেয়ে কম, জানি, তুমি অনেক চেষ্টা করেছ···যখন তোমাকে

চেয়েছিলাম, তখন সভ্য হতে রাজি হলে না…। আমিও আর ফিরতে চাই না, ওদের জানিয়ে দিয়েছি, সত্যই আর খাটতে পারি না, আমাকে নিয়ে ঝগড়া যেন না চলে।'

সফীক করিমের কাছে বিড়ি চাইলে। করিম, একটা পুরো প্যাকেট গুঁজে দিলে হাতে। 'করিম, প্রায় ভোর হয়ে এল, আমি আড্ডায় যাচ্ছি…কাল সভায় যাবার প্রয়োজন আছে কি ?'

ক—'তুমি মানুষকে অত ভয় পাও কেন, ওস্তাদ ?'

সফীক বিড়ি ধরিয়ে একাই আড্ডায় গেল।

ঘরের ভেতর খাটে কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তার ঘুম যাতে না ভাঙ্গে ভেবে সফীক চুপি চুপি বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, শরীর আবার বিগড়েছে, না হলে রাস্তার ধারে যন্ত্রণার চোটে বসে পড়তে হয়! ভাবিজী ভাগ্যিস চা-বিস্কুট খাওয়ালেন! দুর্ব্বল দেখাচ্ছিল নচেৎ মনে মনে, এমনকি আচার-ব্যবহারেও যার শত্রুভাব, সে করুণা দেখাতে যাবে কেন ? মহিলাটি চান না যে খগেনবাবু ও বিজনের সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকে। অতরাত্রে খাওয়াটাই অন্যায় হয়েছিল,কিন্তু শরীর মানল না ধর্ম্মকথা। বাস্তবিকই অন্যায়; তাই…অচল এই মেয়েদের সংশ্রব! বুর্জোয়া মেয়েরা স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের শোষণ করতে পেলে আর কিছু চায় না। তাদের শোষণ-পদ্ধতি নিতান্ত মানুষিক, অর্থাৎ দৈহিক, তাই আরো ভয়ঙ্কর। অথচ মুখে সব ফেমিনিষ্ট। মিথ্যুক! এক একটি সন্তান ইন্‌সিওরেন্সের চাঁদা, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাঁঠ, স্বাধীনতার পায়ে ছেলে মেয়ের কচি হাত দিয়ে কুড়ুল মারা। 'খুকী তোমাকে না দেখতে পেয়ে ঘুম ভেঙ্গেই কাঁদছিল, খোকা তোমার ফোটো দেখেই বা-ব্বা বলে উঠল...' এবং তার পরই…'ওদের বাড়ির ললিতাকে সুন্দরী বল যে কিসে তা বুঝি না! মিটিং থেকে ফিরতে অত রাত হল! স্যুপ ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল, আইসক্রীম গেল গলে।' জন্মগত দাসী মনোভাব,

দৈহিক শক্তি, তার অভাবে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পুজা। যুযুৎসুর প্যাঁচ মেয়েলী ইম্পিরীয়ালিজমের প্রধান আঙ্গিক। তার ওপর শিশুর অত্যাচার!

নিজে যদি রোমাণ্টিক হত তবে চৌধুরীর বাচ্চার মুখচ্ছবি মানসপটে ভেসে উঠত। সভীক চোখ বড় করে অন্ধকারে চাইলে। কোথাও কিছু নেই, লরির চাকার চাপে থেঁতলে গেল, তাই বোধ হয়। কিংবা হয়ত, কোনো মায়াই ছিল না। মায়া থাকলেই ছায়া ঘুরবে! বরঞ্চ, অন্যায়বোধ, অধর্ম্মজ্ঞানই ঐ ধরণের ছায়ার জন্ম দেয়। যারা আত্মসর্ব্বস্ব তাদের কষ্ট পাওয়ার প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকে। অতীতের কাল্পনিক দুঃখ যদি না মূর্ত্ত হয় তবে বিঁধবে কারা? খিদের তাড়া নেই, অসুবিধের অন্য কোনো জ্বালা নেই, সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যথা নেই, একটা কিছু যন্ত্রণা পাওয়ার অস্ত্র চাই ত! তাই নিজের নখ আর দাঁতের সাহায্যে, আঁচড়ে কামড়ে যত পার ঘা কর! সেই ক্ষত যত দগদগে হয় ততই আনন্দ, ততই বিলাস, ততই তৃপ্তি। এই বিলাসের নামই না কত! করিমের বিলাস নেই, সে নিজেকে সরিয়ে নিলে কেমন সহজে, কেমন নীরবে! অথচ ঐ ধরণের স্বার্থত্যাগের অছিলায় বুর্জ্জোয়া মেয়েরা কত ন্যাকামিই না করত। রোমাণ্টিসিজমের মূলে শতাব্দীর সঞ্চিত জমান সারপ্লাস ভ্যালু!

কিন্তু লাস গেল পুলিশের হাতে কি করে! কিষণ ছাড়লে কেন? মড়া খোকাও কাজে লাগে দশের। একটা শোক যাত্রার বন্দোবস্ত হলে দেখা যেত উধামজীর জোর কতটা। মজদুর-সভা বজায় থাকত। করিম রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে তুলেছে, তাই এত মমতা। কিন্তু নিজের সৃষ্টির প্রতি মোহটাও থাকবে কেন? মাতৃত্বের সঙ্গে পার্থক্য আছে—মজদুর-সভা তৈরী হবার পর সর্ব্বসাধারণের, ছেলে বিয়ের পরও মায়ের। করিমের স্নেহ ভিন্ন জাতের। তবু, মজদুর-সভার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। নিজে সভ্য হতে রাজি হয় নি। করিম বল্লে মানুষকে ভয় কেন? কৈ? ভয় নেই ত'! ভয় কেন? ভয় কাকে? মড়াকে ভয় নেই, জেলের ভয় নেই, মৃত্যুরও ভয় নেই ত' মানুষকে ভয়! করিম ঠিক বুঝতে পারে নি।

সমবেত মানুষকে, নিপীড়িত শ্রেণীকে যে সেবা করেছে সে ভয় পাবে কেন? আবার পেটে সফীকের অসহ্য যন্ত্রণা ওঠে...তীরের মত বেঁধে···অকস্মাৎ মনে হয় একটা পৃথক মানুষকে ভয় পায় বলেই কি সে সমষ্টিগত মানুষকে আঁকড়ে ধরেছে, যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তি জন-সাধারণকে ভয় করে ব'লে ব্যক্তিত্ববাদী হয়। সফীকের গলা শুখিয়ে ওঠে, বিড়ির টানে জিব জ্বলতে থাকে, ঘরের কোণে সোরাই, সফীক উঠে জল খেতে গেল, সোরাই বক্ বক্ শব্দ করলে, বিছানার লোকটি ধড়মড় করে উঠে পড়ল, 'কোন হ্যায়?'

'ডাকু...শুয়ে পড়···বিজন! এখানে?' বিজন শুল না। সফীক আলো জ্বাললে। 'এক গ্লাস জল দাও, তারপর তোমার বক্তৃতা শুনব।' বিজন জল দিলে। দাঁত চেপে যন্ত্রণা জয় করতে সময় লাগল।

স—'কি বলতে চাইছ, বিজন?' উত্তর এল না দেখে সফীক বল্লে, 'আমিই বলব?'

বি—'না, ধন্যবাদ।'

স—'কেন নিজে লজ্জা পাবে? আমিই না হয় লজ্জাটা ভাঙ্গি? তোমার নিজের দুর্ব্বলতার কাহিনী আমার মুখে কম রোমাণ্টিক শোনাবে। এটা ভাবের খেলা নয় বিজন। তোমার শক্তিতে ইয়ুটোপীয়ার রচনা হয়, কিন্তু জগদ্দল পাথর এক চুল সরান যায় না। কে বলেছে তোমার বিশ্বাস ছিল না? কিন্তু বিশ্বাসে এই স্বার্থের পাহাড় টলাবে! ইডিয়টিক! জোর নিজে অচল থাকা যায়। আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে ক'জন? এতে ত' অনুষ্ঠান নেই যেটা তোমাকে আশ্রয় দেবে! পার্টির মেম্বর তুমি নও, তুমি বাইরের বন্ধুমাত্র, অর্থাৎ আজকের বন্ধু, কালকের গুপ্তচর; শত্রু।'

বি—'ওস্তাদ...'

স—'গুরুবাদ তোমার রক্তে মাংসে, ও-নামটা আজ থেকে না হয় নাই ব্যবহার করলে! বল।'

বি—'মিথ্যে দিয়ে কাজ হাঁসিল করবে? তা হয় না। পারবে না দেখ, সব মজুরই মাথা পেতে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করবে। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন,একটার জায়গায় দশটা মড়া, মড়া কেন দশটা জ্যান্ত মানুষ লরির সামনে ছুঁড়ে দাও না কেন, পারবে না, পারবে না...আমি তোমাদের এপ্রেন্টিসি করলাম এতদিন... কিন্তু চলবে না···কিছুতেই।'

স—'এ যে একেবারে অলডাস্ হক্সলে! এইবার সন্ন্যাসী হবে নাকি, বিজন?'

বি—'ঠাট্টা ছাড়। তোমার মতও 'পিওর সোশিয়ালিষ্ট'দের মতন। দেশের নেতৃত্ব যদি মধ্যবিত্তের হয় তবে বোঝা-পড়া ছাড়া গতি নেই।'

স—'ধরতাই বুলিগুলো ছাড়।'

বি—'মিল-কমিটি পারলে চালাতে? তুমি তাদের মানছ না।'

স—'খুব ভাল ভাবেই পারত...'

বি—'যদি না...'

স—'যদি আমাদের দলে তোমার মতন 'ডিফিটিষ্ট'না থাকত।'

বি—'অপমান করে লাভ নেই।'

স—'তার চেয়েও বেশী।'

বি—'কি?'

স—'বিশ্বাসঘাতক। পুলিশে খবর দিয়েছ তুমি।

বি—'হাঁ, দিয়েছি। লজ্জা পাচ্ছি না। এক হিসেবে তুমিও খুনী।'

স—'অনুগ্রহ করে এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাবে? হয়ত, তোমার ইচ্ছা ছিল না, অন্যের প্ররোচনা ছিল। তাই সম্ভব, তাই আশা করছিলাম। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিও। এখনই যাবে?' বিজন চলে গেল। না, কিছুতেই হার স্বীকার চলে না, চলে না, শেষ চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার শেষ নেই, নেই, নেই, শরীরপাত হোক সকলে ত্যাগ করুক,তা বলে যেটা অন্যায় সেটা সহজে ঘটবে! বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, মেয়েমানুষের আঁচলধরা বুড়ো খোকা! মার্ক্স বলে গেছেন সেই কতকাল পূর্ব্বে

যে মধ্যবিত্তের দু'ভাগ, একভাগ ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যভাগ সহানুভূতি দেখায়, চাঁদা দেয়, অবশেষে তারাই রক্ষণশীলের দলে মেশে, ধর্ম্মের ছুতোয়, ব্যবহারিক যুক্তির অছিলায়, বস্তুতঃ স্বার্থের তাড়নায়, অজানার ভয়ে। তাদের নিজের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করাই ভাল—কারা বন্ধু কারা শত্রু স্পষ্ট বোঝা যাক, যন্ত্রণা যেন একটু কমল।

সকাল ন' টার সময় মজদুর-সভার মিটিং ডাকা হয়েছে। ভিড় হয় নি। সফীক একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। উধামজী বক্তৃতা দিলেন..."ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ মজুরদের জয়লাভ হয়েছে। তাদের ত্যাগ, তাদের জিদ্, তাদের, বিশেষত, মেয়েদের, আমাদের মা-বোনেদের সহ্যশক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যে-শান্তিতে তারা এই ধর্ম্মঘট চালিয়েছে তার তুলনা জগতে নেই। রুষবিপ্লবে যেমন মস্কোর স্থান, ভারতীয় বিপ্লবে তেমনই কানপুরের। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে কানপুরের মজুর-সম্প্রদায় আজ অভিন্ন-হৃদয়, তার অন্তরে বাহিরে আজ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই সূত্রে আমি সহরের মুসলীম লীগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে। আজ দেশ বুঝেছে, এবং আমাদের বিদেশী প্রভুরাও বুঝুন, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেস ও লীগ একই পথের পথিক। আমাদের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁরা আমাদেরই···অতএব আমাদের বুকের নীরব ভাষা তাঁদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাঁরা আমাদের, আমরা তাঁদের—এই সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান নেই। আমি বৃথা সময় নষ্ট করব না। আপনারা সকলে একমত হোন এই সাধারণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। সর্ব্ববাদী ও আন্তরিক সম্মতি চাইছি। কারণ রয়েছে তার...এখনও এমন শত্রু রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য যেন ঝগড়ার নিষ্পত্তি না হয়। তাদের দুরভিসন্ধিটা নাকচ করুন আপনারা। আমাদের সকলের, শ্রমিকদের, মালিকদের, সরকারের, দেশের লোকসান কতটা হবে তাঁরা তলিয়ে দেখছেন কি? তাঁদের গায়ে আঁচ পর্য্যন্ত লাগবে না, ঝলসাব আমরা, তোমরা...'

মজত্বর-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য প্রস্তাবটি পড়তে লাগলেন। মহবুব পাশে এসে বল্লে, ওস্তাদ, এই মওকা...' 'রাজি আছি, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে সায় দেবে···কিষণ কোথায়?' 'ভিড় ছোট, আমাদের লোক কম, তবু, তুমি যাও।' সফীক ভিড় ঠেলে মঞ্চের দিকে এগুল। উধামজী তাকে দেখে বল্লেন, 'এই যে কমরেড, স্বয়ং, অনেক দিন দেখিনি, কিছু আপত্তি আছে নিশ্চয়... হা, হা, হা···কমরেড আপত্তি ছাড়া আর কিছুই তোলেন না, এমন কি চাঁদাটি পর্য্যন্ত নয়। সভাপতি বোধ হয় রাজী হবেন না, একটু দেরী হয়ে গেল।' প্রস্তাব পাঠ শেষ হল। সফীক বল্লে, 'আমি এখনই বলতে চাই কিছু, পরে সুবিধে হবে না ...মনোনীত হবার পর আর বক্তব্য থাকবে না।' সফীক মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'এই প্রস্তাবের সম্পর্কে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে আসি নি। গ্রহণ করা, না করা সভার হাতে। আমি কেবল একটি প্রশ্ন করছি...তোমরা কি ভাবছ যে মালিকরা সর্ত্তগুলো মানবে?' দূর থেকে একজন বল্লে, 'মানবে না।' 'কিছুতেই মেনে চলবে না। মনে নেই মাত্র কয়েক মাসের পূর্ব্বেকার ব্যাপার? যারা সেবার ধর্ম্মঘট চালালে তারা এখন কাজ করছে নিজের নিজের জায়গায়? কার জন্ত এবারকার হরতাল? করিমকে নেওয়া হবে ফেরৎ? তাকে নেওয়া হলেও তাকে অকর্ম্মণ্য বলে ওরা যে ছাড়িয়ে দেবে না এমন কিছু সর্ত্ত আছে?' উধামজী বল্লেন, 'করিমকে অমনভাবে এক্‌সপ্লয়েট করবেন না কমরেড। করিম ভাই নিজেই আর চাকরী নেবে না, খবরটি বোধ হয় কমরেডের অজ্ঞাত।' সফীক...'করিম নিজেকে বলি দিলে, আপনারা তাই নিয়ে গর্ব্ব করছেন···করিম একজন মাত্র, কিন্তু মজুরদের রাখা না রাখার মালিক কে? কারণ দেখাবার ভার কার হাতে? তোমরা বল, বিশ্বাস রাখতে পারা যায় এদের ওপর?' উধামজী বাধা দিয়ে বল্লেন, 'সভাপতি মহাশয় যদি অনুমতি দেন তবে···' মঞ্চের ওপর তুজন দাঁড়িয়ে। সভাপতি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন, 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি আমার অনুমতি চাইবার প্রয়োজন মনে করেন

নি। তবে এই ডিমক্রেসীর যুগে সকলেরই অধিকার আছে মত প্রকাশের। আমি সেই ভেবে কমরেডকে পাঁচমিনিট সময় দিচ্ছি। উধামজী আপনি বলুন।'

সফীক বোধ হয় অতটা নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করেনি। একটু থতমত খেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরাই বল, বিশ্বাস করা যায় এদের ওপর?' সফীক মহবুবকে খুঁজতে লাগল ভিড়ের মধ্যে, পাওয়া গেল না, 'বিশ্বাস রাখা যায় ওদের প্রতিজ্ঞায়, যারা মুনাফার জন্য আইন ভাঙ্গতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত?' বিজন বল্লে খুনী···আইন ভঙ্গ সেটাও ...মহবুব নেই, কিষণকে দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গেল তারা, ভিড়ের মধ্যে তাদের মুখ সফীকের মুখের চাবি...চাবি হারিয়ে গেল না কি! 'আজ যদি বিনা অজুহাতে, ছুতোয়-নাতায় আবার তাড়ায়···তখন?' বিশ্বাস করা চলে কি?' একটা কথা, ঐ বিশ্বাস, ঘুরে ফিরে সেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস আসে...ইতিহাসের অন্তর থেকে, শ্রেণী-বিরোধের পিছন থেকে, চেতনার আড়াল থেকে···সফীক আর বিশ্বাস কথাটি ব্যবহার করবে না। সভাপতি মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'দেখছি, কমরেড সব ব্যাপারটা অবগত নন। অবশ্য তাঁর দোষ নেই। যদি ওরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে আবার হরতাল হবে।' সফীক উত্তর দিলে—'হবে...কিন্তু কবে? নোটিশ দেবার পর; উধামজী—'অর্ডার, অর্ডার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, কমরেড সভাপতির সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায়···তা ছাড়া কমরেড শ্রেণীবিরোধ প্রচার করছেন, তার স্থান ও কাল এই নয়। হাঁ, স্বীকার করছি নোটিশ দিতে হবে মজদুর-সভাকে। দেরী হবে অবশ্য, কিন্তু অধীর হলে চলবে না। কমরেড ভাবছেন, ইতিমধ্যে আন্দোলনে ভাঁটা পড়বে। তাতে অবশ্য কমরেডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিন্তু আমাদের শক্তি সঞ্চয় হবে। যে ধর্ম্মঘট পনের দিন কি একমাস অপেক্ষা করতে পারে না তার অন্তরে ন্যায়ের সমর্থন নেই। কমরেড ভাবছেন নতুন সর্ত্তগুলোর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আছে বৈ কি! পার্থক্য আগের সঙ্গে এই যে এবার সরকার খুদ্, নিজে, মালিকদের ওপর চাপ দিতে পারবেন। একজন বড় জজ যদি রায় দেয় তবে সাধ্য কি তাকে অমান্য করা মালিকদের? লোকমত নেই?

সরকার নেই ?' সভাপতি মহাশয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন। উধামজীর বক্তৃতা চলল—'একজন নামজাদা লোক শীঘ্রই নিযুক্ত হচ্ছেন—খবরটি একটু আগেই হয়ত প্রকাশ করে ফেললাম—কিন্তু আশা করি খবরের কাগজের বন্ধুরা যেন ব্যবহার না করেন···জজের সামনে যেতে আমাদের ভয় নেই···আমরা ন্যায়ে বিশ্বাসী, আমরা প্রপীড়িত, ন্যায় আমাদের দিকে, আমাদের আন্দোলন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভয় আমাদের নেই, ভয় অন্যের।'

সফীক—'যতদিন রায় না বেরুচ্ছে ততদিন কারা খাওয়াবে ? রায় যদি ওরা গ্রাহ্য না করে সরকার ওদের কি করতে পারেন ? রায় দেবে কে ? ওদেরই দলের, ওদেরই শ্রেণীর একজন ?'

উধামজী—'পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, সভাপতিজী। এইবার প্রস্তাবটা গৃহীত হোক। যদি অনুমতি পাই তবে মহাত্মাজীর একটি বাণী পড়ে শোনাতে পারি ?' সভাপতির সানন্দ অনুমতি পাবার সঙ্গেই উধামজী পাঠ সুরু করলেন। সফীক বল্লে, 'আগে প্রস্তাব...কতদিন নাম ভাঙ্গিয়ে খাবেন ?' সভাপতি—'আপনি এইবার থামুন। মহাত্মাজীর অপমান কেউ সহ্য করবে না। আমি আমার কর্ত্তব্য জানি। উধামজী আপনি পাঠ করুন।' উধামজী মঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জনতাকে সম্বোধন করলেন, 'মহাত্মাজী এই মর্ম্মে লিখেছেন···তাঁর বাণীর সারমর্ম্মটাই বলছি, কে তাঁর অনবদ্য ভাষার অনুবাদ করবে ? তিনি লিখছেন,·· হরিজন-পত্রিকার মারফৎ...আমি বিশ্বাস করি না ধনিক শ্রমিকে কোনো আন্তরিক বিরোধ আছে। আমি নিজে শ্রমিক···তাই শ্রমিকদের হয়ে বলবার অধিকার আমার আছে...' সফীক বাধা দিলে—'কিন্তু নিজে তিনি ধনিক নন—এবং তিনি শ্রমিকও নন।' 'অর্ডার-অর্ডার···' উধামজী...'সে হিসেবে আমাদের কমরেডেরও কোনো অধিকার নেই...মহাত্মাজী লিখেছেন—সত্যাগ্রহ একটি বিজ্ঞান, তার রীতি আমার আয়ত্ত। সত্যাগ্রহ নিস্ফল হবে তখনই যখন বিপক্ষকে অবিশ্বাস করব। অবিশ্বাস প্রেমের পরিচয় নয়। সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে ঘৃণা থাকবে না, থাকবে আততায়ীর প্রতি

অকৃত্রিম ভালবাসা, আস্থা, শ্রদ্ধা। তারই শক্তিতে আততায়ী বন্ধু হবে।...জয় মহাত্মাজীর জয়···আপনারা সকলেই প্রস্তাবটা শুনেছেন, একবার সমস্বরে বলে উঠুন···জয় মহাত্মাজীর জয়···ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' সফীক মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল···জয়, জয়, জয় উধামজীর জয়, জয় মালিকের জয়, মহবুব বলতে পার, হার তবে কার? বিজন বলবে হার আমার, আমার দস্তের, তা নয় মহবুব, হার তার, তার·· ভাবিজীর...আমাকে আড্ডায় নিয়ে চল মহবুব।'...

(১০)

নতুন বাংলোয় আসার পরই নতুন মোটর এল। বিজন একটা টু-সীটার কিনতে যায়, কিন্তু ছেলেমানুষের টাকা এই ভাবে নয়-ছয় করতে দেওয়া উচিৎ নয়, নিজের মোটর থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, এই সব কারণে রমলা নিজেই মোটর কিনলে। সীডন্-বডির খরচ বেশী, রাক্ষসের মতন মোবিল্ খায়, দামও অন্ততঃ সাত আটশ' টাকা বেশী টুরিং মডেলের চেয়ে। টুরিং-কার-ই কেনা হল। কাণপুর সহরে কোনো ড্রাইভারই রাস্তার নিয়ম মেনে চলে না। তাই বিজন নিজে গাড়ি চালাবে আপাতত এবং রমাদিকে চালাতে শিখিয়ে দেবে সুবিধেমত। কোলকাতার চেয়ে ড্রাইভারের মাইনে কম হলেও, কেন মিছিমিছি অতগুলো টাকার মাসিক শ্রাদ্ধ করা! খগেনবাবু কিছু মোটর চড়ে তাঁর নতুন বন্ধুদের আস্তানায় যাচ্ছেন না। তা ছাড়া ড্রাইভাররা একটা স্বতন্ত্র জাত, তাদের না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে প্রভুভক্তি, সত্য মিথ্যার ধার তারা ধারে না, কথায় কথায় মেজাজ দেখিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দেয়। যন্ত্রের সম্পর্কে এসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কি দুর্দ্দশা হয়েছে এদের দেখলেই বোঝা যায়। এরা না হিন্দু না মুসলমান। সেটা অবশ্য সুখের কথা, কিন্তু শ্রেণীজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে এদের। লরি-ড্রাইভার সব চেয়ে নীচু থাকের, তার ওপর বাস্-ড্রাইভার, উঁচুতে যারা বাড়ির গাড়ি হাঁকায়। আবার তাদের মধ্যেও জাতিবিচার। ফোর্ড-ফিয়াট বৈশ্য, বুইক-ডজ্-ডক্স্হল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্যাকার্ড-ডেম্লার, কুলীন ব্রাহ্মণ রোলস্-রয়েস্—একেবারে বেগের গাঙ্গুলী, নৈকষ্য...কাণপুরে মাত্র পাঁচ-ছ'খানা আছে, তাদের ড্রাইভারদের মাটিতে পা পড়ে না—রাস্তার কনেষ্টবল তাদের সেলাম ক'রে আগে ছেড়ে দেয়। বিজনের অভিজ্ঞতায় বলে এই সব কারণে মোটর-ড্রাইভারদের সঙ্ঘবদ্ধ করা মুস্কিল। হিন্দু-ধর্ম্মের জাতিবিচার শেকড় জমিয়েছে এঞ্জিনের ভেতর পর্য্যন্ত। সেইজন্য একটু দেখে শুনে ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে বিজন নিজেই চালাবে...সেটা মোটেই অশোভন নয়, খুবই শোভন, খুব ফ্যাশনেবল্ ছোকরারাও তাই করে, তাতে

নতুন সভ্যতার প্রাণবস্তু—চরখা নয়, এঞ্জিন, তাও বাষ্পীয় নয়, কম্বাসচন্ এঞ্জিন—তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যেটার নিতান্ত প্রয়োজন আছে এই ফিউডাল দেশে যেখানে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। রমলা বল্লে, 'আমি তোমার পাশে, সামনের সীটে বসতে পেলে সুখী হব, মনে হবে ছেলে-মানুষটি।'

বাংলোটি ছোট হলেও পরিপাটি। আধুনিক ঢঙের, জাহাজের কেবিনের পরিকল্পনায় ঘর, ডেক্-এর অনুকরণে নীচু দালান, ম্যান রেলিং, পোর্টহোল্ পর্য্যন্ত। রমলা হাল্কা নীল পর্দা টাঙ্গাল। কাণপুরে মনোমত ছবি পাওয়া যায় না। বেঙ্গল স্কুলের ছবি বিজনের পছন্দ নয়, সেটা কাব্য-গন্ধী, গুহাভিমুখী, রক্ষণশীল, প্রগতিবিরোধী ; বম্বে স্কুলের ছবিতে তবু আনাটমী নিভুল, যদিও তেজের অভাব সেখানেও। একজন চেক্ মহিলা কাণপুরে এসে ছবি আঁকছেন, তাঁর দু'তিনটে নতুন ধরণের, কিউবিষ্ট ডিজাইনের সামুদ্রিক দৃশ্য আঁকা আছে। দাম নিয়ে গোলমাল হবে না—দু'শ টাকা ছবি পিছু চাইছেন, কিন্তু দু'খানা একত্র নিলে মাত্র তিন শ' টাকাতেই হবে। কার্পেট কিন্তু পার্শিয়ান কিংবা বোখারার, জমা রক্তের মতন ঘন লাল, কিনারায় সাদাসিধে ফুলের কাজ। নতুন ও পুরাতনের কন্ট্রাষ্ট খুলবে ভাল। সবই এক প্যাটার্ণের হবে—এটা ছিল আগেকার রুচি, এখন ব্লাউজ-পীস্ আর সাড়ির নক্সা পৃথক। তাই হওয়াই সঙ্গত, কারণ এটা ভারতবর্ষ, বয়েল-গাড়ি ও মোটর গাড়ি, উভয়ই চলছে এখানে। আসবাব-পত্র আপাতত বিদেশী আধুনিক হোক, পরে যদি সত্যকারের ভাল দেশী প্যাটার্ণ পাওয়া যায়, তখন বেছে নিলেই হবে। কাণপুরে ক্রোমিয়ম প্লেটের আসবাব পত্রের দোকান খুলেছে এই সেদিন। রমলা ও বিজন গিয়ে তাই কিনে আনলে। বাংলোর দোতলায় ছোট একটি ঘর, কাপ্তেনের, বিজনের মতে সেটা যেন খগেন বাবুর প্রকৃতি বুঝেই প্রস্তুত। সুজনদা এলে খগেন বাবু নীচে থাকবেন, কিন্তু সুজনদার আসবার নাম নেই! বাংলোর সামনে ছোট একটি লন্, বিলিয়ার্ড টেবিলের কাপড়ের মতন মসৃণ, পাশে

মরশুমী ফুলের বিছানা কাটা জ্যামিতির আকারে। প্যান্ট্রিটা ভাল, তবে একটু ধোঁয়া যে হয় না তা নয়। ধোঁয়াটা খগেন বাবুর ঘরে যায়। খগেন বাবুকে ধোঁয়া থেকে বাঁচাবার জন্য নতুন ষ্টোভ কিনতে হল। বেয়ারা, বয়, বাবুর্চি নিযুক্ত হবার পর বিজন ধরে বসল সব চাকর-বাকরকে খদ্দর পরতে হবে। রমলা উত্তর দিলে, 'ধোপার অতিরিক্ত খরচটা তবে তুমিই দিও।' কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধেরই জয় হল—ফর্সা, ধপধপে খদ্দরের আচকান ও টুপীতে যেমন মানায় অমন কিছুতে নয়।

প্রথম চায়ের দিনে মাত্র বাইরের তিনজন, আর বিজন, অবশ্য খগেন বাবু। তিনজনের মধ্যে একজন দেশী মহিলা, একজন ইংরেজ পুরুষ, এবং অন্যজন একটি ভারতীয় অধ্যাপক। এই ভদ্রলোক অকস্‌ফোর্ডে কাটিয়েছেন বছর আষ্টেক, মডার্ণ গ্রেটস্‌-এর ছাত্র, সেখানকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী হন। সেখানে এত জনপ্রিয় হন যে পরীক্ষার কিছু আগে এপেন্‌ডিসাইটিস অপারেশন হবার জন্য পরীক্ষা দিতে যখন তিনি পারলেন না তখন টিউটর, ফেলো, প্রোফেসর ও কর্তৃপক্ষ একবাক্যে তাঁর জন্য অনুপস্থিতির ডিগ্রী অনুমোদন করলে। ভদ্রলোক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের কর্ণধার ছিলেন বিলেতে, কন্টিনেন্টে যখনই ভারতীয় কিংবা অ-ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস বসত তখন তাঁকে না হলে চলত না। বিজনের সঙ্গে আলাপ টেনিস-কোর্টে খেলেন ভাল, কিন্তু ম্যাচ জেতবার মেজাজ নেই, বিজনেরই মতন। মতামতে বাম-মার্গী, লেফটিষ্ট। চায়ের টেবিলে খগেন বাবুর সঙ্গে একতালে পা ফেলবার মতন লোক বটে, তাই তিনি এসেছেন।

কথাবার্ত্তা সুরু হল সোভিয়েট-রাশিয়ার ট্রায়ালগুলো নিয়ে। খগেন বাবুর মতে ওদেশের আধুনিক অভিব্যক্তি ও শাসন পদ্ধতিতে কোথাও একটা গলদ আছেই আছে, নইলে এতগুলো ধুরন্ধর যারা লেনিনের সঙ্গে কাজ করে গণতন্ত্রটাকে দাঁড় করিয়েছিল তারা হঠাৎ ইম্পিরীয়ালিষ্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র সুরুই বা করলে কেন? যদি ষড়যন্ত্রটা সত্যিই না হয়, তবু অন্ততঃ এটুকু বুঝতে হবে যে ষ্টালিনের শাসন

জনপ্রিয় নয়। অধ্যাপক উত্তর দিলেন যে ষ্টালিনই লেনিন-পন্থী, এবং ট্রট্‌সকীর দল ঘুষ খেয়েছে সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে। খগেন বাবু যুক্তিটা গ্রহণ করলেন না, কারণ ঘুষের আর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ কে লেনিনকে বেশী বুঝেছে, ষ্টালিন না ট্রট্‌সকী, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ লেনিন নিজে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে কার্ল মার্কস্‌-এর মতামত অদল বদল করেছেন, তাঁর থেকে দূরে সরে গেছেন। কে-কতটা কার অনুযায়ী সেটা মুখ্য নয়, প্রধান হল গতি, এবং গতির অবস্থা অনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন। অধ্যাপক বল্লেন, সেই হিসেবেও ষ্টালিন নমস্য। খগেন বাবুর মতে নমস্কার পরে প্রাপ্য, যখন পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে অন্যায়ের অবসান হবে, ষ্টালিনের রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। লেনিন ও ষ্টালিনের ব্যক্তিগত কথা উঠল। খগেন বাবু বল্লেন, যদি লেনিনের স্ত্রী, যে আবার লেনিনের শিষ্যা ও সহকর্ম্মী ছিল সেও যদি লেনিনকে না বুঝে থাকে তবে অবশ্য নাচার! অধ্যাপক আপত্তি তুললেন যে স্ত্রী হলেই স্বামীকে বুঝবে এমন কোনো ঐশী আজ্ঞা নেই—বরঞ্চ, না বোঝাই স্বাভাবিক; কমরেডরাই এঁই ব্যাপারে বেশী অধিকারী। অধ্যাপক মশাই রমলার টেবিলে চলে গেলেন।

ইংরেজ অতিথিটির বয়স কম, ভারতবর্ষে নতুন এসেছে কাণপুরে একটা ম্যানেজিং এজেন্সীর য়ুরোপীয়ান এসিষ্টাণ্ট হয়ে। হাতের কব্জী ভীষণ মোটা, মাথাটা প্রকাণ্ড, বৃষস্কন্ধ, চোয়াল চৌকো ও ভারি, চোখ গাঢ় নীল ও ছেলেমানুষী দুষ্টুমি-মাখান হাসি। ভারতীয় মহিলা 'রণি' বলে ডাকছেন, আর ছোকরার গাল ও ঘাড় লাল হয়ে উঠছে। অধ্যাপক তার পাশে যেতে সে দাঁড়িয়ে উঠল। ভারতীয় মহিলা, ডাকনাম বেবী, সকলেই ডাক নাম ব্যবহার করছে, রণি'র পিঠে একটি হাত রেখে বল্লেন, 'সে হয় না, রণি, অমন মীন হোয়ো না, আপনিও বসুন।' বিজন ঠাট্টা করলে, 'ভয় নেই বেবী, তোমার রণিকে নিয়ে ভাগবো না, খগেন বাবুর সঙ্গে আলাপ নেই বুঝি রণির?' বিজন রণিকে নিয়ে গেল খগেন বাবুর টেবিলে, 'খগেন

বাবু, পরিচয় করতেই হবে রণির সঙ্গে।' বিজন বাঙলায় চুপি চুপি বল্লে, 'এখনও সেদ্ধ হয় নি, মেলামেশা করতে চায় ভারতবাসীর সঙ্গে।' রসগোল্লা ও সিঙ্গাড়া খেতে যেন না ভোলে, রণিকে উপদেশ দেবার পর বিজন রমলার টেবিলে গেল। সকালে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা সংবাদে সে খুশী হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রণি উত্তর দিল যে প্রকৃতপক্ষে ওটা সম্ভবতঃ ষ্ট্রাইক নয়, লক-আউট; তবে লেবার-কমিশনার নিযুক্ত হলে, বিনা অজুহাতে, কেবল মজদুর-সভার সভ্য হবার জন্য 'ছুটি' পাবার ভয় খানিকটা কমতে পারে। খগেনবাবু সন্দেহ প্রকাশ করাতে রণি বল্লে, 'যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ আসে তবে রায়ের মর্য্যাদা বাড়বে; অবশ্য, একটা ছোট অসুবিধা এই যে মজদুরের ব্যাপারে হয়ত বা পুরানো নথি পাওয়া যাবে না, এবং অন্য দেশের নথিও চলবে না। শ্রমিক-ধনিকের সম্বন্ধের জন্য দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মোকদ্দমার মূলসূত্রও ঠিক খাটে না। একটু নতুন ধরণের জুরিষ্ট হওয়াই বোধ হয় মন্দ নয়। ব্যাপারটা ঠিক ল' আর অর্ডারের পর্য্যায়ে পড়ে না।' বেবী একটা প্লেট থেকে কাঁটা দিয়ে খাবার তুলে রণির প্লেটে দিয়ে বল্লে, 'রণি, এটা খাঁটি দেশী খাবার—বাঙালী মিঠাই নয় বটে, তবে বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান, রমার নিজের পেটেণ্ট, পছন্দ হবে কি না জানি না, তবে ফ্যাট নেই।' রণি লাল হয়ে সবটাই খেলে। খগেন বাবু প্রশ্ন করলেন যে মজুরীর নিম্নতম হার বেঁধে দিলে মালিকের, তাঁর কোম্পানীর, কোন ক্ষতি হবে কি না। রণি এপাশ ওপাশ চেয়ে উত্তর দিলে, 'ওটা ঠিক হিসেব করে দেখি নি। মজুরদের বাড়ীগুলো অসম্ভব নোংরা, যদি ভাল বাড়ীতে থাকবার সুবিধা তারা পায় তবে গোলমাল অনেকটা মিটে যায়।'

খগেন—'ঐ মজুরীতে দুবেলা দু'মুঠো অন্ন জোটে না ত' ভাল বাড়ির ভাড়া!'

রণি—'অবশ্য ওদের খরচও কম। সকলের ধার আছে জানি, খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর। তবে মজুররা যদি একটা কো-অপারেটিভ সমিতি খাড়া করে, মিউনিসিপ্যালিটি জমি

দেয়, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আগাম টাকা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে, তবে বাকী টাকা মালিক ও গবর্ণমেণ্ট কেন দেবে না বুঝি না।'

খ—'মালিকরা যদি সাহায্য করে তবে তারা কি প্রতিদান প্রত্যাশা করবে না? যেমন ধরুন মজদুর-সভার সভ্য না হওয়া?'

র—'তবে গবর্ণমেণ্টই সব টাকা দিক। গবর্ণমেণ্ট এখন ত' জনসাধারণের!'

খ—'গবর্ণমেণ্ট এই সেদিন এল, টাকাই বা কোথায়? আমি ত' তাই চাই, কিন্তু তার সম্ভাবনা দেখি না। মালিকরা কি রাজী হবে?'

র—'তা ঠিক। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা লোকসান হল প্রহিবিশনের জন্যে, একজনের খেয়ালের দাম দেওয়ায়। মালিকরা কি বাধা দেবে? জানি না।'

বেবী এসে বল্লে, 'রণি, তুমি কি আমাকে লিফট দেবে? আজ আবার রিটার ডিনার, গঙ্গার ধারে, একটু বোটিং হবে। তুমি আবার 'ব্লু' ছিলে...এখানে তোমাদের বোট মিলবে না সাবধান করে দিলাম। কি কথা হচ্ছিল?' রণি আমতা আমতা করে বিষয়টি উল্লেখ করাতে বেবী বল্লে, 'তা ঠিক, মজুরী অত্যন্ত কম। তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, লজ্জার কথা, কিন্তু না মেনে উপায় নেই, আমাদের দেশী মিল্‌গুলোতেই সব চেয়ে কম...আর তারা মজুরদের থাকবার বন্দোবস্ত যা করে তার কথা না তোলাই ভাল। অবশ্য আমি তাদের পুরো দোষ দিচ্ছি না। লাভ তারা করে, কেনই বা করবে না? লাভের অর্দ্ধেক যে কংগ্রেস ফণ্ডে যায়!' ইংরেজ যুবকের মুখে লাল রঙ চড়ল, মৃদু আপত্তি জানাতে বেবী হেসে বল্লে, 'রণি আরো কিছুদিন কাণপুরে থাক, বুঝবে এখানকার আজব পলিটিক্‌স্ আর ইকনমিক্‌স্! কি বল বিজন?'

বিজন—'অনেকটা সত্যি! আমাদের কংগ্রেস ক্যাপিট্যালিজমের মুখপাত্র, সব দিক থেকেই।'

বেবী—'বিজন, তুমিই তা হলে রমাকে নিয়ে আসছ রিটার পার্টিতে। সে আমাকে ফোন্ করলে দু দু'বার। বিজন, এবার দেখব!'

বিজন—'কি যে বল, বেবী!' বেবী ও রমলা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'খগেন বাবু, দিদিকে নিয়ে যেতে পারি?'

খ—'নিশ্চয়ই। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন?' অধ্যাপক বল্লেন, 'কিছু যদি না মনে কর বিজন, রমা দেবী, আপনি কি আমার চালনাতে বিশ্বাসী নন? অবশ্য এটা অক্সফোর্ড নয়, স্পীড লিমিট রয়েছে এদেশে। তবু কিছু থ্রীল্ দিতে পারব ভরসা রাখি। আমি ওঁদের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। বিজন, তুমি ফিরিয়ে এন।' রমলা হেসে সম্মতি দেওয়াতে বেবী আর বিজন একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। 'প্রোফেসার, আপনিও পার্টিতে চলুন না?' 'আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে—পেন্ ক্লাবের তাগিদ এসেছে...কিন্তু রমা দেবী, ড্রাইভার হিসেবে সুনাম আমার এককালে ছিল, বিজন, তুমিই না হয় রণিদের নিয়ে চল।' রমা পোষাক বদলে প্রফেসারের টু-সীটারে উঠল, বেবী রণির গাড়িতে, এবং বিজন নতুন গাড়িতে একলা চলল, একবার ক্লাব হয়ে যাবে। বেবী—'দেরী কোরো না বি, রিটা চটবে, চটলে তাকে বড় ভাল দেখায়, কিন্তু রাগ পড়লে, 'বি, রিটা আর বিউটি থাকে না।'

বিজন—'ডোণ্ট বি সিলি।'

ওপরে যাবার সময় রমলার ঘর দিয়ে যেতে হয়। ড্রেসিং টেবিলের তিন দিকে আরশি, কাঠের ওপর কাচ, কাচের শিশি, পাউডারের বাক্স, রূপোর ব্রুশ, বিছানার ওপর হরেক রকমের ব্লাউস, সাড়ি, কোণে জুতোর সারি, নানা রঙের, ফিতের

বাহার, উঁচু খিলেন, নীচু, সমতল, স্থাওলা, নাগরা নেই, সাবিত্রীর কাছে নাগরা পরে আসত, এখানে বাইজীরা পরে, তাই বোধ হয় অচল। কাচের পেরেক দেওয়ালে, ড্রেসিং গাউন ঝুলছে, বলাকা উড়ছে নীল আকাশে। উগ্র গন্ধ ঘরটায় মাখান...চড়াং করে মাথায় চড়ে চন্‌মনিয়ে দেয়, পাঁচুলী, কাঁচুলি, নাচওয়ালী,··· বেশ্যাবৃত্তির শক্‌থেরাপী প্রক্রিয়া···বোশেখ মাসের রৌদ্রে চাঁপার খর গন্ধ উদ্‌গত হয়—কিন্তু গ্রীষ্মের গুল্‌মোহর, আমলতাস মাত্র রঙের একজিবিশ্যানিজম, কামবিলসন, গন্ধ নেই লীলা প্রকাশ, লীলাও নেই, উলঙ্গতা। অত সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও ঘরটা যেন বীভৎস রকমের নগ্ন মনে হয়। সিকার্ট-এর ছবি টাঙ্গান থাকলেই শোভন হত। মেয়েদের যথার্থ স্থান রঙ্গমঞ্চে, সেইখানেই তাদের দেখায় ভাল, গ্রীণরুমে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, স্বামীরও। আয়নার টেবিলে কার চিঠি খোলা পড়ে আছে। রমলা সেজেছে তাড়াতাড়ি।

খগেন বাবু ওপরে নিজের ঘরে গেলেন। বিজন নাম দিয়েছিল 'আপার ডেক্', রমলার ভাষায় 'ক্যাপ্টেন্‌স্ কেবিন'। ক্যানভাসের চেয়ারে বসলে চোখে পড়ে ধূসর আকাশ ভেদ করা কালো কালো মোটা আঙুল, তাদের ডগাগুলো একধারে বেঁকেছে, পাঁড় মাতালের বুড়ো হাত কাণপুর সহরের ওপর, পক্ষাঘাতেরও হতে পারে, কুষ্ঠ রোগীর? কেন এই ধরণের অদ্ভুত অস্বাভাবিক উপমা, প্রতিমা ভেসে ওঠে? তিক্ত রসের উদ্‌গার, কিন্তু কেনই বা রস তেতো হবে? এইত' কাণ-পুরেই সাধারণ জীবনযাত্রার একটি স্তর নিঃশেষিত হল এবং নতুন স্তরের আরম্ভ দেখা গেল। এখানেই ত' সফীক, করিম, মহবুব প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য 'সমঝোতা' হল বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রয়াসই সফল হবে কেন? এই আশার অন্তরে একটা দাম্ভিকতা আছে, সেটাই বা থাকবে কেন? হিমালয় একবার বিনয় শিখিয়ে-ছিল তার বিরাটত্ব দিয়ে, কিন্তু মানবেতিহাসের প্রগতি নম্রতা শেখায় তার বন্ধুত্ব, তার সমবায়, তার কর্ম্মের সাহায্যে। এখানে মতবাদের ঔদ্ধত্য থাকতে পারে না, এখানে পূর্ণতার কামনা নেই, আছে ও থাকবে কেবল আবর্ত্তন-প্রবণতার স্বীকার

এবং সেই স্বীকৃতিতে আত্মনিমজ্জন। এটা মেয়েলী নম্রতা নয়, বরপক্ষের সামনে কিশোরীর চোখ তুলে চাইবার অক্ষমতা নয়, এ বিনয় পুরুষালী ..অর্থাৎ ব্যক্তির অতিরিক্ত মহানকে পরিণতিরই সম্ভাবনা হিসেবে সহজে গ্রহণ করা। মেয়েরা গ্রহণ করে, যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু খাপ খায়। সংখ্যার দিক থেকে সেটা বেশী, তাই তার বোঝা ভারি, মেয়ে-ভক্ত পুরুষেরা ভারের গুরুত্ব দেখে দরদ জানায়। তার বদলে একটা বড় সত্যকে মেয়েরা যদি আপন বলে স্বীকার করে নিত তবে তাদের সঙ্গে এক কদমে চলা যেত। নন্দলাল বসুর ছবিতে পুরুষ এগুচ্ছে, মেয়ে এক পা পিছিয়ে...এতদিনে সাঁওতাল মেয়েটি রান্নাঘরের দাওয়ায় হাঁড়ি চাপিয়েছে, আর পুরুষ কয়লার খনিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সরাবখানায় হাঁড়িয়া আর তাড়ি খাচ্ছে। ঘুরে ফিরে আবার সেই তিক্ততা আসে।

প্রফেসার মদরলঁ-র 'লেপার্স' দিয়ে গেছে তাকে, এবং রমলার জন্য জুল্ রোমঁ্যা-র 'র‍্যাপচারস্ অব দি ফ্লেশ'। চমৎকার শ্রমবিভাগ! লোকটি একটু ভোঁতা। অধ্যাপকের মতে মদারলঁ-ই ফরাসী অধঃপতনের প্রতীক, রচনাভঙ্গী না কি অপূর্ব্ব! নায়ক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর, প্রেম থেকে অব্যাহতি চায়, অথচ কাম বজায় রেখে। কিন্তু অতটা স্ত্রীবিদ্বেষ রোগের চিহ্ন। স্ত্রীবিদ্বেষ বিদ্বেষের অঙ্গ, বিদ্বেষের পিছনে থাকে চাহিদা, প্রত্যাশা, সেটা যত অস্পষ্ট, ততই হতাশা, বিদ্বেষ ততটাই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপক ও ভাসমান অবস্থা অস্বস্তির, তাই একটা বিষয় চাই যার চারধারে বিদ্বেষ গ্রথিত হতে পারে, ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বিষয় স্ত্রী, তাই স্ত্রী-বিদ্বেষ, সেই থেকে স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ। সাধারণ—বিশেষ-অবিশেষ—এই হল মানসিক বিবর্ত্তন। স্ত্রীর বদলে য়িহুদী জাতি, হিন্দুর পক্ষে মুসলমান, মুসলমানের পক্ষে হিন্দু হলেও বেশ চলত, চলছেও! মেয়েমানুষ হাতের কাছে, তাই বিদ্বেষের প্রকাশ সাহিত্যিক। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে ফরাসীরা দক্ষ। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায়। লোকে বলে ওরা মেয়েমানুষকে জীব ভাবে, এবং

বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান গণ্য করে। তাতে আপত্তি নেই, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ভাবপ্রবণতার চেয়ে ভাল। ব্যাপারটা অন্য রকমের। মেয়েরা এক স্তরের জীব নয়, এক শ্রেণীর হলেও ওদের ক্রমবিকাশের হার ও ধারাই ভিন্ন, তার ওপর শ্রেণীগত মনোভাব ত' রয়েইছে। প্রত্যেক মেয়েই বুর্জ্জোয়া, কেউ উঁচু থাকের, কেউ নীচু থাকের। পুরুষ হয় জন্মাবধি, না হয় বুদ্ধির জোরে খানিকটা জন-সাধারণের অন্তর্গত, কিন্তু মেয়েদের চরিত্রে একটা 'ক্যাপিলারিটি' থাকেই থাকে। রমলা ঘর ভেঙে চলে এল, তবু শ্রেণীর দেওয়াল তার অটুট রইল। মদারলঁ এ খবরই জানে না। মাকাল-ফল বইটা, অধ্যাপকেরই উপযুক্ত খাদ্য।

কেন অতবার অধ্যাপকের কথা ঘুরে ফিরে আসে! দোষ কি কেবল তারই? হিংসা? ছিঃ, তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল! অধিকারই বা কোথায়? যে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে সে নিজের সকল কর্ম্মের ওপর স্বাধিকার অর্জ্জন ও বিস্তার করেছে। সুজন রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহ...মনে হয়। তার সঙ্গে অবশ্য অধ্যাপকের তুলনাই হয় না। সুজন যদি আসে, অধ্যাপকের ব্যবহার লক্ষ্য করে আনন্দ পাওয়া যাবে। দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রমলা খুলবে ভাল। কিন্তু রমলাকে খেলার সামগ্রী ভাবতে লজ্জা হয়। সে যত পারে খেলাক, কিন্তু লোকে তাকে খেলনা ভাববে কেন? রমলার সাজ, রূপ, মাধুর্য্য, কথা বলবার ভঙ্গী দেখে এরা মোহিত হয়েছে, রমলা তা জানে, তাইতে সে খুশী। কিন্তু মোহিত হবার অর্থ কি? অর্থ এই যে রমলা একটা মাংসপিণ্ড, হাড় ও মাসের এক ধরণের ছক্, সে ছকের নতুনত্ব আছে, চঞ্চল করবার শক্তি আছে, চমক লাগাবার জাদু আছে। তবু যে অংশটা তারা নির্ব্বাচন করে নিলে, সেটা তার জৈবাংশ। এটা তার অপমান। রমলা ভাবে খাজনা, রাণীর প্রাপ্য। বোকা মেয়ে!

রমলাকে অপমানিত হতে দেওয়া অন্যায়। সুজনের এসে কাজ নেই,

অধ্যাপকেরও এসে কাজ নেই, বিজনেরও তাকে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। রমলার কষ্ট হবে, সে একলা থাকতে পারে না, তবু অপমানিত হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। সুজনকে আসতে মানা করাই মঙ্গল। খগেন বাবু একটা টেলিগ্রাম ফর্ম্মের ওপর সুজনকে লিখলেন, 'প্ল্যান অনিশ্চিত, কবে আসবে পরে জানাব।' বয়কে ডেকে তার অফিসে পাঠালেন, বয়ের কাছেই টাকা আছে। রমলা অপমানিত হবে দুজনের টানাটানির মধ্যে। নতুন পরিবেশে সে থাকতে পারবে না, এখানে সব নতুন, রমলার জীবনধারা পর্য্যন্ত নতুন মুখ নিলে! তাকে আসতে বারণ করাই মঙ্গল।

মঙ্গল, মঙ্গল, মঙ্গল···কে কার মঙ্গল করে! মঙ্গল-কামনা মনের জুয়াচুরী। এটা মঙ্গলেচ্ছা নয়, হিংসা, রাগ, দ্বেষ···এত বিজ্ঞান-চর্চ্চা এত মার্ক্স পড়া, এত বিশ্লেষণের পরও স্বার্থের জন্য মনটা সেই ধর্ম্মের ফন্দী খাটাবে? নিজের প্রতি ঘৃণা আসে।

যখন বিজন আর রমলা ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

বিজন—'খগেন বাবু নিশ্চয় খাননি! একটু দেরী হয়ে গেল; বেয়ারাকে বল্লেই পারতেন। আমরা খাব না, রমাদি বুঝি বলে যায় নি? এসে পর্য্যন্ত রমাদি কোথাও বড় একটা খায়নি তাই। গাড়িটা চমৎকার চলছে। রমাদি কি ভীষণ পপুলার হয়েছে কি বলব!' রমা ভেতরে গিয়ে একা সাহেবের জন্য ডিনার দেবার হুকুম দিলে। রমার মুখে রঙ এসেছে···মাখা রঙ নয়, স্বাভাবিক··নতুন রূপ পেয়েছে...কোথায় সঞ্চিত থাকে কে জানে, হাওয়া একটু এদিক থেকে ওদিকে ঘুরল, অমনি ফুটল লালিমা, খুলল লাবণ্য। তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে। কেন রমলার রূপ উথলে উঠবে না, নতুন বৌএর সামনে বরের বাড়ির দুধের মতন। বেচারি...মা হতে পেল না···মাতৃত্বের সংক্রান্তি এল না, তাই কি প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুধাবন, ইন্দ্রিয়ের মৃগয়া! চার ধারে বরফ পড়ছে, শিকার গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, তিন মাস ঘুমুবে মড়ার মতন, দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত, বর্ব্বর

মানুষ তখন কি করে? শিকারের উত্তেজনা চাই, সুরু হল ম্যাজিক, দশকর্ম্ম, নাটক অভিনয়। কিন্তু ব্যাপারটা 'এরসাৎজ', নক্‌লী চীজ, আসলটা শিকার। রমলা মন থেকে তাকে সরিয়েছে, সুজনকে দিয়ে ভরাবে, না অধ্যাপকের সাহায্য নেবে? এ-ব্যাপারে মেয়েদের আলস্য নেই। হঠাৎ মনে হয় নিজেও ঐ কাজ করে আসছেন, তবে মানুষ দিয়ে পূরণের চেয়ে মতামত দিয়ে শূন্যতার ভরাট করেছেন, আদর্শবাদ থেকে মার্ক্সিজম পর্য্যন্ত। রমলা মধ্যে এসেছিল ইণ্টার-মেৎসোর মতন—দুটো রাগের মধ্যে জনসাধারণের তৃপ্তির জন্য চটকদার গৎ-এর মতন। তাই কি! অতটুকু রমলার ন্যায্যতা! অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অপরাধবোধের বশে অধ্যাপক ও সুজনের প্রতি মনোভাবকে হিংসার রূপান্তর বলে মনে হয়। প্রীগ্, প্রীগ, ভিক্টোরীয়ান যুগের ভণ্ড ভারতবর্ষের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত। ভেঙ্গে যাক চুরে যাক এই শক্ত মালাটা সফীকের নির্ম্মম্ আঘাতে।

'খাবার এল। টেবিলের পাশে বসে বিজন বল্লে, 'দেখলে রমাদি ওদের কাণ্ডটা! একটা ইংরেজ পেলে আর রক্ষা নেই! এইতেই ওরা মাটি হয়। ছোকরা ছিল ভাল, কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। যেন অভিমন্যুর মতন ঘিরে রয়েছে! বেবীর চোখ যেন গিলে খাচ্ছে! দাস মনোভাব আমাদের হাড়ে হাড়ে, রক্ত-মাংসে। রণিকে আপনার কেমন লাগল?'

'খগেন—'বেশ কন্‌ক্রীট্, ব্যবহারিক দিকটাই নজরে পড়ে প্রথমে।'

বিজন—'ঠিক ধরেছেন, খাঁটি ইংরেজ, চিন্তার দিকটা একটু ভোঁতা। ইডীয়লজি নেই।'

'খগেন—'বাঁচা গেল!' বয় প্লেট বদলে দিলে। 'সে হিসেবে প্রোফেসার বেশ ধারাল।'

বিজন—'যাই বল রমাদি, রিটা ওঁকে নিমন্ত্রণ করতে পারত! কাণপুরে তত এক্‌স্‌ক্লুসিভ্ হলে চলে না, এখানে অতটা শ্রেণীবোধ অচল।'

খগেন—'প্রোফেসার ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের নন বুঝি ?'

বিজন—'এখানে একটা প্রাইভেট কলেজের সীনিয়র…বাপের পয়সা আছে, অনেক ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপকের চেয়ে আধুনিক। একবার কথাবার্ত্তা ভাল করে চালিয়ে দেখবেন। আইডীয়া খুব পরিষ্কার। উনি অনেকদিন থেকে বলছেন ধর্ম্মঘটটা ফেঁসে যাবে, কারণ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিরোধটা ডেমক্রাটিক স্তরের, এবং নেতৃত্বটা মধ্যবিত্তেরই হাতে থাকতে বাধ্য।'

খগেন—'তাই বুঝি! আমি যেন, অন্য রকমের মতামত পোষণ করেন ভাবছিলাম।'

বিজন—'ওঁকে একটু ভুল বোঝা স্বাভাবিক। অত আইডীয়ার ব্যবসা করলে ও-টুকু দাম দিতে হয়।'

খগেন—'আইডীয়া, আইডীয়ার হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন!'

বিজন—'আইডীয়ার প্রতি কবে থেকে বিমুখ হলেন! খগেন বাবুর বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েছে, রমাদি লক্ষ্য করেছ? তোমার কি হল আবার? এই ত' এতক্ষণ খই ফুটছিল!'

খগেন—'বিজন, তোমার রমাদি একটু খেয়ালী, কুহেলী, অর্থাৎ একটু মেয়েলী, একপ্রকারের adverb, ক্রিয়া-বিশেষণ।'

বিজন—'এতদিন পরে আবিষ্কার করেছেন! ছেলে বয়সে ওঁর খামখেয়ালে সুজনদা আর আমি ব্যতিব্যস্ত হতাম।' রমলা হেসে ফেল্লে। খগেন বাবু একটা কমলালেবু নিলেন।

খ—'বেশী বদলেছি, বিজন?'

বিজন—'তা একটু, বেশ একটু কঠিন হয়েছেন। সুজন দা যদি এসে পড়ে খুব ভাল হয়…আমার অন্ততঃ, তার একটা ব্যালান্স্ আছে যেটা আর কারুর মধ্যে পাই না। একটা হিউম্যানিটি, যেটা এদের মধ্যে কারুর নেই, নেই আমি

জানি, আপনি কতটুকু জানেন খগেন বাবু? এরা নিজেদের কল বানিয়েছে মজুরদের হয়ে লড়তে গিয়ে···যেটা শত্রু তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাই হয়ে গেল... মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের উপকার করবে! তা কখনও সম্ভব! আপনি কি ভাবে বিচার করেন জানি না···'

খগেন—'বিচার, বিশ্লেষণ ভাল লাগে না আর। কিন্তু, বিজন, বদলেছ তুমি, কিংবা, হয়ত, যা ছিলে তাইতে ফিরেছ, পিছলে গিয়ে।' বিজন অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বল্লে, 'আপনি জানেন না মোটেই··· আমি এখন যাচ্ছি...পরে সব কিছু দেখবেন অন্যায় কার ও কোথায়?' বিজন চলে গেল।

যাবার পর খগেন বাবু অনেকক্ষণ টেবিলের ধারে বসে রইলেন। রমলা উঠতে যাচ্ছে এমন সময় খগেন বাবু বল্লেন, 'ক্লান্ত হয়েছ, রমা?' হঠাৎ কণ্ঠস্বরে কোমলতা জড়িয়ে যায়...কতদিন রমা-সম্বোধনে মাধুর্য্য আসেনি, লোকের সামনে রমলা বলতেও লজ্জা হত, নামের পরিহারটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, বিজনের সামনে 'তোমার দিদি', এমন বন্ধু নেই যার কাছে 'রমলা' উচ্চারণ করা যায়, 'রমা' আরো ছোটো, স্বল্প-পরিসরে চিন্তার পদ্ধতি হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবেরই সুবিধা ঘটে, তাই ঘনত্ব কবিতার গুণ, রমা-র শেষে স্বরবর্ণ দীর্ঘ হয়ে ভাবপ্রকাশের অবসর দেয়, র-মল্-আ, হসন্তে আটকে যায়, দুটি কথার রমা—তান দেওয়া যায় আ-এর ওপর। 'রমা' যেন 'তুমি' মাখান···যেদিন প্রথম 'তুমি' বল্লে সেদিন সর্ব্বাঙ্গে কাঁপন লেগেছিল, সিঁড়ির ওপর থেকে, তার পরই সরে গেল···।

রমলা—'না, কেন?'

খগেন—'না, অমনই। বিশেষ কোনো কথা নেই। তোমাকে দেখাচ্ছিল ভাল।' রমলা নিজের ঘরে চলে গেল। সত্যি কোনো কথা ছিল না, কিংবা অনেক কথাই ছিল যার জন্ম হল না, বহু দিনের সঞ্চিত কামনার তীব্রতা সত্ত্বেও

অনাগতের আশঙ্কায় নিস্ফল হল, কামনা অন্য মুখ নিলে, কথা ঘুরে গেল, জানাবারই বা কি প্রয়োজন ? সবই নিরর্থক, মন অবসন্ন হয়, প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, ব্যগ্রতার অবসানে আন্তরিক পার্থক্যবোধ দানার মতন মনের তলায় থিতোয়। এটা ঘৃণা নয়, ক্লান্তি, যাতে সহানুভূতি ও অভিমানের আমেজ রয়েছে। রমলার প্রতি অন্যায় বিচার যেন না হয়, তার দিক একটা আছেই আছে, সে সমাজ ছেড়ে তাকে গ্রহণ করেছে—এটা মস্ত ত্যাগ। সেটা অস্বীকার করা মহাপাপ। কিন্তু পাপ পুণ্যই বা কেন ? স্বীকার-অস্বীকার দেনা-পাওনার ব্যাপার, হিসেব-নিকেষ ধর্ম্মজ্ঞানের বৈশ্যবৃত্তি। রমলা মানুষ···অতএব তার অস্তিত্বটাই মুখ্য, মেয়েমানুষ হলেও মানুষ।

অনেক রাতে রমলা খগেন বাবুর বিছানায় আসতে খগেন বাবু ব্যস্ত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলেন। 'রাগ হল ?' 'রাগ! রাগ কেন হবে ?' 'তুমি যদি বল, আমি কোনো পার্টিতে যাব না, কোনো সমিতিতে যোগ দেব না, কারুর সঙ্গে মিশব না।' নিশ্চল হয়ে খগেন বাবু উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই যাবে, সকলেরই সঙ্গে মিশবে, আমি ভুল বুঝব না। জীবনে যা যা করেছি তাই সব ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু, কি জান, স্থূল, মোটা-মোটা সম্ভাবনাগুলো খুঁটিনাটি ছোট্টখাট্ট টুকরো, কাটাকাটা ঘটনার চেয়ে বেশী মূল্যবান, বেশী দরকারী মনে হয় আজকাল। তাদের প্রতিকূল আচরণে শান্তি নেই, সেটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, নির্জ্জলা বোকামী···। এইটুকু বদলেছি, মাত্র।' হঠাৎ রমলা খগেন বাবুর কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'তুমি আমাকে ভাল দেখাচ্ছিল...ছিল বলবে কেন ? খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলাম যে ! তোমারও কি ভাল লাগে না ? আমি বুঝি বোকা, সাজলে-গুজলে আড় চোখে আবার দেখা হয়...' 'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে।' 'অধিকার... অধিকারের কথা তোলো ত' দেখো কি করি!' 'অধিকার নয় ? তবে কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য মানে...দুজনের সম্বন্ধটাকে দুজনেই ওপর তলায় নিয়ে যেতে চাইছে, চেষ্টা করছে—জীবনটাই যদি অচল হয়, তবে কর্ত্তব্য থাকে না, থাকে চাপ আর ভার...

মোহানা

সেটাও স্বাভাবিক, প্রত্যেকে প্রসারিত হবেই, বদ্ধপ্রাকার কিছু তোমার আমার সুবিধায় আপনা থেকে প্রশস্ত হবে না।' 'তুমি কী চাও?' 'তাই জানি না, অন্ততঃ তোমার কাছে; তবে আপাতত ভার একটু লঘু হোক। গরম পড়ে গেছে।' খগেন বাবু গলা থেকে রমলার হাত নামিয়ে দিলেন, পাথরের মতন ভারী। রমলা আবার হাত রেখে বল্লে, 'ঢের হয়েছে মশাইএর, অনেকক্ষণ রাগ দেখান হয়েছে, এইবার...না, আমি শুনছি না···নিজে ভেবে ভেবে বুড়ো হলে, আমাকেও বুড়ী হতে হবে সেই সঙ্গে?' 'তুমি কখনই হবে না।' 'উর্বশী বল!' 'তাই বটে।' 'আমাকে অপমান না করলে বুঝি হজম হয় না? বেশ, কাল থেকে আমি কারুর সঙ্গে মিশব না, মুখ হাঁড়ী করে কালপেঁচী সেজে ঘরের কোণে বসে থাকব, তোমার ভাল লাগবে? তবে জর্জ্জেট পরতে বল কেন? আহা, আমি যেন বুঝি না···কাল চল, একটা ভাল স্যুট পরে বেরোও, দেখো, বেশ ভাল লাগবে, অন্যেরও লাগবে গো লাগবে...ঐ যে বেবী মেয়েটিকে দেখলে...তবে ওর এখন রণির যুগ চলছে, রিটার সঙ্গে বয়েসের খাপ খাবে না, তা ছাড়া ও এখন বিজনের জন্যে পাগল, কেমন চালাকী করে বিজনের নৌকোয় গেল···দুঃখ হয়, লুইসী রাইনারের টয়-ওয়াইফ, কিংবা গুড্ আর্থ দেখেছ? যেন কাঁদতেই জন্মেছে, এ-যুগেও অমন হয়!' 'প্রোফেসার ছিল?' 'ওমা, তাই বল, আমি ভাবছি কে রে! হা ভগবান! ও যদি ফেউএর মতন ঘোরে আমি কোথায় যাব! তবে... আমি কিছুতে রাজী হইনি, বেবীর কাণ্ড, আমি আর হোস্‌টেস্‌গিরি করতে পারি না...ওমা, তাই বল? ধরা পড়েছে কেবল মেয়েরা, নয়?' রমলা খিলখিল করে হেসে খগেন বাবুকে টেনে নিলে। কাঠের মতন পড়ে রইলেন উত্তেজনা নিবৃত্তির যন্ত্র হয়ে...পার্টি থেকে ফিরে কেন অমন হয়! নিজের ওপর ঘৃণা ধরে নিষ্ক্রিয় অংশের অভিনয়ে, রমলা বুঝতে পারে, তার লজ্জা হয়, ধীরে ধীরে ব্রিজের ঘরে চলে যায়। যাবার সময় বলে, 'শুনছিলাম, সফীকের নামে ওয়ারান্ট বেরুচ্ছে!' 'কেন? সমঝোতা ত' হয়ে গেল!' 'মানুষ খুনের চার্জ্জ।' 'মানুষ খুন!' 'শিশু হত্যা।'

পরের দিন সকালে বিজন এল না। বিকেলে বিজন গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে ভেতরে এল। 'কি রমাদি? এখনও তৈরী হও নি?' রমলা গা করল না। খগেন বাবু বিজনকে সফীকের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। 'সফীক? তার শরীর খারাপ, বেশী। তার এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। এখানে আপাতত আর কি কাজ! ওধারে এলাহাবাদের ছাপাখানায় ধর্ম্মঘট হয়েছে শুনছিলাম। কৈ, রমাদি, শীগ্‌গির তৈরী হও।' রমলা তবু উঠল না দেখে খগেন বাবু বিরক্তির স্বরে বল্লেন, 'যাবার কথা দিয়েছ যেতেই হবে···যদি তোমাকে···'

রমলা,—'আমাকে তুমি কিছুই বলনি,...তুমি একটু থাম · প্লীজ—'

বিজন—'কেন, যাবে না কেন? আপনার অমত নাকি! কাজটা খুব ভাল··· ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপার···এতে দোষ হয়ত আমারই···এই কাল সব ঠিক, আর আজ কলকাটি বিগড়ে গেল! অত কথায় কথায় অভিমান করলে কমিটি চলে না! এই জন্যেই ত' বনে না তোমাদের সঙ্গে আমার!'

খগেন—'বাস্তবিক রমলা, এখন বিজনের মান থাকে কোথায়?'

বিজন—'আমাকে যদি বিপদে ফেলতে চাও তার অনেক সময় আছে। এখন লক্ষ্মীটি চল, সব পণ্ড হবে। বেবীর কর্ম্ম নয়, রিটা?···তার ধাতেই নেই গড়ে তোলা কোনো কিছু। তুমি শিখিয়েছ...তুমি না গেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে!'

খগেন—'আমি একটু বেরুব, কাজ আছে আমার।' বলা হল না সুজনকে আসতে মানা করার কথাটা...পরে সুযোগ হলে দেখা যাবে। রমলা সাজতে গেল ভেতরে।

ব্যাপারটা এই: ক্লাবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রমলার ওপর একটা গুরুতর কাজের ভার আসে। অনেক দিন থেকে ক্লাবের কাগজে কলমে একটা 'ওয়েলফেয়ার সেক্‌শন' ছিল, সেটা ঠিক চলছিল না একজন উপযুক্ত কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মসচিবের অভাবে।

সকলের অনুরোধে রমলা ঐ দিকটা একটু নজর দিতে স্বীকৃত হল। প্রথমে সে রাজী হয় নি, সহরে নতুন এসেছে বলে, কিন্তু সে আপত্তি টিঁকল না। কাণপুর সহরে শিশুদের কোনো অনুষ্ঠান নেই, অধ্যাপক বল্লেন, অথচ প্রত্যেক শিশুরই আর্টের প্রতি একটা সহজ আগ্রহ আছে, কেউ পারে ছবি আঁকতে, বিলেতে প্রায়ই শিশু-আর্ট প্রদর্শনী হয়, সে-সব ছবি দেখলে মনে পড়ে একধারে বুশম্যানদের চিত্র, অন্যধারে অতি আধুনিক, এমন কি পিকাসোর ইদানীং আঁকা ছবি ; কেউ পারে নাচতে...কত মেয়ে যে পীটার প্যান সাজছে তার ইয়ত্তা নেই ; আর গান গাইবার শক্তি প্রত্যেক ইটালিয়ান মেয়েরই আছে ; এ-দেশের শিশুদের মধ্যে কেন থাকবে না ? সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বরঞ্চ সেটা নষ্টই হয়, আজকালকার গ্র্যাজুয়েটরা কাণা ও কালা ; এতে ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই—তাই শিশুদের একটা ক্লাবের প্রয়োজন ; ইতিমধ্যে ঐ ওয়েলফেয়ার বিভাগ মেম্বরদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ সুরু করুক, সেখানে মধ্যে মধ্যে একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হবে, ছেলেরাই অর্কেষ্ট্রা তৈরী করবে, ছবির প্রদর্শনী খুলবে বছরে বছরে। বিজন অধ্যাপকের উদ্দেশ্য সাধু স্বীকার করল, তবে ঐ সব প্রচেষ্টার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, নচেৎ বুর্জ্জোয়া আমোদ প্রমোদে তার উৎসাহ নেই। অধ্যাপক তার দিকে চোখ টিপে চুপিচুপি বল্লেন, 'সামাজিক উদ্দেশ্য কি বলছ! আমি চাই এদের শ্রেণীজ্ঞান ঘোচাতে, ডি-ক্লাস্ করতে।' ঠিক হল, চ্যারিটি-শো হবে, পরে, এবং তার জন্য এখন থেকে রমলা দেবী ভার গ্রহণ করুন। অধ্যাপকের পীড়াপীড়িতে এবং প্রাণপণ সাহায্য প্রতিজ্ঞায় রমলার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। এখন রমলা ভার নিতে না নিতেই খবর এল যে দিল্লীর এক বড় সাহেব কাণপুর আসছেন শীগ্‌গির, একদিন মাত্র থাকবেন, তাঁর সামনে প্রথম অভিনয় হলে টাকা উঠবে বেশী। অধ্যাপক রমলাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, 'আমরা এমন চীজ্ দেখাব যা কাণপুরে কখনও হয় নি, ষ্টেজ হবে বাইরের প্রকৃতি, আপনি কেবল সামনে থাকবেন...আপনার উপস্থিতিই আমার

প্রেরণা, বাকীটা আমার প্রতিভা।' সেই মত রমলা কথা দিয়েছিল রিহার্স্যালে যাবার, এখন না গেলে সব ভেস্তে যাবে।

বয় কার্ড আনার সঙ্গে অধ্যাপক ঘরে এলেন। 'ভাবলাম, দেরী হচ্ছে যেকালে নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে।' রমলা এসে বিজনের সঙ্গে নিজের গাড়িতে উঠল। অধ্যাপক টু-সীটারে পিছুপিছু চল্লেন।

(১১)

একলা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না। অথচ সেদিন পর্য্যন্ত নিরালায় সাধনাই কাম্য ছিল। পাহাড়ে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ, বই-এর বনে বহু পুরাতন চীনে কবি, বহুদূরের মেকসীকান চিত্রকর, অতি আধুনিক আমেরিক্যান সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রদান-বর্জ্জিত সম্বন্ধ, শয্যায় সাবিত্রী ও রমলা, তবুও সেই দুরতিক্রম্য ব্যবধান দূর হল না। এ যেন এক একটী স্বরূপসিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায়। বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহ-চর্চ্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল। আজ রমলা স'রে গেছে, আন্দোলনের প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে-সেই। মাসীমা শুইয়ে দিতেন চাপা দিয়ে, গা চাপড়াতেন ঘুম আনাবার জন্যে,চোখের পাতাই বুজত, পাতার সরু ফাঁক দিয়ে মনে হত মাসীমার মুখ পিছু হটে দেওয়ালে, তারও পিছনে, বহু দূরে চলে গেছে। মজা লাগত, আর একটু পাতা খুলে চাইলেই মাসীমার মুখ ঠিক সামনে এসে যেত। দূরে ছুঁড়ে ফেলা আর কাছে টেনে নিয়ে আসা একপ্রকারের ছেলে-খেলা। এটা কিন্তু খেলা নয়। মাসীমা ঠিক বুঝেছিলেন রমলার সঙ্গে চলবে না...তাঁর মৃত্যুতেও বিরোধের অবসান হল কৈ? মাসীমা বুদ্ধি দিয়ে অবশ্য ধরেন নি, যুক্তিতর্ক তিনি পারতেন না, তবু প্রাথমিক ব্যাপারগুলো তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করত। কারণ জানতেন না তিনি, তবু সিদ্ধান্তে ভুলচুক ঘটত না। কারণ, কারণ, কেন এত কারণের পিছু পিছু ছোটা! রমলা পৃথক হয়েছে এই যথেষ্ট। মাসীমা ঘটনাকে গ্রাহ্য করতেন। আজ বড় বেশী মাসীমার কথা মনে উঠেছে। মায়ের আদুরে ছেলে, সে আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তাও এই দেশের,

তার ওপর শিক্ষিত, সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞান, মিলেমিশে প্রীগ্, এই প্রীগ্ মনকে চোখ ঠারতে ওস্তাদ, হাজার যুক্তি, লক্ষ জুচ্চুরি দিয়ে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আত্মবলি, কালো পাথরের ওপর রক্তপাত, নির্ম্মম কুঠারাঘাতে, পাথরের কুড়ুলে।

খগেন বাবু ঘুরতে ঘুরতে আস্তানায় এলেন। সফীক শুয়ে আছে। এ-কথা সে-কথার পর খগেন বাবু বল্লেন এখন কি উপায়ে এবং কোন দিকে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন।

সফীক—'নানা উপায়ে। সাহায্যের প্রয়োজন সর্ব্বদাই রয়েছে। টাকা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে,·· কিন্তু বাইরে থেকে, ভেতরে এসে নয়।'

খগেন—'কেন নয়? শিক্ষানবীশি করতে রাজি আছি।

সফীক—'সেটা কি সম্ভব হবে?'

খগেন—'আদিম অভিশাপ?'

সফীক—'তা ছাড়াও···'

খগেন—'কি সেটা?' প্রশ্ন করেই উত্তর শুনতে ভয় হয়।

সফীক—'শোনবার প্রয়োজন আছে?'

খগেন—'বলুন না। বোধ হয়, বুঝেছি।'

সফীক—'আমার মুখ থেকে শুনে লাভ আছে কি?'

খগেন—'এই ধরণের জীবন ত্যাগ করতে পারব না, এই বলেছেন?' হঠাৎ রমলার প্রতি মায়ায় মন ভরে যায়. একদিন সেই ত' সুনাম কাটিয়ে চলে এসেছিল, আজ নয় তার পার্টি আর প্রোফেসর জুটেছে, কিন্তু একদিন এসেছিল সে নিজে, এতে ত' ভুল নেই, এবং সেও হতাশ হয়েছে তাও নিঃসন্দেহ, সর্ব্বত্র সে হতাশ হয়েছে, মা হওয়া থেকেও বঞ্চিত হল, দোষ কি তার? খুঁজে বেড়িয়েছে পরিপূর্ণতাকে, অন্য মানুষেরই মতন, পার্থক্য এই যে সে মানুষের সম্বন্ধ চেয়েছে, মতামতের আশ্রয় ভিক্ষা করেনি। সুজনকে পেলে হয়ত সর্ব্বাঙ্গীন হত—ঐ সুতোটা খোলাই রইল, এ রকম অনেক থাকে, পুরুষে তোয়াক্কা করে না, মেয়েদের

সহ্য করতে হয়। রমলা পার্টি আর প্রোফেসর দিয়ে মনের ফাঁক ভরায়। ফাঁক ভরান ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে ভাল। সফীক রমলার কথা জানে না, বোঝে না। অপরিচিতের সঙ্গে অন্তরঙ্গের আলোচনা অশোভন লাগে। কিন্তু সফীকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, ভাবালুতা তার সামনে টিঁকতে পারে না।

সফীক—'অনেকটা তাই। আচ্ছা, বিজন আপনাকে কী বলেছে?'

খগেন—'কি বিষয়ে?'

সফীক—'একটা মড়া ছেলের ..সেটা পুলিশের হাতে গেল কেমন করে?'

খগেন—'ব্যাপারটা কি?'

সফীক—'ব্যাপার যাই হোক, বিজনই পুলিশে খবর দিয়েছে।'

খগেন—'শুনলাম হুলিয়া বেরিয়েছে?'

সফীক—'গুজোব তাই।'

খগেন—'তবে?'

সফীক—'আমি সস্তায় বাহাদুরী কেনার পক্ষপাতী নয়।' সে যাই হোক, পথ বেছে নিতে পারেই বা ক'জন? পার্টির প্রয়োজন স্বীকার করেন এখন?'

খগেন—'এখন করি।'

সফীক—'কি হিসেবে? যেমন করে লোকে গুরু রাখে, ধর্ম্মের গর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

খগেন—'সহকর্ম্মীও ত' চাই!'

সফীক—'দোষ দিচ্ছিনা কাউকে। অনেকেই ভাবে যে তারা বুদ্ধি খাটিয়ে পথ খুঁজে নিয়েছে, এক আধ কদম না এগুতেই খুঁৎ খুঁৎ সুরু হল, দম্ভের ভরে আরো দু'দশ কদম, তারপর হা-হুতাশ, ভেঙ্গে পড়া, সরাইখানায় বিশ্রাম। যখন বোঝা গেল যে এ-পথ তাদের নয়, তখন পথের নিন্দে ছাড়া উপায় কি! অথচ অভিমানটা থেকেই যায়, তারই বশে পুলিশে লুকিয়ে খবর দেওয়া পর্য্যন্ত সব কিছুই সম্ভব হয়। এটাও এক রকমের ডায়েলেক্‌টিক...কি বলেন?'

খগেন—'না, ওটা সঙ্কল্পের দুর্ব্বলতা, দ্বন্দ্ব নয়, দোলা।'

সফীক—'তাই। এবার ভাবছি আপনার কাছে একটু পড়াশুনো করব।'

খগেন—'শরীর ক্লান্ত হয়েছে, একটু অন্য কোথাও, ঠাণ্ডা জায়গায়, বিশ্রাম নিলে হয় না?'

সফীক—'ওদেরও একটু হাঁপ ছাড়বার সময় চাই, এই বলছেন? মজদুর-সভা সাবালক হয়েছে, এখন নেতা অবসর নিক—কেমন?'

খগেন—'ঠিক তা নয়, অবসরের সুযোগ নেই। লোকে জীবনটাকে কর্ম্মক্ষেত্র বলে। ক্ষেত পতিত রাখার প্রয়োজন আছে, কিন্তু পতিত রাখলেই জমি পোড়ো হয়ে যায়, তাতে নোনা ধরে, তখন মণ মণ গুড় ঢাললেও ফসল ফলে না। তা ছাড়া, যে একবার একটু ভাবতে শিখেছে, তার কাঁধ থেকে জোয়াল কখনও নাবে না। সত্যকারের আন্দোলন কখনও থামে না।'

সফীক—'তবে ঢিমে হয়, ঝুলে পড়ে, বেতালা-বেসুরো হয়, দেখেন নি? আবার ছন্দে সুরে ফিরিয়ে আনতে হয়।'

খগেন—'বেশ ত' ইতিমধ্যে মজদুর-সভা বুঝুক যে সমঝোতা হয় না, কখনও কুত্রাপি হয় নি। ততদিন আপনি একটু ঘুরে আসুন অন্যত্র।'

সফীক—'অত ভয় পাচ্ছেন কেন আমার জন্যে? নিজেকে অতখানি মূল্য দিই না। হুলিয়ার চার্জ্জটা কি?'

খগেন—'শুনছিলাম মানুষ খুনের। ওরা একেবারে পাগল!' খগেনবাবু তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন। সফীক জোরে হেসে উঠল, মুখ চোখের চামড়া কুঁচকে গেল, মমীর মতন, চোখের তারা দুটো ছোট্ট চকচকে কালো পাথরের কুচি হয়ে যেন ঠিকরে পড়বে...অকস্মাৎ হাসি থামতে খগেনবাবু চমকে যান...দাঁতের ওপর দাঁত, ঠোঁঠের ওপর ঠোঁট চেপে সফীক বলে, 'মিথ্যে কথা।' আবার মুখে রস এল, চোখের পাতা খুলে গেল, স্বরে আর্দ্রতা এল। খগেন বাবু বল্লেন, 'নিশ্চয়ই, আমি শুনছিলাম, ঠিক জানি না।'

সফীক—'বিজন ছেলেমানুষ তাই একেবারে ভড়কে গেছে। ওর এতে আসাই অন্যায় হয়েছিল। হুলিয়া-টুলিয়া সব বাজে কথা। আমার ওপর বিজনের দুর্ব্বলতা আছে জানেনই ত', তাই বেচারা ঘাবড়ে গেছে।' খগেনবাবু সোয়াস্তি পেয়ে বল্লেন, 'আমারও তাই সন্দেহ।' বিজন সেদিন অমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে কেন? ওরা শুকিয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের অপমান করেছে, বল্লে কেন? কোথাও একটা ভীষণ আঘাত পেয়েছে। তার ধাক্কায় একেবারে রমাদির কোলের ওপর··· কচি খোকা···ধাক্কা না ছাই, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা! ও আবার আঘাত পাবে! অভিমান হয়েছে মাত্র। 'মানুষ খুন, শিশু হত্যার চার্জ্জ' রমলার মুখ থেকে যেন বিষ উদ্গারের মতন বেরুল, রমলা কেবল ছুরি মেরে সন্তুষ্ট হল না, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছুরিটা অন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দিলে। সফীক খুন করেনি, যেন সেই রমলার অজাত শিশুটিকে গলা টিপে মেরেছে, যেন সেই আর কাউকে মেরে ফেলেছে···কে সে? সাবিত্রী? তারই ইঙ্গিত দিলে রমলা? শিশু, সেটা কাল্পনিক, সাবিত্রী, সে ত' মানুষই ছিল না, মাত্র রোমান্টিক, চঞ্চল শিরা উপশিরার মৃদু বাচালতা! 'একে খুনই বলে না।' 'নিশ্চয়ই না।' খগেন বাবু আর সফীক উভয়েই চমকে ওঠে। খগেনবাবু সামলে নিয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা, এখন ত' সরকার দেশের, তবু আপনাদের ওপর অত বিদ্বেষ কেন?'

সফীক—'সরকার যাকে বলে তা এরা নয়। কংগ্রেস অফিসে বসছে, ক্ষমতা অন্যের হাতে।'

খগেন—'নিজেদের হলেও আপনাদের সুবিধে হত না।'

সফীক—'সুবিধে অসুবিধের কথা ছেড়ে দিন। কংগ্রেস না হলে আরো ক্ষতি হত। ওটা জাতীয়তার ম্যাট্রিক্স্, যেমন মজদুর-সভা, করিমের কাছে। আচ্ছা, বিজন কি করে আজকাল?'

খগেন—'মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই, কি একটা ক্লাব হয়েছে, সেখানে যায় শুনছিলাম।'

সফীক—'ওকেই না হয় কোনো পাহাড়ে পাঠিয়ে দিন না। কানপুর অত্যন্ত নোংরা আর গরম।'

খগেন—'কোথায় আপনার যাওয়া উচিত, না বিজনের যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন!'

সফীক—'আমার? আমার যাওয়া হবে, তবে পাহাড়ে নয়। মিছিমিছি জেলে পচে লাভই বা কি! অবশ্য, একটু পড়াশুনো করা যায়। তবে আমি প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হব না। সে যাই হোক—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন...এখান থেকে সরে গেলে অনেকেই খুশী হবে, হাঁ অনেকেই, তবে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে মন চাইছে না।'

খগেন—'চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক গঙ্গার ধারে।'

গঙ্গার ধার বলে কিছু নেই। গঙ্গার পুল আছে, তাও একটা নয়, দুটো। একটা আবার দোতলা, ওপরে শকট চলে নিচে চলে নর, জলের ওপরে ভাসে খাপছাড়া চর। পুলের ফাটকের কাছে একটা এক্কার ওপর দুজনে সওয়ারী হলেন। এক্কাওয়ালা প্রথমেই ভাড়া চাইলে মাপ চেয়ে, নদীর ওপরে তাড়ির দোকানে অনেকেই সন্ধ্যের ঝোঁকে যায়, আসবার বেলা পয়সা দেয় না। তাড়ির দোকানের সামনে হল্লা হচ্ছে, একটা ফিরতী এক্কায় মাতাল মেয়ে গজল গাইছে, সঙ্গী বেহুঁস। যেখানে বাঁকা রাস্তা সোজা হয়েছে সেখানে সফীক এক্কা থেকে নেমে পড়ল...'আসুন, খগেন বাবু, একটু হাঁটা যাক।' সুন্দর পাকা রাস্তা, দুপাশে বড় বড় গাছ, ডালগুলো মিলেছে মাথার ওপর খিলেনের মতন। 'গাছ, বড় গাছ, বেশ, নয়?' 'চমৎকার।' গুঁড়ি বেঁটে, চার পাঁচ হাত ওপর থেকেই ডালগুলো ছুটে বেরিয়েছে, বিষ ফোড়ার মতন গাঁট, যন্ত্রণা ভুলে গেছে, বহু পুরাতন গরগণ্ড, একটা গাছ নতুন পোঁতা, আট-দশ বছরের মনে হয়, নিশ্চয়ই পুরানো গাছটা ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল, তার পাশেই একটা মোটা জাম গাছ, দুটো মিলে যেন পুরীর ভিখিরী, এক পায়ে

গোদ। ডাইনে বাঁয়ে দিগন্তব্যাপী মাঠ, অন্তঃসারশূন্য দূরত্ব, অর্থহীন অবকাশ, সমতল, নিথর, নৈর্ব্যক্তিক। 'মাঠের ধারে বসবেন?' 'আরো এগিয়ে।' 'আরো এগিয়ে একটা দোতালা বাড়ি আছে, আশ্রম, চরখা চালান থেকে চামড়ার কাজ পর্য্যন্ত সব কিছুই হয়।' 'তবে আর এগিয়ে কাজ নেই, ঠুকরে দেবে।' 'কি ঠোকরাবে, খগেন বাবু?' 'লাঙ্গলের ফাল, পৃথিবীর বুক চেরে সেটা বুঝি, সে-ক্ষত আরো গভীর হোক, ক্ষতি নেই, বরঞ্চ লাভ, সেটা ভালবাসারই চিহ্ন। কিন্তু একি! কলের চাকা জোরে ঘুরুক, চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া বেরুক, গা দিয়ে ঘাম ঝরুক গলগল দরদর করে, সেটা ভালবাসি আর নাই বাসি, বুঝি। বুঝি, মানুষের অন্তরের শক্তির বিকাশ হচ্ছে, তার জোরে জড়ও তার প্রাণ উজাড় করে দিচ্ছে। জানি, এই প্রাণেরও অপলাপ ঘটে, অপচয় হয়, দস্যুরা লুটে পুটে নেয়, তবু উৎসাহের বিরাম নেই, যদি একবার খুলতে পারেন। এই চরখা কাটা আর কুটির শিল্পে, এই হরিজন-সেবা আর ভজন গানে প্রেমের গভীরতা পাই না, অফুরন্ত স্রোতধারার গাম্ভীর্য্য পাই না, তাই...তাই ঠোকরান বলছিলাম। ঐ ধরণের এক একটা মেয়ে থাকে, সতী সাবিত্রীদেরই মধ্যে, বাইরে যেতে হবে না, তাদের ঠোঁট শুখনো···তাই টোকরান বলছিলাম, কাঠ ঠোকরার পালক দেখে কে বলবে যে পাখীটা ঠোঁট সর্ব্বস্ব।' সাবিত্রী কি ছিল? মধুচুষী··· রমলা? লালমণি।

মাঠের এই অসীম অবসর অসহনীয়। আকাশে তবু তারার ভিড়, জুঁই ফুলের যজ্ঞ, সমুদ্রে তবু রঙের ভিয়ান, পাহাড়ে তবু বাঁকা রেখার সুচারু সমাবেশ আর অসম পিণ্ডের সুষ্ঠু পরিমাণ, কিন্তু মাঠের এই ফাঁক কেবল জড়, মানুষের ভিন্ন গোত্রের। দূরে মাত্র তিনটে গাছ থাকলেও অবকাশ অর্থবাহী হত, সেই দিকে চেয়ে দূরত্ব অতিক্রম করা যেত, কিন্তু এই বিরাট শূন্যতা ভারতের ভাগ্যের মতনই নিরর্থক, নিরুদ্দেশ, নৈরাশ্যময়। আজ যদি রমলা পাশে থাকত সে চোখ খুলে দেখতই না। মধ্য এশিয়ার একটানা

প্রসারের শঙ্কায় তাতার মুঘল তাঁবুর ছাউনি ফেলে, রাক্ষসের মতন গেলে, একত্রে শীকার ধরে, লুটতরাজ করে, ঘোড়ায় চড়ে ছোটে, লড়ে, আবার ফিরে নাচে গায়, পাশবিক বৃত্তির চর্চ্চা করে, শূন্যতার পীড়ন থেকে যতটুকু অব্যাহতি পায় ততটুকু ভরাট করে দেয়। তাই তাদের গানে একটা ভীষণ দুঃখ থাকে ও সাজসজ্জায় অলঙ্কার যেন ভিড় জমায়। অথচ ছোটতেও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, ইংরেজ তাই সাম্রাজ্য চায়, তাই সহুরে মানুষ বারান্দায় বসে, তাই রমা পার্টিতে ছোটে, সফীক ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে। বড় ছোট দুয়েতেই দম্ আটকায়। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও শান্তি নেই। ভূমার ভয়ে মানুষ ক্ষুদ্র আর কৃপণ, সঙ্কীর্ণ আর গণ্ডীভূত; গুহার ভয়ে মানুষ ফাঁপা, গৃহের চাপে মানুষ গৃহহারা, স্বেচ্ছায় নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রকৃতির এমন একটা কিছু মর্ম্ম আছে যেটা মানুষের সম্পর্করহিত, তার সকল নাগালের বাইরে, যেটা এক রকমের সৃষ্টিছাড়া। সফীক কি ভাবে? বিজনের মতে সে প্রকৃতির মতনই নিষ্ঠুর, অমানুষিক। বিজন যাই ভাবুক না, সফীকের ধর্ম্ম মানুষ-সর্ব্বস্ব, মানুষকে ভিৎ করেই সেটা খাড়া হয়েছে। বিজন ভাবে নদীর ওপর পুল তৈরীর সময় যেমন ঃনরবলি দেওয়া হত সফীক তেমনই নতুন সমাজে পৌছবার জন্য মনুষ্যত্বের বলি দিয়েছে...রমলা বলছিল শিশু বলি...একটা না একটা বলিদান লুকিয়ে থাকেই কোথায়। কিন্তু খুনের চার্জ্জ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা, সফীক তাই কখনও করতে পারে! সফীকের ধর্ম্মটাই যে মানুষ-সর্ব্বস্ব, মার্ক্সিজম তা ছাড়া কিছু হতেই পারে না, তার আদ্যন্ত মানুষ, মানুষের চেষ্টাই তার শক্তি, প্রেরণা, সব কিছু।

তবু মনে হয় সফীকের ধর্ম্মে অব্যবহৃত প্রকৃতির স্থান নেই। অথচ সেটাও ত' মধ্যে মধ্যে গোল বাধাতে ছাড়ে না। এই পৃথিবীর নাড়ি আপন খেয়ালে ঠায়ে কি ধুনে চলছে, মানুষে গাছ কেটে নদীর মুখ ঘুরিয়ে না হয় তার ছন্দ সামান্য একটু বদলালে, কিন্তু প্রাথমিক লয়ের উত্থান পতন যা ছিল

তাই রইল। এত লোহা লক্কড় দিয়েও কি সেই আভ্যন্তরীণ মহা চুম্বকের খামখেয়াল বশে আনা গেল? হঠাৎ বাসুকীর মতন সেটা গা নাড়া দিলে, আর এল বিহারের প্রলয়। মহাত্মাজী যখন বল্লেন যে বিহারের ভূমিকম্প হল বেহারীদের পাপের জন্য সে-কথা শুনে তখন হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখর থেকে বনাবৃত পাদদেশ পর্য্যন্ত হাসির লহর খেলেছিল। ভূমিকম্পের মানবিক কারণ কি? মার্ক্সিষ্ট ব্যাখ্যা কি? নেই, নেই, নেই...সেটা দোষ নয়, কারণ সেটা মানুষের বাইরের প্রকৃতির ব্যবহার। মানুষ থেকে প্রকৃতি পৃথক···কত অকিঞ্চিৎ এই মানুষের দম্ভ!

সফীক একটু যেন হাঁপাচ্ছে···'কষ্ট হচ্ছে? আমারই অন্যায় হল এতদূর হাঁটিয়ে আনা।' 'মোটেই না, এবার ফেরা যাক। খুব ভাল লাগল... কতদিন দেখিনি, গাছপালা খোলা মাঠ···কতদূর পর্য্যন্ত গেছে জানেন? আমিই জানি না, নিশ্চয়ই অন্য জেলার মাঠে মিশেছে। বড় ভাল লাগল, খগেন বাবু। চলুন ফিরে, আপনার খাবার দেরী হচ্ছে।' তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ভয় হয়, রমলার অপমান মনে পড়ে...হঠাৎ কেমন মায়া আসে, এই ত' জড় প্রকৃতি থেকে জীব জন্মাল, এই ত' ফুলশুদ্ধ ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, নাড়ি কাট, নাড়ি কাট, মুখে ফুঁ দিসনি আর, মধু দে, মধু দে...সর্ব্বত্র মধু ক্ষরছে···। এই ত' একটু আগে জড় জীব জোড়া ছিল! এই খোকা কিন্তু বড় হবে, মানুষ হবে, নতুন পরিবেশ চাইবে, পুরাতনে ঘৃণা আসবে, মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতায় তার মন বসবে কেন? প্রকৃতি আর স্বভাব আবার তখন পৃথক হবে। সফীক ও খগেন বাবু ফিরে একায় উঠলেন।

সফীকের আড্ডার সামনে পৌছতে খগেন বাবু বল্লেন, 'চলুন না আমাদের ওখানে।' সফীক হেসে উত্তর দিলে, 'এখন বাড়ি ফিরতে মন যদি না চায় এখানেই আসুন, যা হয় কিছু খেয়ে নেবেন।' খগেন বাবু আপত্তি করলেন,

মোহানা

'না, এখন বাড়ি ফিরি। আপনি একলাই বিশ্রাম করুন। অনেক রাত হয়েছে। একটা কথা ছিল...কাল হবে···আপনি থাকছেন ত? যাবার আগে যেন খবর পাই।' সফীক বল্লে, 'খবর দেবার সুবিধা আমাদের হয় না, তবে চেষ্টা করব।'

* * *

অনেক দেরী হয়েছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই রমলা টেবিলের ধারে বসে আছে বেশ পরিবর্ত্তন না করেই, তার অনুষ্ঠান আজ সফল বড় সাহেবের উপস্থিতিতে, তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ কাজের সুযোগে, মন ভরাট সুখ্যাতি পেয়ে, মুখে চোখে রঙ ফুটেছে, চামড়া মসৃণ হয়েছে, বয়েস কমেছে, নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে ভাল, সঙ্গে বিজনও বসে আছে, নিশ্চয়ই রমাদিকে বোঝাচ্ছে যে সার্থকতার ও সুখ্যাতির সব খানিই তার প্রাপ্য, একটুও তার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। বাড়ির ফাটক খোলা, কেবল ভেতরের বারাণ্ডায় আলো জ্বলছে, বুক ধক্ করে ওঠে, এত রাত্রেও উৎসব শেষ হয় নি! বয় এল, মেম সাহেব আসেন নি, ছোট সাহাব অর্থাৎ 'বিজন বাবু এসেছিলেন, একটু পরে আবার আসবেন বলে গেছেন। খগেন বাবু বারাণ্ডার চেয়ারেই বসলেন। খানিক পরে মালি লণ্ঠন নিয়ে ফাটক বন্ধ করতে এল। লোকটা বুড়ো, কাজ জানে, ল্যাটিন নামের সর্ব্বনাশ করতে ওস্তাদ, মালিদের চেষ্টায় উদ্ভিদতত্ত্বের পারিভাষিক তৈরী হচ্ছে, অধ্যাপকবৃন্দ চাইছেন সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী থেকে প্রতিশব্দ উদ্ধার করতে, তাই তাঁদের নাম দেওয়া গাছে ফুল ফল ধরে না...র‍্যাস্‌প্‌বেরীকে রসভরী বলে মালি, এই নামের জোরেই ফল টোপা টোপা হয়ে ওঠে···ভাষা জন্মায় এদের মুখ থেকে, সাহিত্যপরিষদের হাড়ে নেই ভাষাসৃষ্টির শক্তি···যারা খাটে তারাই স্রষ্টা, বাকীরা দ্রষ্টা, তাও নয়, সেজন্য নিরাগ্রহতা চাই...অসম্ভব এই আগ্রহ বর্জ্জন করা, অজানিতে এসেই যায় ভাবগুলো রাত্রে চোরের মতন, যতক্ষণ চুরি চলছে ততক্ষণ মট্‌কা মেরে লেপ মুড়ি দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাক যদি জেগেছ, নচেৎ অঘোরে নিদ্রা দাও এবং সকালে উঠে চেঁচামেচি কর আর লাল পাগড়ী আসুক। যদি বীর পুরুষ হও, তবে চোর তাড়াও, তবে ছুরি খাওয়ার ভয় রইল। খগেন বাবু বয়কে বল্লেন বারাণ্ডাতে খাবার আনতে।

এখনও এল না রমা, এতক্ষণের প্রোগ্রাম! লোকে যে অধীর হয়ে উঠবে, অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা ভাবে, নিজেদের কৃতিত্ব উজাড় করে দেওয়াই বিধির বিধান। খগেন বাবু বারাণ্ডা থেকে নেমে সামনের ঘাসের ওপর এলেন, জুতো খুলে ফেলতে ইচ্ছে হয়, নরম পরশ ঘাসের, জুতো খুললেন, লন-এর ওপর বিসদৃশ দেখায় জুতো জোড়া, মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে,.কেউ যেন মারা গেছে সদ্যসদ্য তার জ্যান্ত চিহ্ন পড়ে আছে। এধার ওধার ফিরে দেখলেন কেউ নেই, পা দিয়ে জুতো জোড়া লনের কোণে সরিয়ে দিলেন। রমলা যদি এই রকম দেরী করে তবে তার চাকর-বাকর ভাগবে। তবে সে জানে ওদের চালাতে, তারাও বুঝেছে বাড়ির কর্ত্তা কে। তাই ভাল, ওদের সম্পর্কে হাত না দেওয়াই মঙ্গল। ঘাস বেশ ঠাণ্ডা . তার ওপর শুয়ে পড়লে যেন শান্তি আসে...মালি যদি টের পায় কি ভাববে! চাকর-বাকরের জানতে কিছুই বাকী থাকে না, তবু তাদের সহানুভূতি পেতে লজ্জা আসে। সফীক, হুঁা, তাকে বলা যায়, সে অ-মানুষ নয়···বিজন ভুল বুঝেছে···কিন্তু বক্তব্যই বা কি! পার্টির সভ্য হতে বারণ করলে, কারণ, তার ধারণা রমলার সঙ্গে বিচ্ছেদ অসম্ভব। এইখানে সফীক মস্ত ভুল করেছে, সে রমলাকে একটা ঘৃণ্য জীবন যাত্রার প্রতীকই ভাবে। কিন্তু কেন সে মাত্র প্রতীক থাকবে? জীবন যাত্রার ঘৃণ্যতাটা অপমানের নয়, অপমান তাকে মানুষ না ভাবা। তবু, তবু সফীক মোটামুটি ঠিকই ধরেছে, মানুষ আর কোথায় রইল? এককালে ছিল, এখন লঙ্কার রাক্ষস।

মোটর আসছে মনে হল, খগেন বাবু তাড়াতাড়ি দেওয়ালের পাশে অন্ধকারে বসে পড়লেন। ফাটকের বাইরে মোটর থামল, দরজা খোলার শব্দ হল...'না, কাল কিছুতেই নয়' 'সে আমি ছাড়ব না, কথা দিয়েছেন' 'অত জোরে চালালে আমার মাথা ঘোরে, সহরের মধ্যে'···'লক্ষ্ণৌএর রাস্তা চমৎকার, ব্রীজের পর থেকে চমৎকার ড্রাইভ, সত্যি চমৎকার...না সে হবে না, যদি নার্ভাস হন আস্তে চালাব, না হয় রাস্তার ধারে কোথাও একটু বসলেই চলবে...ডিনারের পর, এই কথা রইল...

ভয় নেই, একলা পেয়ে খেয়ে ফেলব না। আশা করি স্যাপের নেবার দরকার হবে না। বলেন ত' বিজনকে অনুরোধ করি রিটাকে সঙ্গে নিতে। ওঃ তাইত, রিটার আবার কি একটা পার্টি আছে···কি বলেন?' কোনো কথা শোনা গেল না, মোটরের দরজা বন্ধ হল, ব্যাক্ করে অধ্যাপক চলে গেল। রমলা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকল। তার ঘরের আলো জ্বলে উঠল...খাবে না অত রাত্রে, নিশ্চয়ই খেয়ে এসেছে, এত দেরী লাগে রাতের পোষাক পরতে! বোধ হয়, পার্টির পোষাক পরেই নিচু চেয়ারে বসে আছে, ভাবছে,(আর্শিতে নিজেকে দেখছে, ভাবছে, বেশ করেছে, বেশ দেখাচ্ছে, সকলে ত' তাই বল্লে, ভাবছে, কেন করবে না, কেন সেই বা একলা থাকবে, তার দায় পড়েছে, ঠোঁট ওলটাল নিশ্চয় রমলা, অল্পবয়সী মেয়েদের মতন। কারই বা দায়? কারুর নয়, কিসের দায়? কিছুরই নয়।)

খগেন বাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, মুখে আলো পড়ল, তা পড়ুক, জুতো প'রে বাড়ির বাইরে এলেন, ফাটক খোলা রইল, তা থাক গে, চুরির কিছু নেই, বিজন আসবে। সুজন কানপুরে থাকলে সেও আসত। তাকে আসতে বারণ করা অন্যায় হয়েছে, রমাকে বলাই হল না সুজন এল না কেন। সুজন এলে রমা নিজেকে সামলাতে পারত···সুজন নিজে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারত না। তবু এটার চেয়ে ভাল হত··(এটা কে! একটা জঘন্য কীট এই অধ্যাপকটা, মুখে কপচায় কাকাতুয়ার মতন, বেশ হয়েছে এই কাকাতুয়া আর লালমণিটার মিলন।) খগেন বাবু সফীকের আড্ডার সামনেকার গলিতে এলেন। পুলিশের ভিড়। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। কিষণ, মহবুব, করীম, মহীন্দর, আরো দু'একজন দাঁড়িয়ে। মুহীন্দর বল্লে, 'ওস্তাদকে ধরেছে!' 'কেন?' 'খুনের চার্জ্জে।' 'ছাড়ান সম্ভব নয়?' 'জামিন চাইবে।' 'তার জন্য ভাবনা নেই।' করিম বল্লে, 'জামিনেও ছাড়বে না।' 'তবে?' 'এক যদি লক্ষ্ণৌএ সরাসরি গিয়ে ওপর থেকে ছাড়পত্র আনা যায়। তাও বোধ হয় সম্ভব নয়...চার্জ্জটা খুনের কিনা।' পুলিশ প্রহরী সফীককে রাস্তায় নিয়ে

এল। রাস্তার আলোয় খগেন বাবুকে সফীক দেখতে পেলে। হাসিতে সফীকের চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে গেল।

ফাটকের দরজা বন্ধ হয় নি। রমলা আর বিজন বারান্দায় বসে। 'এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় থাকেন, খগেনবাবু? আমাদের কি একটু ভাবনা হয় না? সেই কখন থেকে বসে আছি। এরা বল্লে আপনি বাড়িতেই আছেন, তন্ন তন্ন করে খোঁজা গেল, পাত্তাই নেই, হাওয়া খাচ্ছিলেন বুঝি?' খগেনবাবু 'হুঁ' বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ঘুম আসে না, একটা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন, 'রমলা, বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হচ্ছে। তোমার নামে চেক রেখে গেলাম। যদি দরকার হয়, ভাঙ্গিয়ে নিও।' লজ্জা হয় এই ধরণের নাটুকে মেয়েলী চিঠি লিখে যেতে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে সুটকেশ গোছাতে বসলেন। জিনিষপত্র কোথায় গেল?

* * *

পরের দিন শোনা গেল ওরা জামিন দেবে না। মহবুব আর করীম এসে বল্লে, উধামজী এ বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে অক্ষম। সারাদিন জল্পনা চলল। আবার ধর্ম্মঘট অচল। এক উপায় লক্ষ্ণৌ গিয়ে কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা.. সন্ধ্যার পর যাওয়া যাবে ট্যাক্সীতে, রাত দশটার পর মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। খগেন বাবু বাড়ি ফিরলেন রাত ন টায়। রমা আটটায় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেছে দুসরে সাহেবের সঙ্গে, তাঁর মোটরে। ছোট সাহেব আসেন নি সারাদিন। লজ্জা এল কেমন।

ট্যাক্সীতে মহবুব আর কিষণ। কিষণ ভেতরে বসতে চায় নি, খগেন বাবু জোর করে পাশে বসালেন। পুলের ফাটকে ট্যাক্সী থামল। 'এখানে একটু বেশী হাওয়া, সামনে···' 'সামনে হাওয়া কম।' 'তাই যাই সামনে।' ট্যাক্সী ছাড়ল। নদীর ওপর একটা নৌকোয় টিম্‌টিমে আলো জ্বলছে। নদী পার

হয়ে আবার সেই বাঁক, আবার সেই সিমেণ্টের রাস্তা, আবার দু'পাশে গাছের সারি, আবার সেই দিগন্তবিস্তারিত প্রান্তর···সৃষ্টিছাড়া, অ-মানুষিক বুকের স্পন্দন কানে আসে শূন্যতা ভেদ ক'রে...ট্যাক্সী জোরে চলে···রাস্তার পাশে একটা মোটর দাঁড়িয়ে...লোক নেই...কোথায় গেল ওরা...এই ত মাঠটা ভরে গেল মানুষের প্রেমে, বন্ধুত্বে···'ড্রাইভার, আমাদের আবার শিগ্‌গির পৌঁছতে হবে!' ড্রাইভার স্পীড বাড়িয়ে দিলে। 'ষাট মাইল চলছে, সাহেব।' 'ষাট মাইল ঘণ্টায়? বল কি?' মহবুব বল্লে, 'বাবু সায়েব, আপনি ঘাবড়াবেন না। ওস্তাদ ফিরে আসবেই আসবে। পাড়াশুদ্ধ সাক্ষী দেবে ছেলেটা আগেই মরেছিল··চৌধুরী সাহেব নিজেই বলবে আদালতে···অত বড় মিথ্যে চার্জ্জ টে কবে না...আপনি বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা • সব মিথ্যে...ওরাই চাপা দিয়েছে এইটাই সত্যি প্রমাণ হবে দেখবেন। পৃথিবীতে একটা সত্যি মিথ্যে আছে ত!'

'আছে না কি?'

'ড্রাইভার, রাস্তায় সোডা লেমনেডের দোকান নেই?'

'আছে, উনাওতে।'

মহবুব বল্লে, 'পান খাবেন?'

খগেন বাবু একটা পান মুখে দিলেন।